অন্‌জন্‌ দাশগুপ্ত

থিয়েটার

প্রথম খণ্ড

পপুলার থিয়েটার। এসথেটিক থিয়েটার। রিয়ালিস্টিক থিয়েটার। ফেমিনিস্ট থিয়েটার। পিপলস থিয়েটার। ন্যাচারালিস্টিক থিয়েটার। গ্রটেস্ক থিয়েটার। গ্রুপ থিয়েটার। লা কমিউন থিয়েটার। থিয়েটার অব সিচুয়েশন। থিয়েটার অব সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম। থিয়েটার অব ফ্যান্টাসটিক রিয়ালিজম। থিয়েটার অব ভিশন

নাট্যচিন্তা

প্রকাশক : তন্দ্রা চক্রবর্তী
নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন
১০বি ক্রিক লেন। কলকাতা ৭০০ ০১৪
ডিডি ১৮/১১ সল্ট লেক। কলকাতা ৬৪

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০২

মুদ্রণ : অলকা দাস
বেঙ্গাল লোকমত প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১০বি ক্রিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০১৪

উৎসর্গ

দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম লোকনাট্য প্রতিষ্ঠান
রূপান্তর (বাংলাদেশ)-এর
দুই রূপকার স্নেহভাজন
স্বপন গুহ ও রফিকুল ইসলাম খোকনকে

সূচিপত্র

ভূ। মি। কা।

আমরা যারা বাংলা নাটকের নিয়মিত চর্চা করি তাদের একটা বড় সমস্যার মুখোমুখি পড়তে হয় বারংবার। এটা বোধহয় চিরকালীন এক সমস্যা। একজন নাট্যকর্মী নাট্যচর্চা বা প্রশিক্ষণের পাশাপাশি যে আধুনিক তত্ত্বজিজ্ঞাসা, সমাজচিন্তন এবং নাট্যভাবনার বিন্যাস সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকবেন এ তো বলাই বাহুল্য। কিন্তু বিশ্বের পটভূমিকায় আধুনিক নাট্যভাবনার গতিপ্রকৃতির খোঁজ রাখতে ইংরেজি বই বা পত্রপত্রিকা ছাড়া গতি নেই। আবার এও স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, বাংলা নাটকের বেশিরভাগ কর্মীই ইংরেজিতে তেমন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না। এ নিয়ে কুণ্ঠিত হবার কোনও অবকাশ নেই। উপনিবেশের দাদন বড়ই ভয়ঙ্কর। তাই ইংরেজি না জানাটা একটা অস্বস্তির কারণ এদেশে। আবার বেশিরভাগ তত্ত্বগ্রন্থের ভাষাও বেশ জটিল। এমনকি সেইসব কঠিন তত্ত্বাভাস বুঝিয়ে দেবার যে সহজপাঠ বাজারে পাওয়া যায় সে-ও কম দুরূহ নয়। এ তো গেল সমস্যার একটা দিক। অন্যদিকটা হল, বাংলা ভাষায় যে একেবারে কাজ হয়নি তা বলব না। কিন্তু এক্ষেত্রে মাঝেমাঝে মাতৃভাষাও যে কীরকম দুর্বোধ্য, রসহীন হয়ে উঠতে পারে তার প্রমাণ রয়েছে ঝুরিঝুরি। শম্ভু মিত্রকে নিয়ে একটা গল্প চালু আছে। শম্ভুবাবু নাকি একটি বাংলা নাটক দেখে প্রশ্ন তুলেছিলেন। নাটকটি লেখা বাংলায়, অভিনয় হচ্ছে বাংলায়, অভিনেতারা বাঙালি, আমি নিজে বাঙালি, তা সত্ত্বেও নাটকটির এক বর্ণ বুঝতে পারলাম না। কেন বলুন তো? ঘটনাটির সত্যাসত্য জানি না। তবে গল্পটি এখানে খুব প্রাসঙ্গিক। এরকম নাটক যেমন হয় তেমন বইও হয়। যদিও বিশ্বের নাট্য বা তত্ত্ব নিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাংলায় নানা লেখা প্রবন্ধ রয়েছে। কিন্তু নির্ভরযোগ্য, পদ্ধতিগতভাবে বিন্যস্ত, এমন একটি নাট্যসংক্রান্ত বাংলা বই আমার হাতে অন্তত আসেনি। জন রাসেল টেলারের বিখ্যাত বই 'পেঙ্গুইন ডিকশনারি অফ দ্য থিয়েটার' বা সারা স্নেনটন ও

মার্টিন বানহ্যাম সম্পাদিত 'দ্য কেমব্রিজ পেপারব্যাক গাইড টু থিয়েটার' জাতীয় বই— বাংলা ভাষায় কল্পনার বাইরে। কিন্তু এমনটি কেন হবে বা হয়েছে তার কোনও ব্যাখ্যা নেই। এত নাটকের পত্রপত্রিকা, এত নাটক, এত নাট্যদল, এত নাট্যকর্মী— তা সত্ত্বেও পিটার ব্রুকের অবশ্যপাঠ্য বই 'দ্য এম্পটি স্পেস' বইটির একটা বাংলা অনুবাদ হল না! বা ইয়ান কটের 'শেক্সপীয়র : আওয়ার কনটেমপোরারি' এবং গ্রোটয়স্কির 'টুওয়ার্ডস আ পুওর থিয়েটার' জাতীয় বৈপ্লবিক নাট্যচিন্তার বয়ান বাংলায় অনূদিত হয়নি। আবার বলি, যে বইগুলির কথা বললাম সেগুলি ছয়ের-সাতের দশকের। গত দশ-বারো বছরে ইউরোপ, আমেরিকা ছাড়াও এশিয়া, লাতিন আমেরিকা এবং আফ্রিকাতে নাট্যভাবনার জগৎ যে কত দিকে বিস্তার পেয়েছে তার হাল-হকিকতের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। তাহলে কী ধরে নেব যে নাটকের বীক্ষবীক্ষায় আমাদের উৎসাহ নেই? না হলে আধুনিক বিশ্বনাট্যের এইসব প্রধান কাজগুলো বাংলায় শতসহস্র নাট্যকর্মীদের জন্য কেউ তর্জমা করতে উদ্যোগ নিলেন না কেন?

অনজন্ দাশগুপ্তের বইটা হাতে পেয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। অনজনবাবু অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে আধুনিক নাট্যভাবনার একটি সংক্ষিপ্ত সারণী তৈরি করার চেষ্টা করেছেন যা তাঁর দীর্ঘ এবং গভীর অনুসন্ধানের ফসল। পদ্ধতিগতভাবে সাজিয়েছেন বিষয়গুলি। কোনও কোনও পরিচ্ছেদে সমগ্রতায় একটি বিশেষ নাট্যচিন্তার বা নাট্যধারার কথা বলেছেন, যেমন 'পিপলস থিয়েটার' বা 'ফেমিনিস্ট থিয়েটার' ইত্যাদি। আবার কোনও কোনও পরিচ্ছেদে একজন বা কয়েকজন নাট্যনির্দেশকের ঘরানাকে তুলে ধরার প্রয়াস করেছেন। যেমন ভাকতানগভ বা রবার্ট উইলসন। অসম্ভব আন্তরিক এই প্রয়াস। আর সবচেয়ে যেটা জরুরি তা হল, অনজনবাবু নিখাদ নাট্যের পরিধি পেরিয়ে সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, ইতিহাসের প্রেক্ষিতে বিষয়গুলির পটভূমিকা তৈরি করেছেন। দেশ, কাল ও রাজনীতির নিরিখে না দেখলে কোনও চিন্তাধারার সম্যক মূল্যায়ন সম্ভব নয়। 'ন্যাচারালিজম' বা 'সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম' বা 'অ্যাবসার্ড থিয়েটার'-কে ইতিহাসের বা সমাজতত্ত্বের চিহ্নে পড়তে না পারলে পাঠ হবে অসার। আধুনিক নাট্যভাবনার বিকাশের মানচিত্র আঁকতে আঁকতে অনজনবাবু সেই

বিন্যাসের সামাজিক প্রেক্ষিতটাও নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন। এই বইকে আবার পূর্ণাঙ্গ নাট্যাতিহাসের কিতাব ভাবলে ভুল হবে। অনেকটা 'ব্রিটানিকা মাইক্রোপিডিয়া'র মতো এর কাজ। কতগুলো সূত্র ইঙ্গিত করা, প্রসঙ্গ উত্থাপন করা। আরও বিশদভাবে বিষয়গুলি নিয়ে জানতে হলে বিস্তীর্ণ পাঠ করতে হবে। কিন্তু এটুকুই বা কোথায় পাই বঙ্গভাষায়।

পরিচ্ছেদ ভাগ নিয়ে বা ব্যাখ্যা নিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মতানৈক্য থাকতে পারে। সেসব নিয়ে তর্কবিতর্ক ওঠা তো ভালো কথা। অন্‌জন্‌বাবু এবং প্রকাশককে ধন্যবাদ।

সুমন মুখোপাধ্যায়

পপুলার থিয়েটার

- 'পপুলার থিয়েটার হল জনগণের নিজস্ব থিয়েটার, যে থিয়েটার জনগণেরই ভাবনা, সমস্যা ও বিশ্লেষণকে প্রতিফলিত করে, যে থিয়েটারের বিষয়বস্তুতে জোর দেওয়া হয় স্থানীয় বিশেষ বিশেষ সমস্যা, যে থিয়েটার ব্যাপকভাবে প্রচারিত অন্যান্য বৈদ্যুতিন মিডিয়ার প্রচারকে প্রতিরোধ করে, যে থিয়েটার জনগণের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ইতিহাসের পুনরুজ্জীবন এবং ঋদ্ধিসাধন করে, তাদের অগ্রগতির পথে এগিয়ে দেয়, যে থিয়েটার লোকশিক্ষা দেয়, দেশ ও জনগণের মধ্যে সংহতি আনে, যে থিয়েটারে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হয়, যে থিয়েটার বিনোদন হিসেবেও জনগণের আগ্রহকে ধরে রাখে।'

  —১৯৮৩-তে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত 'পপুলার থিয়েটার'-এর আন্তর্জাতিক কর্মশালা

- 'পপুলার থিয়েটার হল মূলধারা বহির্ভূত নাট্যধারা, যা প্রান্তদেশে আশ্রিত এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা-বর্জিত।'

  —ডিকসন মুয়ানসার

- 'যদি পুরোনো দিনের অশিক্ষিত, নিরক্ষর চাষিরা নাচ, গান, বর্ণনাত্মক নাট্য ঐতিহ্য, মুখোশ-নৃত্য এবং উৎসবের মাধ্যমে এমন প্রদর্শনযোগ্য শিল্প সৃজন করে থাকেন যা আজকের বুদ্ধিজীবীরা গবেষণার যোগ্য বলে বিবেচনা করেন, তাহলে সামাজিক উন্নয়নের কবলে শুধু এই বুদ্ধিজীবীদের সৃষ্ট নাটকই কেবল অনুধাবনযোগ্য বলে মনে করা হয় কেন?'

  —মাইকেল এথারটন

- 'বাস্তবতায় জন্ম নেওয়া নাটক বাস্তবতার কাছেই ফিরে আসে। এখান থেকেই তা সমৃদ্ধ হয়। পরিমার্জিত হয়। এইভাবেই নাটকের বেড়ে ওঠার প্রক্রিয়া অবিরত চলে। যে সমস্যা এই প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে তার প্রাসঙ্গিকতা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই কাজ চলতে থাকে।' *—শেপার্ড*

> ● 'শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়ে না তুলে বুদ্ধিজীবীরা যতদিন ক্ষুদ্র এলিট হয়ে থাকবেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁদের যাবতীয় লেখালেখি ও সাহিত্যকর্ম সীমিত এবং গণ্ডিবদ্ধ হয়েই থাকবে। প্রত্যেক বিপ্লবীই জানেন, একজন এলিটের সাহায্য নিয়ে বিপ্লব সমাধা হয় না, বিপ্লবে জয়ী হতে গেলে প্রয়োজন দেশের ব্যাপকতম কৃষি ও শ্রমজীবী মানুষের সহযোগিতা।
>
> —*পিটার ভাইস*

॥ ১ ॥

বিশ শতকের সাতের দশকে কানাডার অধ্যাপক রস কিড তৃতীয় বিশ্বের উৎপীড়িত, বঞ্চিত ও শোষিত গ্রামীণ জনগণের মুক্তির সহায়ক থিয়েটারকে সংজ্ঞায়িত করার জন্য তাঁর 'পপুলার থিয়েটার, কনসিয়েনটাইজেশন অ্যান্ড পপুলার অর্গানাইজেশন' বইটিতে প্রথম 'পপুলার থিয়েটার' শব্দটি ব্যবহার করেন।

১৯৮৩-তে বাংলাদেশে 'পপুলার থিয়েটার'-এর ওপর এক আন্তর্জাতিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে 'পপুলার থিয়েটার'-এর সংজ্ঞার্থ নতুনভাবে বিশ্লেষণ করে বলা হয় : 'পপুলার থিয়েটার হল জনগণের নিজস্ব থিয়েটার, যে থিয়েটার জনগণেরই ভাবনা, সমস্যা ও বিশ্লেষণকে প্রতিফলিত করে, যে থিয়েটারের বিষয়বস্তুতে জোর দেওয়া হয় স্থানীয় বিশেষ বিশেষ সমস্যা, যে থিয়েটার ব্যাপকভাবে প্রচারিত অন্যান্য বৈদ্যুতিন মিডিয়ার প্রচারকে প্রতিরোধ করে, যে থিয়েটার জনগণের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়ন এবং ঋদ্ধিসাধন করে, তাদের অগ্রগতির পথে এগিয়ে দেয়, যে থিয়েটার লোকশিক্ষা যে, দেশ ও জনগণের মধ্যে সংহতি আনে, যে থিয়েটারে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হয়, যে থিয়েটার বিনোদন হিসেবেও জনগণের আগ্রহকে ধরে রাখে।'

জাম্বিয়ার নাট্যকার ও নাট্যসমালোচক ডিকসন মুয়ানসার বলেছেন, 'পপুলার থিয়েটার হল মূলধারা বহির্ভূত নাট্যধারা, যা প্রান্তদেশে আশ্রিত এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাবর্জিত।'

'পপুলার থিয়েটার'-এর প্রবক্তারা বলেন, 'পিপলস কালচার' হল শাসক ও শোষক শ্রেণীর আদর্শবাদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিশোধিত সংস্কৃতি। অন্যদিকে 'পপুলার কালচার' জাতিগত বোধ এবং শ্রেণী-সচেতনতা সুদৃঢ়করণের মাধ্যমে মানুষের প্রকৃত স্বার্থকে প্রতিফলিত করে এবং তার দ্বারা নিপীড়কের আধিপত্যকে প্রতিহত করে।

'পপুলার থিয়েটার' শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত-পরিচালিত থিয়েটার নয়। শহরের বুদ্ধিজীবী বা এলিটরা এই থিয়েটারের দর্শক নন। শহরের থিয়েটারের মতো এই থিয়েটারে সরকারি বা বেসরকারি অর্থসাহায্যের প্রয়োজন হয় না। কোনও রাজনৈতিক দল বা শাসকগোষ্ঠীর মতাদর্শ বা কৌশল প্রচারের দায়বদ্ধতাও এখানে নেই। ব্যক্তি-প্রতিভার বিকাশের পাটাতনও এই থিয়েটার নয়। অর্থহীন প্রমোদ প্রবণতায় সে আগ্রহীও নয়।

'পপুলার থিয়েটার' গ্রামের মানুষদের প্রয়োজনের থিয়েটার। মুক্তি-সহায়ক থিয়েটার। সম্পূর্ণই গ্রামের নির্যাতিত ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ ও আত্মবিশ্লেষণের পাটাতন। গ্রামবাসীদের নিজস্ব থিয়েটার। এই থিয়েটারে গ্রামের মানুষ নিজেদের মধ্যেই তাদের নিজস্ব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। তাদের সামাজিক ক্ষতগুলি চিহ্নিত করে। তাদের বাস্তব বঞ্চনা ও শোষণের ঘটনা নিজেরাই উপস্থিত করে। নিজেরাই সেইসব সমস্যার সমাধান করে। তারপর সমস্যামুক্ত হওয়ার জন্য সংগ্রাম করে। বৈপ্লবিক সংগঠন তৈরি করে।

গ্রামের মানুষই হয় 'পপুলার থিয়েটার'-এর কর্মী-কুশীলব। সমাজের কাছে দায়বদ্ধতার প্রেরণা থেকেই তারা থিয়েটার করে। তাদের সৃষ্ট শিল্পকে পণ্য হিসেবে তারা বিক্রয় করে না।

এই থিয়েটার উপস্থাপনে মিলনায়তন বা বাঁধা নাটমঞ্চের প্রয়োজন নেই। খোলা আকাশের নিচে, মাঠে, গাছতলায়, কৃষকের আঙিনায় এই থিয়েটার উপস্থাপিত হয়। ভোক্তার শ্রেণীকরণের সুযোগও থাকে না এই থিয়েটারে। সবার জন্য, সকলের জন্য উন্মুক্ত এই থিয়েটারের উপস্থাপনে শোষিত শ্রেণী তার অধিকার হরণের প্রক্রিয়া চিহ্নিত করে ঘৃণা করে শোষককে। সংগ্রাম-চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে মুক্তির জন্য আন্দোলনে শামিল হয়। যারা সমাজের একেবারে তৃণমূলে আছে, এই থিয়েটার তাদের নিজস্ব বলার জায়গা করে দেয়। এই থিয়েটারের সাহায্যে তারা নিজেদের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করতে শেখে। নিজেদের সার্বিক উন্নতির জন্য থিয়েটারকে ব্যবহার করে।

॥ ২॥

'পপুলার থিয়েটার'-এর উদ্ভব তৃতীয় বিশ্বে। 'তৃতীয় বিশ্ব' নামটি সম্ভবত ১৯৫২ সালে প্রথম ব্যবহার করেন ফরাসি সাংবাদিক স্যাভি। চীনের মাও জে দং-ও এই নামটি বহুবার ব্যবহার করেছেন। মেলকট তাঁর বই 'কমিউনিকেশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন দ্য থার্ড ওয়ার্ল্ড' বইতে তৃতীয় বিশ্বের একটি ধারণা দিয়েছেন,

'যার প্রায় কিছুই নেই, শিল্প নেই, ভালো যোগাযোগ নেই, মানুষজনের অক্ষরজ্ঞান নেই'... ইত্যাদি, ইত্যাদি।

১৯৫৫-তে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুঙে ও ১৯৬১-তে বেলগ্রেডে এশিয়া ও আফ্রিকার কয়েকটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই রাষ্ট্রগুলি ঘোষণা করে, তারা ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক কোনও জোট বা শিবিরে নেই। তারা 'জোট নিরপেক্ষ দেশ'। শিবিরটির নাম হয় 'তৃতীয় বিশ্ব'। ১৯৬৫-তে ভারতের জওহরলাল নেহরু, যুগোস্লাভিয়ার মার্শাল টিটো এবং মিশরের গামাল আবদেল নাসের এই তৃতীয় বিশ্বের শিবিরকে প্রসারিত করেন।

বর্তমানে ১১৫টি 'উন্নয়নশীল' ও 'অনুন্নত' দেশ এই জোটে আছে। 'উন্নয়নশীল দেশ'-এর মধ্যে আছে ভারত, শ্রীলঙ্কা, ব্রাজিল, বলিভিয়া, আর্জেন্টিনা, কিউবা, মিশর, ইরাক, ইরান, কেনিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া, পাকিস্তান, ভিয়েতনাম, ক্যামেরুন, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ফিলিপিন্স, সৌদি আরব, লেবানন, পানামা, ওমান, নাইজিরিয়া, পেরু, তিউনিসিয়া, তুরস্ক, উরুগুয়ে, ভেনিজুয়েলা, জিম্বাবোয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকা, সোমালিয়া, মঙ্গোলিয়া, মরোক্কো, নিকারাগুয়া, মেক্সিকো, ইন্দোনেশিয়া, কাতার, হাইতি, ফিজি।

'অনুন্নত দেশ'-এর মধ্যে আছে আফগানিস্তান, অ্যাঙ্গোলা, বাংলাদেশ, বেজিন, ভুটান, কাম্বোডিয়া, ইথিওপিয়া, বুরকিনা ফাসো, বুরুন্ডি, কেপ ভার্জে, চাদ, কোমোরস, জিবুতি, গিনি, লাওস, মাদগাস্কার, জাম্বিয়া, কিরিবাটি, লাইবেরিয়া, মালদ্বীপ, মোজাম্বিক, মায়ানমার, নেপাল, তানজানিয়া, ইয়েমেন, উগান্ডা, টোগো, সামোয়া, সিয়েরা লিওন, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, জায়রে, টুভালু, ভানুয়াটু।

মেলকট ভারতকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। একটি ভাগ বেশ উন্নত। তারা ইউরোপ ও মার্কিনি দেশগুলির সঙ্গে যুঝবার ক্ষমতা রাখে। অন্যদিকে একটি ভাগ উন্নতির পথে। অর্থাৎ ভারতে 'উন্নত' ও 'উন্নয়নশীল' দুই ভাগেরই সহাবস্থান।

তবে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলি নিজেদের নিরপেক্ষ বললেও প্রচ্ছন্ন, প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে বৃহৎ শক্তির দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত। বৃহৎ শক্তিগুলি সব সময় এদেরকে নিজেদের বশে আনার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ১৯৬০ থেকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে বহুজাতিক পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটে চলেছে। ১৯৭০-এর পর থেকে এই দেশগুলিতে গরিব মানুষদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছে। দেখা দিয়েছে ব্যাপক শ্রেণী-বিভক্তি, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীদের

মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, জমির লড়াই ও অবকাঠামোগত পরিবর্তন। উপরন্তু, এই দেশগুলি পরস্পরের সঙ্গো প্রায়ই যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। ফলে 'তৃতীয় বিশ্ব' কখনই কোনও সংহত শক্তি হিসেবে দেখা দেয়নি।

॥ ৩॥

বিশ শতকের পাঁচের দশকে তৃতীয় বিশ্বের কিছু অনুন্নত দেশের সরকারি পেশাদার ভ্রাম্যমান নাট্যদল কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সুফল নিয়ে গ্রামাঞ্চলে সরকারি কর্মসূচি প্রচার করত। কিন্তু অভিনয়ের অব্যবহিত পরেই গ্রামবাসীদের সঙ্গো কোনওরকম পর্যালোচনা না করেই দলগুলি গ্রাম ছেড়ে চলে যেত। ফলে ঘোষিত কর্মসূচি রূপায়িত হত না।

১৯৭১ সালে ম্যানিলায় প্রথম ও ১৯৭৩-এ ইরানের শিরাজে তৃতীয় বিশ্বের থিয়েটারের দ্বিতীয় উৎসব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই দুটি সম্মেলনেরই প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল— 'শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে তৃতীয় বিশ্বে থিয়েটার একটি সৃজনীশীল শক্তি'। এই উৎসবের ইস্তাহারে সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনচর্চায় থিয়েটারকে অপরিহার্য গুরুত্ব দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। বলা হয়, থিয়েটারকে সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের একটি প্রধান অংশ হয়ে ওঠার প্রতি অবশ্যই নজর দিতে হবে। নাগরিক ও গ্রামীণ উভয় সমাজের মানুষের কাছে থিয়েটারকে কার্যকরভাবে উপস্থিত করার জন্য উপযুক্ত উপায় ও উপকরণের অনুসন্ধান করতে হবে। ইস্তাহারে আরও বলা হয়, তৃতীয় বিশ্বের থিয়েটার কেবলমাত্র পাশ্চাত্য থিয়েটারের অনুকরণ হবে না। দেশজ আঙ্গিকের উদ্ভাবন, ব্যবহার ও বিকাশ ঘটবে সেখানে।

১৯৮০-র দশকে 'ইন্টারন্যাশনাল পপুলার থিয়েটার অ্যালায়েন্স' সমেত অনেক স্থানীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে। এই দশকের শুরুতেই গ্রামীণ স্তরে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার জন্য আর্থিক সাহায্যকারী সংস্থাগুলি— বিশেষ করে এনজিও সংস্থাগুলি অনেক স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক ওয়ার্কশপকে অর্থসাহায্য দেয়। এই দশকেই আমেরিকার ম্যাসাচুয়েস্টস বিশ্ববিদ্যালয় ও ঘানার গণশিক্ষা সমিতি মিলিতভাবে সমস্যা-সমাধানমূলক নাট্য প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করে। এই প্রক্রিয়ায় প্রথমে একটি সভায় গ্রামবাসীদের আহ্বান করা হয়। সেখানে স্থানীয় সমস্যা নিয়ে সরকারি কর্মকর্তা, উন্নয়ন অধিকর্তা, মন্ত্রী ও বুদ্ধিজীবীরা বক্তব্য রাখেন। এরপর সরকারি নাট্যদলটি একটি নাটক প্রযোজনার মাধ্যমে সমস্যাটি উপস্থিত করে ও সমাধানের পথনির্দেশ করে। কিন্তু

তদন্তে দেখা গেছে, এই নাট্য-প্রক্রিয়ায় সমস্যার সমাধান হয় না। কারণ সরকারি নেতৃবৃন্দ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরাই নিজ স্বার্থে সমস্যাগুলি নির্বাচন করেন। ফলে গ্রামবাসীদের সমস্যার কোনও প্রতিফলন এই নাট্যে থাকে না। শোষিতের পরিবর্তে এই পাটাতন হয়ে ওঠে শোষকের প্রচারস্থল। সমাধান এখানে চাপিয়ে দেওয়া হয়।

বিশ শতকের শেষার্ধে ও একুশ শতকের শুরুতে তৃতীয় বিশ্বের কিছু দেশে সরকারি, বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি গ্রামীণ উন্নয়নের লক্ষ্যে থিয়েটারকে ব্যবহার করছে। গণমানুষ, উন্নয়ন ও থিয়েটার— এই তিনটি বিষয়কে এক সূত্রে গাঁথার চেষ্টা হচ্ছে।

এই কর্মকাণ্ডে তিনটি দল তিনটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিশ্বাস ও পথে চলছে। প্রথম দলটি বিশ্বাস করে, নতুন নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে মানিয়ে চলার অপারগতাই গ্রামবাসীদের দারিদ্র্যের কারণ। প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত করতে পারলেই তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়বে। দারিদ্র্য দূর হবে। দ্বিতীয় দল বিশ্বাস করে, গ্রামবাসীদের নিজস্ব সমস্যা বিশ্লেষণ করা ও সমাধানের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা জাগরিত করতে পারলে তারা নিজেরাই সমাজের শোষণ-ভিত্তিক কাঠামোটাকে বদলে ফেলতে পারবে। প্রথম পথটি শোষক ও শাসক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করে। দ্বিতীয়টি শোষিত ও শাসিত শ্রেণীর স্বার্থের অনুকূল।

তৃতীয় দলটি থিয়েটার ও উন্নয়ন উভয় বিষয়েই অভিজ্ঞ। তারা নির্দিষ্ট একটি অঞ্চল বেছে নেয়। সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটায়। ওই অঞ্চলের অধিবাসীদের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর চলমান জীবনস্রোতে মিশে যায়। অধিবাসীদের মূল সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করে। সমস্যাগুলিকে অবলম্বন করে অধিবাসীদের নিয়ে তাৎক্ষণিক এক নাট্য তৈরিতে মন দেয়। মহড়া চলাকালীন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মুহূর্তে অভিনয় বন্ধ করে দেয়। উপস্থিত গ্রামবাসীদের কাছে পরামর্শ চায়। গ্রামবাসীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে। মতামত জানায়। সমাধানের কোনও প্রস্তাব থাকলে সেটাও বলে। সেই প্রস্তাব ব্যাখ্যা করার জন্য নাটকে অংশগ্রহণ করে। নাটকটি পুনরাভিনীত হয়।

যে সমস্যাগুলি নিয়ে নাটকটি পুনরাভিনীত হয়, অভিনয়ের পরে সেগুলি আবার গ্রামবাসীরা পর্যালোচনা করে। সমস্যাগুলির নতুন দিক নিয়ে নতুন নাট্যঘটনা সংযোজিত হয়। নাটকটি পুনর্নির্মিত হয়। এইভাবে চলতে থাকে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন সমস্যা অন্তর্ভুক্ত হয়। তাই নাটকটির সুনির্মিত কোনও চূড়ান্ত রূপ থাকে না। তা রূপান্তরিত হতে হতে চলে।

নাট্যদল অঞ্চলটি ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে তাদের নাট্যনির্মাণ কৌশল

অঞ্চলবাসীদের হাতে তুলে দেয়। তাদের নিজস্ব সংগঠন তৈরি করে দেয়। গ্রামবাসীরা চালিয়ে নিয়ে যায়।

আমরা যদি এই তিনটি দলের পথ ও প্রক্রিয়াগুলি বিচার করি তবে দেখব, তৃতীয় দলটিই 'গণনাট্য' তৈরির প্রচেষ্টায় ব্রত। কারণ নাটক তখনই 'গণ' হয়ে ওঠে, যখন তার শিকড় জনসাধারণের মধ্যে প্রোথিত হয়। জনগণের মধ্যে সেই বোধ ও ক্ষমতা গড়ে তোলে যে, তারা তাদের বাঁচার অসহনীয় পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম। সেই পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় হতে সে তাদের সংগঠিত ও চালিতও করে। একবার জনগণ যখন নিজেই নাট্যসৃষ্টি করতে থাকে এবং যখন তা তাদের চাহিদা পূরণ করে, তখনই জনগণের কাছে নাটক অর্থবহ হয়ে ওঠে। জনগণকে না জানলে, জনগণের জন্য শিল্প-সৃজন সম্ভব নয়। তার জন্য জনগণের সঙ্গে বসবাস করা ও তাদের সুখ-দুঃখের ভাগীদার হওয়া প্রয়োজন। সর্বোপরি, সাংগঠনিক সহায়তা ছাড়া বোধের বাস্তবায়ন সম্ভবপর নয়। নাটক একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তা এককভাবে কোনও তাৎপর্যপূর্ণ সামাজিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। সংগঠিত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তাকে সংযুক্ত হতে হয়। তার জন্য স্থায়ী বৈপ্লবিক সংগঠনের প্রয়োজন। তৃতীয় দলটির কর্মধারার মধ্যে এই সবগুলি প্রয়াসই বিদ্যমান।

তবে 'পপুলার থিয়েটার' আন্দোলনের প্রকৃতি এক হলেও সব দেশেই তার অভিমুখ এক থাকেনি। অধিকন্তু, তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি জাতিরই এক একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত লোক আঙ্গিক থাকায় এই থিয়েটারের পরিবেশনও বিভিন্ন ও বিচিত্র হয়ে গিয়েছে। যেমন --

॥ ৪ ॥

আফ্রিকা মহাদেশের কেনিয়ার সরকারি নাম 'রিপাবলিক অব কেনিয়া'। দেশটি পূর্ণ স্বাধীনতা পায় ১৯৬৩ সালের ১২ ডিসেম্বর। সরকারি গঠন : বহুদলবিশিষ্ট প্রজাতন্ত্র। প্রধানত কৃষিপ্রধান দেশ।

'কামিরিথু' কেনিয়ার একটি ছোট গ্রাম। গ্রামবাসীরা অধিকাংশ ক্ষেতমজুর। ৮০% নিরক্ষর। ১৯৭৫-এ এখানে গ্রামবাসীরা সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মুক্তমঞ্চ সমেত একটি সংস্কৃতি কেন্দ্র গড়ে তোলে। বয়স্ক-সাক্ষরতা অভিযান দিয়ে কেন্দ্রটি চালু করা হয়।

১৯৭৭-এ এই কেন্দ্রের জন্য নাট্যকার ঙ্গুগি ওয়া থিয়োঙ্গো 'নগাহিকা নাদিনদা' (আমার যখন ইচ্ছা হবে বিয়ে করব) নামে স্থানীয় 'কিকুর' ভাষায়

একটি নাটক লেখেন। দু'মাস ধরে গ্রামবাসীরা সবাই মিলে নাটকটি বারবার আলোচনা করে দেখে তাদের জীবন ও ইতিহাসই এতে অভিব্যক্ত হয়েছে। শাসক শ্রেণী, বহুজাতিক সংস্থা এবং ধর্মীয় সংগঠনের শোষণের ইতিবৃত্ত চিত্রিত হয়েছে। এখানে দেখানো হয়েছে যে, একমাত্র বিকল্প হল, সমাজ পরিবর্তনে ক্ষেতমজুরদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং দেশকে বিদেশি আধিপত্য থেকে মুক্ত করতে হবে। গ্রামবাসীরা নাটকটি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে। অনেকে সমস্যার কিছু নতুন ঝোঁকও যোগ করে। অনেকে নাটকের কিছু অংশ সংশোধন করে। এইভাবে নাটকটি হয়ে ওঠে তাদের বাস্তব যন্ত্রণার ভাষ্য। তিক্ত অভিজ্ঞতার কঠিন চিত্র।

নাটকটি পরিচালনা করেন কিমানি গেসাউ। গ্রামের প্রায় ২০০ মানুষ এই নাটকে অংশগ্রহণ করে। কেউ গান বাঁধে। কেউ পোশাক তৈরি করে। কেউ অভিনয় করে। কেউ সাংগঠনিক কাজে অংশ নেয়। একজন মঞ্চের নকশা তৈরি করে। এইভাবে এটি কেনিয়ার 'জাতীয় নাট্যশালা' হয়ে ওঠে।

নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৭৭ সালের ২ অক্টোবর। গ্রামের কৃষকবা এই নাটক উপভোগ করে। নাইরোবির 'সানডে নেশন' প্রযোজনাটি সম্পর্কে বলেছে : 'আ প্লে অব দ্য পিপল... ফর দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল'। কিন্তু ৯টি অভিনয়ের পর নাটকটি নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। ঙ্গুগি ওয়া থিয়োঙ্গোকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হয়।

১৯৭৮-এ থিয়োঙ্গোকে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৯৮১-তে তিনি 'মাইতু নুগুরা' (মা, তুমি আমার জন্য গান গাও) নামে আর একটি নাটক লেখেন। আগের নাটকের মতোই গ্রামবাসীরা নাটকটি নিয়ে আলোচনা করে। সংযোজন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে। প্রচুর মানুষ নাটকের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবির 'জাতীয় নাট্যশালা'র কর্তৃপক্ষ কোনও ব্যাখ্যা বা আগাম নোটিস না দিয়ে তাদের মহড়া দেওয়া বন্ধ করে দেয়।

এরপর গ্রামবাসীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটকটির অভিনয়ের ব্যবস্থা করে। ১০টি অভিনয়ের পর যখন ১৫০০০ দর্শক নাটকটি দেখে ফেলেছেন, তখন কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটমঞ্চে নাটকটির অভিনয় বন্ধ করে দেন। সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে সরকারি নিপীড়নের কথা বলা হয়। ফল হয় মারাত্মক। সরকার কামিরিথুতে নাটক করাই নিষিদ্ধ করে দেয়। 'মাইতু নুগুরা' নাটকটির অভিনয়ও বন্ধ করে দেয়। মুক্তমঞ্চটি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। নাট্যকার ও নাট্যকর্মীদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করা হয়।

এইভাবে তৃতীয় বিশ্বে থিয়েটার যেখানে প্রকৃত গণমুখী চরিত্র নিয়েছে, সেখানেই রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে বাধা এসেছে। কারণ অধিকাংশ দেশেই 'উন্নয়ন'-এর অর্থ

ধনীর আরও ধনী হওয়া। গরিবের আরও গরিব হওয়া। কৃষকের ভূমিহীন হওয়া। শ্রমিকের বেকার হওয়া।

'কামিরিথু' তৃতীয় বিশ্বের 'পপুলার থিয়েটার'-এর এক আদর্শ দৃষ্টান্ত। সত্যিকারের জননাট্য। জনগণের মধ্য থেকেই উদ্ভূত হয়েছে এই থিয়েটার। এই থিয়েটারে জনগণই প্রতিনিধিত্ব করেছে। নেতৃত্ব দিয়েছে। অংশগ্রহণ করেছে। জনগণের উপলব্ধি ও অংশগ্রহণের মাধ্যমেই সমস্ত নাট্য-প্রযোজনটি সংঘটিত হয়েছে। নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। সরকারি বা বেসরকারি সাহায্য ছাড়াই জনগণ তাদের সাংগঠনিক ক্ষমতা দিয়ে সকলকে সম্মিলিত করতে পেরেছে।

নাটক এখানে পণ্য নয়। নাটক এখানে আদর্শবাদী বাগাড়ম্বর নয়। সবজান্তা বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক দলের দলীয় মতাদর্শের প্রচার নয়। নাটক এখানে জীবনের মৌল অর্থ প্রকাশে একটি সৃজনশীল শিক্ষণ প্রক্রিয়া। সরকারি দমননীতির বিরুদ্ধে বৃহত্তর গণসংগ্রাম ও প্রতিরোধের পথ। বাস্তবতার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের গবেষণাগার। সম্মিলিত ও সুসংগঠিত প্রতিবাদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। যে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামো নিপীড়নের জন্ম দেয়, সে বিষয়ে প্রশ্ন তুলতে, সেই কাঠামো পরিবর্তন করতে এই নাট্য-প্রক্রিয়া জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে। প্ররোচিত করে। একটি নির্দিষ্ট সমাপনের মোহনায় তাদেরকে পৌঁছে দেয়।

॥ ৫ ॥

জিম্বাবোয়ে। দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থিত। ১৯৮০ সালের ১৮ এপ্রিল স্বাধীনতা লাভ করে। সরকারি নাম : রিপাবলিক অব জিম্বাবোয়ে। রাজধানী : হারারে। প্রধান উৎপন্ন ফসল : ভুট্টা। দেশের মানুষের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম উপায় পশুপালন।

জিম্বাবোয়ের গ্রামবাসীদের একটি প্রিয় উৎসব 'পুংওয়ে'। এই উৎসবে ব্যক্তিগতভাবে বা দলীয়ভাবে স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়ায় গান, নাচ ও নাটকীয় দৃশ্য পরিবেশন করা হয়। এখানে যে কেউ অংশগ্রহণ করতে পারে। গ্রামবাসীরাই এই উৎসবের আয়োজন করে। এটা তাদের আত্মপরিচয়।

জিম্বাবোয়ের এই দেশজ আঙ্গিকের মধ্যেই তাদের প্রধান সমস্যাগুলি অভিনীত হয়। পর্যালোচিত হয়। সবাই বৃত্তাকারে বসে। বৃত্তের কেন্দ্রে তাৎক্ষণিক নাট্য বা মূকাভিনয় শুরু হয়। উপস্থাপিত সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য গ্রামবাসীদের আহ্বান করা হয়। তাদের দৃশ্য বা চরিত্র বা ঘটনা পরিবর্তনের স্বাধীনতা দেওয়া হয়। অভিনয় শেষে আলোচনা হয়।

এই বিশেষ নাট্যনির্মাণে ও বিশ্লেষণে বিরতিহীন প্রক্রিয়া চলতেই থাকে।

প্রতিটি পর্যায়ে গ্রামবাসীরা যুক্ত হয়ে যায়। প্রতিটি বিশ্লেষণ ও কৌশলকে যথাযথ গুরত্ব দেওয়া হয়। নতুন ভাবনাকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নাটকে পরিবর্তন আনা হয়। প্রথামাফিক চূড়ান্ত ও পরিশীলিত অভিনয় এই প্রক্রিয়ার বিরোধী।

বিশ শতকের সত্তরের দশকে স্মিথ শাসনের বিরুদ্ধে জিম্বাবোয়ের স্বাধীনতা-যুদ্ধের সময় এই 'পুংওয়ে' উৎসব মানুষের মধ্যে বিপ্লবী চেতনা সঞ্চারিত করেছিল।

॥ ৬॥

কিউবা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সবচেয়ে বড় দ্বীপ। ১৯০১-এ স্বাধীনতা লাভ করে। অধিবাসীরা ইউরোপ, এশিয়া এবং আফ্রিকার অধিবাসীদের বংশধর। সরকারি ভাষা : স্প্যানিশ। সরকার গঠন : সমাজতন্ত্রী। অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা কৃষি। প্রধান কৃষিজ আখ। এর ওপরেই এই দ্বীপের অর্থনীতি নির্ভরশীল। চিনি উৎপাদন কিউবার প্রধান শিল্প।

বিপ্লবোত্তর কিউবায় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় প্রশিক্ষিত বারোজন পেশাদার শিল্পী নিয়ে গঠিত 'এল গ্রুপো তিয়েত্রো এসকামব্রে' নাট্যদল ১৯৬৮-তে কিউবার ঘন জঙ্গলবেষ্টিত পাহাড়ি এলাকায় দরিদ্র কৃষকদের নিয়ে নাটক করে। তারা প্রথমে ওই বিশেষ গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের সঙ্গে গবেষণা ও পর্যালোচনা করে। এক অভিজ্ঞ পরিচালকের তত্ত্বাবধানে সম্মিলিতভাবে গবেষণাটি পরিচালিত হয়। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে তাৎক্ষণিক নাট্য উদ্ভাবনের চেষ্টা করা হয়। সবাই নাটক লেখায় অংশগ্রহণ করে। একজন দক্ষ নাট্যকারও থাকে।

'এসকামব্রে' দলের বৈশিষ্ট্য হল, নাটকাভিনয় চলাকালীন দর্শকের অংশগ্রহণ ও বিতর্ক বা সওয়াল-জবাব। এই বিতর্ক অভিনয়ের একটি আবশ্যিক, অপরিহার্য অংশ। অভিনয় শেষে কোনও আলাপন নয়। নাটকের প্রথমে, মাঝে ও শেষে বিভিন্ন পর্যায়ে তা যুক্ত থাকে। এই নাট্যে সমস্যার কোনও সমাধান চাপিয়ে দেওয়া হয় না। সম্ভাব্য সমস্ত পথ উন্মুক্ত থাকে। অভিনয়ের পর সদস্যরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে আলোচনা করেন। বিতর্ক ও আলোচনা থেকে প্রাপ্ত প্রয়োজনীয় তথ্য নাটকে সংযুক্ত করেন। প্রয়োজনে অভিনয়ে পরিবর্তন আনেন।

নাটকের শুরুতে বলা হয় : 'আজ আমরা আপনাদেব সামনে একটা বিচারসভা বসাব। আপনারা বিচারকের দায়িত্বে থাকবেন। যেসব ঘটনা ও সাক্ষী আপনাদের সামনে আমরা হাজির করব, সেসবের আপনারাই বিচার করবেন। রায় দেবেন।' তারপর দর্শকদের মধ্য থেকে ৮/১০ সদস্য-বিশিষ্ট জুরি বোর্ড নির্বাচন করা হয়।

তাঁরা চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করেন।

'এসকামব্রে' তার নাট্যক্রিয়ায় স্তানিস্লাভস্কি, ব্রেশট ও কমেদিয়া দেল আর্তের সাহায্য নেয়। অভিনেতাদের প্রশিক্ষণ ও চরিত্রসৃজনে স্তানিস্লাভস্কির 'মেথড' প্রয়োগ করে। প্রহসন অভিনয়ের জন্য কমেদিয়া দেল আর্তের আঙ্গিককে ব্যবহার করে। নাটকের উদ্দেশ্য ও কাঠামোর জন্য ব্রেশটের এপিক নাট্যধারাকে অনুসরণ করে। এরা 'তিয়েত্রা মামকি' ও 'বুফো' নামে দুটি দেশজ 'লোক-আঙ্গিকেও পটু।

ব্রেশটের অভিনয়-পদ্ধতির সঙ্গে 'এসকামব্রে' পদ্ধতির তফাত হল— ব্রেশটের অভিনেতারা দর্শকের সামনে অভিনয়ের সময় নিজেদের অভিনয়কে দেখান। 'এসকামব্রে'-র অভিনেতারা দর্শককে অভিনয় করান এবং তাদের পাশে নিজেদেরকেও অভিনয় করতে দেখেন।

॥ ৭ ॥

জামাইকা। ক্যারিবিয়ান মহাসাগরের তৃতীয় বৃহত্তম দেশ। ৬ অগাস্ট, ১৯৬২ তে স্বাধীনতা লাভ করে। সরকার গঠন : দুই কক্ষবিশিষ্ট মন্ত্রণাসভা। এখানে আখ, কফি, মশলা, কলা ও অন্যান্য গ্রীষ্মমণ্ডলীর ফলের চাষ হয়। অধিবাসীরা বেশির ভাগই আফ্রিকান নিগ্রো। অধিকাংশই খ্রিস্টধর্মাবলম্বী। সরকারি ভাষা : ইংরাজি।

১৯৭৭-এ শ্রমজীবী নারীদের নিয়ে গড়া রীতিমতো প্রশিক্ষিত জামাইকার পেশাদার নাট্যদল 'সিসট্রেন' ১৯৮৩-তে আন্তর্জাতিক পরিচিতি লাভ করে। এরা চিনিকল ও কারখানার শ্রমিক, বন্দি ও বেকারদের নিয়ে ১০০-র বেশি কর্মশালা ও পাঁচটি পূর্ণাঙ্গ নাটক পরিচালনা করেছে।

'সিসট্রেন'-এর ইস্তাহারে বলা হয়েছে, 'নারী হিসেবে কীভাবে আমরা নির্যাতিত হই, পুরুষরা আমাদের সঙ্গে কত খারাপ ব্যবহার করে, সে বিষয়ে আমরা নাটক করতে চাই।' 'সিসট্রেন' এমন একটি নারী পরিচালিত আত্মনির্ভরশীল দল, যারা এমন নাটক করে যা নারীদের, বিশেষত ক্যারিবিয়ান নারীদের জীবনকে প্রভাবিত করে। তাঁদের চেতনা সম্প্রসারণের কাজ করে। সমাজে নারীদের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তোলে। প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানায়। নাটককে সমস্যা সমাধানের হাতিয়ারে পরিণত করার জন্য কর্মশালার ব্যবস্থা করে। সমবায় সংগঠন গড়ে তুলতে অংশগ্রহণকারী গোষ্ঠী সদস্যদের জন্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে।

'সিসট্রেন' প্রথমে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের অনুশীলনের মাধ্যমে

শারীরিক অভিব্যক্তির শিক্ষা দেয়। কর্মশালা শেষ হয় তাৎক্ষণিক নাট্যনির্মাণে। দ্বিতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে। যেমন কেউ হয়তো বলে, সে শৈশবাবস্থায় বিদ্যালয়ে যেতে পারেনি। কারণ তার মা-বাবা দু'জনকেই গ্রাসাচ্ছাদনেব জন্য মাঠে যেতে হত, ও তাকে ভাই-বোনদের দেখাশোনা করতে হত। একজন বলে, অর্থের অভাবে সে তার যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা করাতে পারছে না। কেউ বলে, অভাবের জ্বালায় সে তার মেয়েকে বিক্রি করে দিয়েছে। কেউ বলে, স্বামী মদ খেয়ে এসে তার ওপর রোজ অত্যাচার চালায়। এইভাবে সমাজের ক্ষতগুলি প্রকাশ হয়ে পড়ে। সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোটা পরিষ্কার হয়ে দেখা দেয়।

ওই সমস্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নাটকের খসড়া কাহিনি লিখিত হয়। মহড়া চলতে চলতে তা মার্জিত হতে থাকে। ওইসব বিষয়ে আরও গভীব গবেষণা ও সমীক্ষা চলতে থাকে। বাড়তি তথ্য সংগ্রহ চলে। কাহিনি রচনার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়া হয়। গবেষণায় প্রাপ্ত বিশ্লেষণ ও তথ্য কাহিনিব মধ্যে যুক্ত হয়। তাৎক্ষণিক নাট্য উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে কাহিনিটি এগোতে থাকে। এইভাবে খসড়া কাহিনিটি একটি পূর্ণাঙ্গ নাট্য প্রযোজনায় রূপান্তরিত হয়ে জনসমক্ষে পরিবেশিত হয়। সমস্যাগুলি ব্যাপক জনসমষ্টির গোচরে আসে।

'সিসট্রেন'-এর প্রযোজনাগুলি আফ্রো-ক্যারিবিয়ান সাংস্কৃতিক পরম্পরা, দেশজ সাহিত্য-সংগীত-লোকনৃত্য দ্বারা প্রবলভাবে জারিত। তারা মনে করে, দর্শকদের কাছ থেকে সাড়া পাবার জন্য ও তাদেরকে প্রভাবিত করার জন্য দেশজ প্রকরণ বিশেষ সহায়ক। তাদেব অন্যতম প্রযোজনা 'বেলিউওম্যান ব্যাভারাংগ' সম্পূর্ণ দেশীয় উপাদানে তৈরি। এই নাটকটি অতীতে বিচ্ছিন্নভাবে নারীর ওপর যে নির্যাতন ঘটেছে বা বর্তমানে যা ঘটছে, সেসব একত্রে গেঁথে তৈরি হয়েছে।

'নাটক জীবনের প্রতিফলন নয়, সমাজেব মুখোশ উন্মোচন'— এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে নির্মিত 'সিসট্রেন' এখন এক বিরাট সংগঠন। জগৎজোড়া তার সুনাম। পৃথিবীব্যাপী তাদের নেটওয়ার্ক।

॥ ৮ ॥

ফিলিপিন্স এশিয়া মহাদেশের একটি দ্বীপপুঞ্জ। সরকার গঠন : একদলীয় প্রজাতন্ত্র। দেশটি কৃষিপ্রধান। বনজ সম্পদেও যথেষ্ট সমৃদ্ধ। শিক্ষিতের হার ৮৩.৪ শতাংশ। সরকারি ভাষা . ফিলিপিনো, ইংরাজি। ৪৭টি দৈনিক খবরের কাগজ নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

'ফিলিপিন্স এডুকেশনাল থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন'-এর (পেটা) জন্ম ১৯৬৭

সালে। 'পেটা'-র লক্ষ্য : নাট্যকলার শৈল্পিক উৎকর্ষ ও গণমুখী সৃজন। নাট্যদল এবং অন্যান্য গণসংগঠনকে নিয়ে জনগণের সম্মিলিত পাটাতন সৃষ্টি ও তা শক্তিশালী করার জন্য সমবায় তৈরি। 'পেটা'-র একাধিক শাখা আছে, যেমন 'কালীনঙ্গা অঁসম্বল', 'দ্য সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ থিয়েটার আর্টস ইন দ্য সাউথ-ইস্ট এশিয়া', 'মেট্রো ম্যানিলা টিপ থিয়েটার লিগ' ইত্যাদি।

'পেটা' তার বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে শহরে ও গ্রামাঞ্চলে নাটক করে। কর্মশালা করে। দেশজ আঙ্গিক নিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়। অভিনেতা-প্রশিক্ষক-সংগঠন-গবেষকদের জন্য কর্মসূচি নেয়। এখানে প্রশিক্ষিত হয়ে বিদেশের নাট্যকর্মীরা নিজের দেশে গিয়ে নাট্যদল তৈরি করেন।

বিশাল জনসমর্থনই 'পেটা'-র শক্তি। 'পেটা'-র কর্মশালা চালনার প্রক্রিয়াটি পর্যালোচনা করলেই আমরা সেটা বুঝতে পারব। প্রথম পর্যায়ে 'পেটা'-র নাট্যকর্মীরা একটি অঞ্চলে গিয়ে সেখানকার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি নিয়ে গবেষণা করেন। স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গো তাঁরা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও গড়ে তোলেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁরা একটি কর্মশালার আয়োজন করেন। এই কর্মশালায় তাঁরা দেশজ শিল্প-প্রকরণ ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দেন। বুর্জোয়া সংস্কৃতির অনুকরণকে নিরুৎসাহিত করেন। অংশগ্রহণকারীদের অভিনয় শিক্ষা দেন। একইসঙ্গো তাঁরা ওই অঞ্চলের একটি সামাজিক চিত্র উপস্থাপনার চেষ্টা করেন। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা তাঁদের নিজেদের অথবা গোষ্ঠী-জীবনের দুঃখ, অত্যাচার ও নিষ্ফল লড়াইয়ের গল্প বলেন। সেইসব গল্পের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিকভাবে ছোট ছোট নাট্যদৃশ্য তৈরি হয়। নাট্যরচনাও চলতে থাকে। তারপর চলে নিয়মিত মহড়া, গান রচনা, মুখোশ ও পোশাক তৈরি। সবশেষে, তাঁরা সমস্ত গ্রামবাসীদের সামনে অভিনয় করেন অথবা ঘরোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠান শেষে তাঁরা উপস্থিত দর্শকদের মতামত শোনেন। তাঁদের সঙ্গো চিন্তা-ভাবনার বিনিময় করেন।

কর্মশালার শেষ পর্যায়ে 'পেটা'-র নাট্যকর্মীরা কর্মশালার সার্বিক মূল্যায়ন করেন। ওই অঞ্চলের জন্য একটি নাট্যদল তৈরি করে চলে যান। ওই দল তাঁদের প্রদর্শিত পথে নাটক করতে থাকে।

পশ্চিম ফিলিপিন্সের মিনডানাও অঞ্চলে বিভিন্ন গির্জা ও শিক্ষা সংগঠনগুলির ভিতর থেকেও উঠে এসেছিল হাজার হাজার নাট্যদল। ক্ষেতমজুর ও বস্তিবাসীদের সংগ্রামেও সমর্থন জুগিয়েছিল 'পপুলার থিয়েটার'। মার্কোসের শাসনে এরা প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকা নিয়েছিল। অভিনেত্রী, কবি, শিল্পী ও 'চার্চ-

কনফারেন্স'-এর মহিলা সম্পাদক কার্ল গ্যাসপার এই নাট্যদলগুলির সঙ্গে অংশগ্রহণ করার জন্য ১৯৮৩-তে বিনা বিচারে জেলে বন্দি হয়েছিলেন।

॥ ৯ ॥

নাইজিরিয়া। পশ্চিম আফ্রিকার বৃহত্তম দেশ। আফ্রিকার মধ্যে এই দেশের জনসংখ্যাই সর্বাধিক। অধিবাসীদের মধ্যে ৪৭ শতাংশ ইসলাম ও ৩৪ শতাংশ খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। সাক্ষরতার হার ২৫ শতাংশ। সরকারি ভাষা ইংরাজি। অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী। খনিজ সম্পদেও দেশটি সমৃদ্ধ।

নাইজিরিয়ার 'আহমাদু বেলো বিশ্ববিদ্যলয়'-এর নাট্যশিক্ষার্থীরা ১৯৭৭ থেকে উন্নয়নমুখী নাট্য-প্রকল্পে কাজ করছেন। এঁরা পূর্ব-পরিকল্পিত একটি অঞ্চলে গিয়ে সেখানকার জনগণের বিভিন্ন সংকট নিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসেন। তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করেন। বিশ্লেষণের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক নাটক উদ্ভাবন করেন। তারপর সংশ্লিষ্ট স্থানে গিয়ে জনগণের সামনে সেগুলি অভিনয় করেন। অভিনয় শেষে দর্শকদের সঙ্গে মিলিত হন। নাটকে উত্থাপিত সংকটাবলি নিয়ে আলোচনা করেন। সমাধান-সূত্র খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন।

১৯৮০ সালে এইরকম একটি কর্মশিবিরে যুক্ত ছিলেন ৪ জন বয়স্ক শিক্ষা কর্মকর্তা, ১০ জন নাট্যশিক্ষার্থী ও গ্রামের ১৫ জন তরুণ কৃষক। সেখানে তাৎক্ষণিক নাট্য উদ্ভাবন প্রক্রিয়ায় কৃষকদেব সমস্যাগুলি নিয়ে নাটক তৈরি করা হয়। তারপর সমালোচনা ও বিশ্লেষণ করার জন্য দলের অন্য সদস্যদের আহ্বান জানানো হয়। সমালোচনার বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করে নাটকটির পুনরাভিনয় হয়। এভাবেই চলতে থাকে। প্রতিবার অভিনয়ের সময় দর্শকরা নাটকের বিভিন্ন অংশ সংশোধনের উদ্দেশ্যে অনবরত হস্তক্ষেপ করে যান। সেই সঙ্গে অবিরতভাবে নাট্যকাহিনি পুনর্গঠিত হতে থাকে। এর উদ্দেশ্য নাট্যাভিনয়ের উৎকর্ষ সাধন নয়— আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির গভীরে প্রবেশ করা। অনুসন্ধান চালানো। যেমন একটি ঘটনার কথা ধরা যাক।

লাইসেন্স পুনর্নবীকরণের সময় ঘুষ না দেওয়ায় এক সরকারি কর্মচারী এক ওষুধের দোকানের মালিককে অযথা হয়রান করতে থাকে। মালিক অভিযোগ জানাতে থানায় যায়। থানার পুলিস ঘুষ ছাড়া তাকে দারোগার সঙ্গে দেখা করতে দেয় না। মালিক বাড়ি ফিরে আসে।

ঘটনার এইটুকু অংশ সবাইয়ের সামনে অভিনয় করে দেখানো হয়। এক কৃষক-দর্শক ওষুধ বিক্রেতার নিষ্ক্রিয় মনোভাবকে সমর্থন করেন না। তিনি ওই

ভূমিকায় অভিনয় করতে চান। তাঁকে অভিনয়ের সুযোগ দেওয়া হয়। তিনি পুলিসকে রাজি করাবার বহুরকম চেষ্টা করেন। নালিশেরও ভয় দেখান। তবু ঘুষ ছাড়া কোনও কথাই সে শুনতে চায় না। উপরন্তু, তাঁকে থানা থেকে বের করে দেয়।

এবার অভিনয়-পরবর্তী আলোচনায় ঠিক হয়, সম্মিলিত প্রতিবাদের জন্য সব ওষুধ ব্যবসায়ীর ঐক্য প্রয়োজন।

অভিনয়ের তৃতীয় পর্যায়ে গ্রামবাসীরা দলবদ্ধ হয়ে পুলিসের কাছে যান। প্রতিবাদ-ধরনা ও মিছিল করেন। থানার দারোগাকে লিখিত অভিযোগ দেন। দারোগা ঘুষ চায়। ব্যবসায়ীরা ঘুষ দিতে অস্বীকার করে। দারোগা বিষয়টি সরকারি দপ্তরে পাঠিয়ে দেয়।

আবার আলোচনা হয়। অংশগ্রহণকারীরা তাঁদের কৌশল পরিবর্তন করেন। তাঁরা সবাই একত্রে সরকারি দপ্তরে যান।

এইভাবে নাট্য-প্রক্রিয়াটি চলতেই থাকে। সামাজিক ক্ষতগুলি চিহ্নিত করতে করতে গ্রামবাসীরা নিজেদের অবস্থান সম্বন্ধে সচেতন হতে থাকেন। একজোট হয়ে সমাধানের পথ খুঁজতে থাকেন। পেয়েও যান। আবার অন্য সমস্যায়ও জড়িয়ে পড়েন।

॥ ১০ ॥

আফ্রিকা মহাদেশের বহুদলবিশিষ্ট প্রজাতন্ত্রী বোতসোয়ানা রাষ্ট্র ১৯৬৬-র ৩০ সেপ্টেম্বর স্বাধীন হয়। দেশের মধ্যে পশুচারণ ভূমিই সর্বাধিক, ৭৫.২ শতাংশ।

১৯৭৪-এ বোতসোয়ানার বোকালাকার পাঁচটি গ্রামে 'লায়েদজা বাতানানি' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গ্রামবাসীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের বিভিন্ন আর্থিক সমস্যার তথ্য সংগ্রহ করে। সেগুলি বিশ্লেষণ ও বাছাই করে। নাটকে অভিনয়ের জন্য যোগ্য অভিনেতাদের নির্বাচন করে। দৃশ্য তৈরি হয়। মহড়া দেওয়া হয়। গান যোগ করা হয়। নাটকটি অভিনয় করা হয়। শেষে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে দর্শকদের সাথে আলোচনা চলতে থাকে। নাটকে উত্থাপিত সমস্যাটি নিয়ে দর্শকদের কাছে সমাধান-সূত্র চাওয়া হয়। গ্রামবাসীরা সমাধানের রাস্তা খুঁজতে শুরু করেন।

'লায়েদজা বাতানানি'-র এই নাট্য-প্রক্রিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান এই যে, তা ঘানা, সিয়েরা লিয়োন, তানজানিয়া, জাম্বিয়া, জিম্বাবোয়ে, নাইজিরিয়া ইত্যাদি স্থানের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ে। এইসব স্থানে 'লায়েদজা বাতানানি'র মতো অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গড়ে ওঠে।

॥ ১১॥

পূর্ব আফ্রিকার স্বাধীন রাষ্ট্র উগান্ডা। দেশের প্রধান উপজীবিকা কৃষি। বন থেকে মেহগনি ও অন্যান্য মূল্যবান কাঠ সংগ্রহ করা হয়। জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৯৫ জনই গ্রামবাসী। সরকারি ভাষা ইংরাজি, স্বহিলি।

১৯৬৬-তে উগান্ডার মাকারের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ভ্রাম্যমান নাট্যদল 'জনগণের কাছে থিয়েটারকে পৌঁছে দেওয়ার' লক্ষ্যে তাদের প্রযোজনা নিয়ে বিভিন্ন প্রাদেশিক শহর ও গ্রাম এলাকা ভ্রমণ করে। এই দৃষ্টান্তের অনুসরণে তানজানিয়া, কেনিয়া, জাম্বিয়া ও মালাউইর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা একত্রে একই ধরনের পরিভ্রমণ কর্মসূচি নেয়। এদের মধ্যে ১৯৬৯-এ প্রতিষ্ঠিত জাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 'চিকওয়াকওয়া' (তৃণমূল) নাট্যদল সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই নাট্যদল স্থানীয় উন্নয়নকর্মীদের সহায়তায় সপ্তাহব্যাপী কর্মশালা পরিচালনা করে। এই কর্মশালায় তৈরি প্রযোজনা ওই অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় প্রদর্শিত হয়। তবে গ্রামাঞ্চলে বা ছোট প্রদেশ শহরগুলির চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে তাদের প্রভাব পড়েছিল বেশি।

॥ ১২॥

ভারত। কৃষিপ্রধান দেশ এবং কৃষিই ভারতীয় অর্থনীতির মূল স্তম্ভ। খাদ্যশস্যের মধ্যে ধানই প্রধান। প্রাকৃতিক সম্পদেও ভারত খুবই সমৃদ্ধশালী। দেশের অরণ্যে প্রায় ৩৫০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী ও প্রায় ১২০০ প্রজাতির পাখি দেখতে পাওয়া যায়।

ভারতের দক্ষিণে অবস্থিত তামিলনাড়ুর অস্পৃশ্য হরিজন গোষ্ঠী ১৯৭৪ সালে 'অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য রুরাল পুওর অ্যান্ড দ্য ইনটিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি' নামে একটি সংগঠন তৈরি করে। এই সংগঠন 'অ্যাকশন ফর কালাচারাল অ্যান্ড পলিটিকাল চেঞ্জ' নামে একটি জনসংগঠনের সহায়তায় নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে হরিজন ও প্রান্তিক চাষিদের ভূমিহীনতা, কাজের অসহ পরিবেশ, বেকারত্ব, শাসক গোষ্ঠীর নিপীড়ন, অস্পৃশ্যতা, পরিষেবার অভাব, মদ্যাসক্তি প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরে। প্রতিটি নাটকাভিনয়ে দর্শকদের নাটকে উপস্থিত সমস্যা সম্পর্কিত প্রশ্নের মুখোমুখি করা হয়। তাঁদের এমন সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়, যাতে তাঁরা নিজেরাই বোঝেন তাঁদের নিপীড়ন ও শোষণের কাঠামো কতকগুলি আর্থ-সামাজিক কারণের ওপর নির্ভরশীল, তার পরিবর্তনও সম্ভব, এবং পরিবর্তনের সবচেয়ে কার্যকর পথ হল ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ পদক্ষেপ।

এদের নাটক পরিবেশনটি অভিনব। নাটকাভিনয়ের সময় একজন অভিনেতা দর্শকের আসনে চলে যান। সেখানে কখনও তিনি চরিত্র হয়ে থাকেন। কখনও চরিত্র থেকে আলাদা হয়ে যান। এমনভাবে কথা বলেন, যাতে দর্শকদের মধ্যে প্ররোচনার সৃষ্টি হয়। কখনও তিনি দর্শকদের মধ্যে বসে নাটকে উপস্থাপিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনার পর তিনি আবার মঞ্চে ফিরে আসেন। অন্য আরও একটি কৌশল প্রয়োগ করা হয়। একজন অভিনেতা মঞ্চ থেকেই দর্শকদের উত্তেজিত করতে থাকেন। অথবা তাঁর নেতৃত্বে দর্শকরাও মঞ্চ থেকে পরিবেশিত কোনও বিষয়ে প্রতিবাদ করতে পারেন।

এইসব নাট্যকৌশলই ব্যবহার করা হয়— নাটকে উত্থাপিত সমস্যা ও তার সমাধানের জন্য। আলোচনার মাধ্যমে দর্শকরা একটা সমাধানে উত্তীর্ণ হন। এই সমাধান তাঁদের নিজস্ব অর্জন। কোনও মন্ত্রী, ধর্মীয় নেতা বা বুদ্ধিজীবীর আরোপিত মতামত বা বক্তৃতা নয়। রঙিন মোড়কে সাজানো অব্যর্থ সমাধান নয়। তাত্ত্বিকের কোনও পথনির্দেশক বইও নয়। সমাজের কাঠামোগত পরিবর্তনই তার লক্ষ্য। এই অনুষ্ঠান থেকে গৃহীত বিশ্লেষণী ভাবনা কর্মে রূপান্তরিত হয়।

এই সংগঠন শুধু গ্রামাঞ্চলেই কাজ করে। কারণ গ্রাম এলাকাতেই তৃতীয় বিশ্বের আর্থিক ও সামাজিক সংকট প্রকট। জনকল্যাণমূলক নাটক করার এটাই আদর্শভূমি। এখানেই নাট্যকর্মীর শ্রম, ঘাম ও মেধার প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব।

এই সংগঠনের নাট্যকর্মীরা দেখিয়েছেন, সামাজিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় থিয়েটারের সুমহান শক্তিকে ব্যবহার করা যেতে পারে। থিয়েটারে নির্যাতিতরা তাদের সমস্যার কথা প্রকাশ করতে পারে। থিয়েটার সমাজ-কাঠামোয় বিদ্যমান শোষণ সম্পর্কে নির্যাতিতদের বোধ তীক্ষ্ণতর করতে পারে। সংগঠিতভাবে অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আত্মবিশ্বাস ও শ্রেণী-সচেতনতা গড়ে তুলতে পারে।

কলকাতার 'কমিউনিকেশন ফর কালচারাল অ্যাকশন' সুন্দরবনের গ্রামে গিয়ে এই ধরনের সচেতন বা বিবেক-উদ্বোধক নাটক করে। অন্ধ্রপ্রদেশের সেকেন্দ্রাবাদে 'কালচারাল ফোরাম'-ও দূর দূর গ্রামে গিয়ে এইরকম ওয়ার্কশপ করে।

॥ ১৩ ॥

বাংলাদেশ। রাজধানী : ঢাকা। ৮০ শতাংশের বেশি মুসলিম। সাক্ষরতার হার ৩৪.৮ শতাংশ। চাষাবাদই বাংলাদেশের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। মোট কৃষিজমির ৮০ শতাংশে ধান এবং ৯ শতাংশে পাট চাষ হয়।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সমুন্নতির লক্ষ্যে ১৯৯২-তে 'রূপান্তর' নামে একটি সমাজহিতার্থী প্রতিষ্ঠান ভূমিষ্ঠ হয়। জন্মলগ্ন থেকেই এই প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বের বৃহত্তম গরান কাঠের বনাঞ্চল সুন্দরবনের পরিবেশ সংরক্ষণ, জলসম্পদের সঠিক ব্যবহার, জনগণ ও জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব, আদর্শ ইউনিয়ন পরিষদ গঠন ইত্যাদি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তৃণমূল জনগোষ্ঠীকে সচেতন ও উদ্যোগী করে তোলার সংকল্পে ব্রতী।

'রূপান্তর' দেশের শ্রীবৃদ্ধিতে থিয়েটারের অমূল্য মাধ্যমটিকে সহযোগী করে নিয়েছে। খুলনায় অবস্থিত এই কেন্দ্রটি প্রান্তিক, অনুন্নত, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত নারী-পুরুষ-শিশুদের সামাজিক, মানবিক ও সাংস্কৃতিক উন্মেষ ঘটানোর জন্য থিয়েটারের সুফলদায়ী ও কল্যাণকর প্রক্রিয়াকে সুনিপুণভাবে প্রয়োগ করে। নারী-নাট্যসংগঠন করে নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে নাটক করে। লোকনাট্যের উজ্জীবন ঘটায়। আধুনিকীকরণ করে।

'রূপান্তর'-এর সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ও বৈপ্লবিক কাজ হল, নাট্যকর্মীদের কর্মসংস্থান। 'রূপান্তর' প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম নাট্য শিক্ষায়তন 'ইনস্টিটিউট অব ফোক থিয়েটার'-এর পেশাদার নাট্যকর্মীর সংখ্যা এখন ১০৫। নারী নাট্যকর্মী ৩৩। পুরুষ নাট্যকর্মী ৬২। এঁদের মাসিক বেতন ৩০০০ থেকে ১৫০০০ বাংলাদেশ টাকা।

'রূপান্তর' তার নাট্যকর্মীদের একটি বড় অংশকে থিয়েটার ও লোকসংস্কৃতির পরিমণ্ডল থেকে সংগ্রহ করে। গ্রামের অর্ধশিক্ষিত, ক্ষেত-খামারে কর্মরত ২০ থেকে ৩৫ বছরের যেসব ছেলেমেয়ে নিজেদের ইচ্ছায় বা শখে অল্প-স্বল্প গান শিখেছে, ঢোল বাজাতে পারে, পাড়ায় পাড়ায় যাত্রা বা নাট্যানুষ্ঠানে অভিনয় করে, সেইসব ছেলেমেয়েরাই 'রূপান্তর'-এর পেশাদার নাট্যকর্মী। এদের মধ্যে আছে প্রযোজনা আধিকারিক, ব্যবস্থাপক, তথ্য উন্নয়ন ও সংরক্ষণ অধিকর্তা, অভিনেতা-অভিনেত্রী ও ২০ জন নাট্য-প্রশিক্ষক।

এই নাট্যকর্মীদের প্রথমে নাট্যপ্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষিত করা হয়। তারপর তাঁরা জনজীবনের একটি সমস্যা বেছে নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন। নিজেদের নাট্য গবেষণাগারে সেই বিষয়টি নিয়ে চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করেন। একটি নাট্য কাহিনির কাঠামো তৈরি করেন। ১৫ দিন একটানা কর্মশালায় সেটির মহড়ার পর প্রদর্শনী হয়। এখন পর্যন্ত এইরকম ৩৮টি প্রযোজনার ২০০৯টি প্রদর্শনী হয়েছে। প্রতিটি অভিনয়ই হয়েছে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। আনুমানিক দর্শক সংখ্যা ৩২ লাখ ২৫ হাজার। নারী দর্শক ৮ লাখ ৬২ হাজার। পুরুষ দর্শক ২৩ লাখ ৬৩ হাজার।

'রূপান্তর' নাট্যমহলকে একটি নজিরবিহীন শিল্প-আঙ্গিকও উপহার দিয়েছে। ঐতিহ্যবাহী অথচ লুপ্তপ্রায় 'পটগান'কে পুনর্নির্মাণ করে সে এক যুগান্তকারী ও মনোজ্ঞ নাট্যশৈলী নির্মাণ করেছে।

'পট' শব্দের অর্থ ছবি আঁকার কাগজ বা কাপড়। পটের ওপর আঁকা ছবিকে বলা হয় 'পটচিত্র'। মাটির তৈরি বড় থালার ওপর ছবি আঁকাকেও 'পট' বলে। যেমন কলকাতার কালীঘাটের পট। পটচিত্রকর ও প্রদর্শকদের বলা হয় পটুয়া, পটীকার, পটিদার, পট্টিদার বা মস্করী। দু'ধরনের পট আছে— জড়ানো ও চৌকো। জড়ানো পটে ধারাবাহিক চিত্রমালার মধ্যে পৌরাণিক, সামাজিক বা অলৌকিক বিষয়বস্তুকে তুলে ধরা হয়। গানের মাধ্যমে যখন তার আখ্যানভাগ বর্ণনা করা হয়, তখন তাকে বলা হয় 'পটগান'। চৌকো পট শুধু বিচ্ছিন্ন একটি চিত্র।

পট অত্যন্ত প্রাচীন শিল্প। প্রায় দু'হাজার বছর তার বয়স। পটগান এক সময় লোকসংস্কৃতির অন্যতম মাধ্যম ছিল। বাংলার গ্রামীণ জনগোষ্ঠী পটগানের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি তথ্য ও শিক্ষা গ্রহণ করেছে। পটুয়াদের পটে যমপুরীর ছবি এক সময় আবশ্যিক ছিল। পৃথিবীতে যারা ভালো কাজ করে না, মৃত্যুর পর যমপুরীতে গিয়ে তাদের শাস্তি পেতে হয়। এইভাবে মানুষের শুভবুদ্ধিকে জাগিয়ে তোলা ও লোকশিক্ষার মহান কাজেই পটুয়ারা নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছিলেন। পটগান গেয়ে তাঁরা জীবিকা নির্বাহও করতেন।

পশ্চিমবাংলার মেদিনীপুর জেলায়, ওড়িশা ও গুজরাতে এবং বাংলাদেশের দক্ষিণে সুন্দরবন অঞ্চলে এখন এই শিল্প সীমাবদ্ধ। বীরভূমের পটে এখনও পঞ্চকল্যাণী, নিমাইসন্ন্যাস, কৃষ্ণলীলার মতো পৌরাণিক পালার প্রাধান্য। মেদিনীপুরের পটে লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। পরিবার পরিকল্পনা, বন্যা ইত্যাদি সমসাময়িক বিষয় নিয়ে সেখানকার পটুয়ারা পট আঁকেন। ওড়িশার পটও খুব বিখ্যাত। সেখানে সরকারি বিপণন ব্যবস্থা ও পৃষ্ঠপোষকতার ফলে এই পটের প্রচার বেড়েছে। পুরীর কাছে রঘুরাজপুরে বহু পটুয়া থাকেন ও নিয়মিত পট আঁকেন। অনেক গবেষক মনে করেন, বাংলার পটশিল্পীরা বৌদ্ধযুগের চিত্রকরদের উত্তরসাধক। 'মাস্করী' উপাধিধারী বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বুদ্ধের সময় থেকে পটচিত্র এঁকে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করে। গুজরাতে এখনও 'চিত্রকর্থী'র অস্তিত্ব আছে। গুজরাতি ভাষায় 'চিত্রকর্থী' শব্দটির অর্থ পটগান। গুরুসদয় দত্ত 'পটুয়া সঙ্গীত' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। যামিনী রায় কালীঘাটের পটের ঘরানা নিয়েই ছবিতে এক নতুন ফর্ম সৃষ্টি করেছেন।

'রূপান্তর'-এর গবেষক ও শিল্পীরা এই দেশজ দৃষ্টিশোভন ও সুশ্রাবী

পটগানকে যুগোপযোগী করে নিয়েছেন। পৌরাণিক ও অলৌকিক কাহিনির পরিবর্তে তাঁরা পটগানকে জনসংযোগের ও উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে সুপ্রযুক্ত করেছেন। সুন্দরবন অঞ্চলের অবহেলিত ও অনালোকিত লোকশিল্পীদের নিয়ে তৈরি করেছেন পটগানের দল। লোককবি ইলিয়াস ফকির পটের ছবি এঁকে দিয়েছেন। গান লিখে তাতে সুর দিয়েছেন।

'রূপান্তর'-এর লোকশিল্পীরা পটগানের মধ্যে এনেছেন সুরের বৈচিত্র্য। পুরাতনী চিত্রের বদলে আধুনিক জটিল জনজীবনের চিত্র তুলে ধরেছেন। অভিনয় ও বিভিন্ন দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের সংযোজন ঘটিয়েছেন। উপস্থাপনের ভঙ্গিতে এনেছেন নতুনত্ব। সুন্দরবন-পরিবেশ, বনজ সম্পদ সংরক্ষণ, গণতন্ত্র, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, মানবাধিকার, আর্সেনিক, শিশুর বিকাশ, নারী-পুরুষের সম্পর্ক, সাক্ষরতা, বর্জ্য পদার্থের রাসায়নিক রূপান্তর, দুর্যোগ মোকাবিলা, পানি বণ্টন ইত্যাদি ৪০টি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁরা ৫০টির বেশি পটগান ইতিমধ্যে পরিবেশন করেছেন।

এ পর্যন্ত 'রূপান্তর' পরিবেশিত পটগানের দর্শকসংখ্যা শুধুমাত্র বাংলাদেশের ৬১টি জেলায় ৩০ লাখেরও বেশি। 'রূপান্তব'-এর পটগানের প্রদর্শনী হয়েছে সুইডেন, থাইল্যান্ড এবং ভারতের বিভিন্ন মঞ্চে ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমে। সর্বত্রই এই অভিনব আঙ্গিক প্রশংসিত ও অভিনন্দিত হয়েছে।

ঢাকার দুটি নাট্যদল 'আরণ্যক' ও 'ঢাকা থিয়েটার' প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের ভূমিহীন চাষীদের নিয়ে নাটক করে। স্থানীয় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ নাটককে ব্যবহার করে। খুলনার 'রূপান্তর' গোষ্ঠীও সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহের নাট্যগোষ্ঠীদের সংহত করে গ্রামে গিয়ে প্রান্তিক চাষী ও ভূমিহীন বর্গাদারদের সঙ্গে মিশে যায়। গ্রামের বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে নিয়মিত নাটক করে।

আরণ্যক তাদের প্রকল্পের নাম দিয়েছে 'মুক্ত নাটক'। ঢাকা থিয়েটার নাম দিয়েছে 'গ্রাম থিয়েটার'। আরণ্যকের লক্ষ্য : রাজনীতি-সচেতনতা ও ভূমিহীন কৃষকদের সংগঠন। ঢাকা থিয়েটারের লক্ষ্য : দেশজ আঙ্গিকের পুনরুজ্জীবন।

১৯৮৪-তে আরণ্যক তাদের কাজ শুরু করে। তারা সাধারণত একটি গ্রামে দু'সপ্তাহের জন্য বসবাস করে। সেখানকার মানুষদের কাছ থেকে ওই অঞ্চলের খাদ্য, বাচ্চাদের লেখাপড়া, চিকিৎসা ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে। একই সঙ্গে গণমাধ্যমগুলি যে শুধুই শোষক ও শাসক শ্রেণীর স্বার্থ প্রতিফলন ও প্রচার করে তা ভূমিহীন চাষীদের বোঝায়। তাদের বাস্তব জীবনের ঘটনা নিয়ে নাটক করার জন্য রাজি করায়। তৈরি হয় এক তাৎক্ষণিক নাটক। সেই নাটক অভিনয় করতে করতে ধীরে ধীরে তাঁদের মধ্যে আত্মপরিচয়, উৎসাহ ও প্রতিবাদের ভাষা

জেগে ওঠে।

এরপর একটি সভা ডাকা হয়। সেখানে ভূমিহীন ক্ষেতমজুর, প্রান্তিক চাষী, বিদ্যালয়-শিক্ষক, গ্রামীণ ডাক্তার, ফেরিওয়ালা ও ছোট ব্যবসাদাররা জড়ো হয়। নিজেদের সুখ-দুঃখের গল্প বলে। কীভাবে তারা শোষিত হয়। কীভাবে তাদের অধিকার হরণ করা হয়। এই সভার মাধ্যমে পরস্পরের অভিজ্ঞতার বিনিময় হয়। তারা ঐক্য খুঁজে পায়। উপলব্ধি করে, তারা একই শ্রেণীভুক্ত। তাদের শত্রুকে তারা চিহ্নিত করতে শেখে।

তাদের কঠিন জীবন-সংগ্রাম নিয়ে নাটকের কাহিনি রচিত হয়। তাতে সমাজ কাঠামো ও শোষক শ্রেণীর শোষণের কৌশলগুলির সবিস্তার উদাহরণ থাকে। সমাজের যাবতীয় ধর্মীয় ও নৈতিক বিধিনিষেধগুলি যে সুবিধাভোগী লোকদেরই অপকৌশল, তার ব্যাখ্যা থাকে।

সবশেষে, নাটকটি ওই অঞ্চল ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলগুলির গ্রামবাসীদের কাছে অভিনয় করে দেখানো হয়। অভিনয়ের পরে তিনদিন ধরে চলে পর্যালোচনা। তর্ক-বিতর্ক।

এই পদ্ধতির সমস্ত পর্যায়েই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আরণ্যকের নাট্যকর্মীরা গ্রামবাসীদের সঙ্গো থাকেন। তাঁদেয় নাটকের কলাকৌশল শেখান। নাট্যরচনায় সাহায্য করেন। সাংগঠনিক ক্রিয়াকাণ্ডের শিক্ষা দেন। উৎসাহ দেন। সব কাজ হয়ে গেলে ঢাকায় ফিরে যান। চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখেন। মাঝে মাঝে গ্রামগুলিতে ঘুরে যান।

১৯৮৪ সাল পর্যন্ত আরণ্যক ১০০টি গ্রামে এইরকম 'মুক্ত নাটক' করেছে। এই প্রকল্পের কল্যাণে গ্রামের মানুষ উপলব্ধি করেছে যে তাদের দারিদ্র্য, নির্যাতন ও বঞ্চনা আল্লার ইচ্ছায় হয় না। সেসব নিয়তি-নির্ভর বা জন্মসূত্রেও প্রাপ্ত নয়। আসল কারণ সমাজের শোষণভিত্তিক কাঠামো। তারা সংগ্রামের পথটি দেখতে পায়। সমাজ পালটানোর কথা বুঝতে শেখে। কোনও কোনও সম্প্রদায় স্বাধিকারের লড়াইয়ে নেমে পড়ে।

এই প্রক্রিয়ার বিপরীত প্রতিক্রিয়াও হয়েছে। শোষক ও শাসক শ্রেণী বুঝে গেছে যে শোষিত শ্রেণী মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। তাদের স্বার্থের প্রতিকূল কর্মকাণ্ডে নামছে। তারা হুমকি দিতে থাকে। প্ররোচিত করতে থাকে। গুণ্ডা দিয়ে আতঙ্ক ছড়ায়। মহড়াকক্ষে হামলা চালায়। উৎকোচে বশীভূত করে। দলে ভাঙনের সৃষ্টি করে। গুজব ছড়ায়। কাজ ও ঋণ দিয়ে লোক ভাগিয়ে নিয়ে যায়। সংগঠন গড়তে দেয় না। সংগঠন থাকলেও সুকৌশলে তার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও কর্তাব্যক্তি হয়ে ওঠে। বুর্জোয়া সংস্কৃতি আমদানি করে।

॥ ১৪ ॥

নিকারাগুয়া। মধ্য আমেরিকার সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র। সরকারি ভাষা : স্প্যানিশ। শিক্ষিতের হার ৮৭ শতাংশ। কৃষিপ্রধান দেশ। কফি ও তুলা রপ্তানির প্রায় ৭৫ শতাংশ বিদেশি মুদ্রা অর্জন করে।

নিকারাগুয়ার মানুষকে বিপ্লবের চেতনায় দীক্ষিত করতে গ্রামীণ কৃষকদের মধ্যে তৈরি হয়েছে 'তিয়োত্রা নিক্সতাইয়োলেরো'-র মতো শ'য়ে শ'য়ে 'থিয়েটার ব্রিগেড'। 'ফাতোসমা' বলে একটি জায়গায় নাট্যকর্মীরা অভিনয়ের ওয়ার্কশপ করতে করতে বিপ্লবে অংশ নেয়। 'এল তাবল্লন'-এ একটি নাট্যদল ভুট্টার সমবায় খামারে গিয়ে চাষীদের সঙ্গে ভুট্টা তোলে। তাদের নাটক দেখায়। 'নিখতাসলেরো'-র একটি নাট্যদল প্রতিবিপ্লবী আক্রমণ এড়াতে গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে দূর-দূরান্তের গ্রামে গিয়ে পৌঁছয়।

॥ ১৫ ॥

পেরু। দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে অবস্থিত প্রজাতন্ত্রী। খুবই প্রাচীন দেশ। প্রধান ধর্ম : রোমান ক্যাথলিক। অধিবাসীদের অধিকাংশই কৃষিজীবী। পেরুর রাজধানী লিমাতে অধিকারচ্যুত ও ভূমিহীন কৃষকদের শিক্ষায় সহায়তা করার জন্য 'টেরিয়া' নামে থিয়েটার ওয়ার্কশপ হয়।

বলিভিয়া। দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যস্থিত দেশ। কৃষিনির্ভর দেশ হলেও অর্থনীতি খনিজদ্রব্য রপ্তানির ওপর নির্ভরশীল। এখানকার বসবাসকারীরা তিন ভাগে বিভক্ত— ভারতীয়, মেস্ট্রিজোস এবং স্প্যানিয়াডশ বংশধর। যেহেতু বলিভিয়ায় সংমিশ্রিত মানুষজনের বসবাস, তাই সংস্কৃতিতে তার ছাপ রয়েছে।

বলিভিয়ার কোজেবামবা ভ্যালিতে ও রাজধানী লা পাজ-এর বাজারে জননাট্য উৎসব হয়। এইসব নাটকে প্রকাশ পায় উপনিবেশবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদের সাংস্কৃতিক সমস্যা ও বৈষয়িক দ্বন্দ্ব।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বীপপুঞ্জ ডোমিনিয়ান রিপাবলিক। দেশের প্রায় ৪৩.২ শতাংশ জমি পশুচারণভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কৃষিযোগ্য ভূমি ৪৩.২ শতাংশ। মাছ ধরা অন্যতম প্রধান উপজীবিকা।

ডোমিনিয়ান রিপাবলিকে 'দ্য মুভমেন্ট ফর কালচারাল অ্যাওয়ারনেস' নামে নাট্যদল পপুলার থিয়েটারের একটি স্থায়ী প্রকল্প চালায়।

এসথেটিক থিয়েটার

- 'জীবনের খাতিরে— সামাজিক, নৈতিক বা রাজনৈতিক বক্তব্যের জন্য শিল্পের অস্তিত্ব নয়— শিল্পের অস্তিত্ব শিল্পের জন্য।'

  —তেওফিল গোতিয়ে

- 'আর্টের খাতিরে আর্ট বলি যখন, তখন এই কথাটাই বোঝাতে চাই যে আর্ট নয় সামাজিক বা আধ্যাত্মিক বা নৈতিক বা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের উপায়। আর্ট হচ্ছে আপনি আপনার উদ্দেশ্য। আপনি আপনার উপায়।' *—অন্নদাশঙ্কর রায়*

- 'শিল্পের জন্য শিল্পের প্রচারক সেইসব শিল্পী যাঁরা বিশ্বাস করেন, শিল্প সমাজ-নিরপেক্ষ। বিশ্বাসটি সাংঘাতিক ও হতাশাজনক।'— *প্লেখানভ*

- 'শিল্পের জন্য শিল্প তত্ত্বটিকে মেনে নিলে অর্থের জন্য সাফল্যের তত্ত্বটিকেও মেনে নিতে হয়। অথচ শিল্প কখনই শিল্পের জন্য জন্ম নেয় না।'

  —বার্নার্ড শ

- 'থিয়েটার শুধু নাটক নয়, শুধু অভিনয়ও নয়। শুধু দৃশ্য নয়, শুধু নৃত্য নয়। শুধু কথার সমষ্টি নয়, শুধু দেহের ভাষাও নয়। থিয়েটার হচ্ছে নানা শিল্পের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশেষ শিল্পরূপ। 'অ্যাকশন' হচ্ছে এর আত্মা বা জীবনীশক্তি। 'কথা' হচ্ছে এর দেহ। 'রং' এবং 'রেখা' হচ্ছে এর হৃদপিণ্ড। 'ছন্দ' হচ্ছে এর অলঙ্কার।' *—গর্ডন ক্রেইগ*

- 'বিশ্ব নাট্যসাহিত্যের বিশাল ঐশ্বর্যকে কোনও একটি বিশেষ মাপকাঠি দিয়ে ছাঁচে ঢেলে সাজাবার মতো বর্বরতা আর কিছু হতে পারে না। থিয়েটারের এমন কোনও ফর্ম নেই যা একমাত্র, অদ্বিতীয়, যথার্থ, শিল্পসম্মত ফর্ম।' *— মাক্স রাইনহার্ড*

॥ ১ ॥

ইংরাজি 'এসথেটিকস' শব্দটি গ্রিক 'এইসথেটিকস' ধাতু থেকে এসেছে। 'এসথেটিজম' শব্দটি এসথেটিক আন্দোলনের সমার্থক। 'এসথেটিকস'-এর বাংলা প্রতিশব্দ কলাতত্ত্ব (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর), কান্তিবিজ্ঞান (বিষ্ণু দে), সৌন্দর্যতত্ত্ব (সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত)। কেউ কেউ সৌন্দর্যবিজ্ঞান কিংবা নন্দনতত্ত্ব বলেছেন। 'সৌন্দর্য'-র স্বরূপ নির্ণয়ই এসথেটিক দর্শনের উদ্দেশ্য।

এসথেটিকসের আলোচনার সূত্রপাত প্রাচীন গ্রিসে। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে পিথাগোরাস, সক্রেতিস, প্লেটো, আরিস্ততল প্রমুখ গ্রিক দার্শনিক এই তত্ত্বের আলোচনা করেন। পিথাগোরাস বলেন, এই জগতের সমস্ত কিছুই নিখুঁত আঙ্কিক সূত্রে গ্রথিত। এই আঙ্কিক সূত্রই মহাবিশ্বের সকল বস্তুর অবস্থান ও 'সৌন্দর্য'-র কারক। পিথাগোরাসই প্রথম অনুধাবন করেছিলেন কিছু আঙ্কিক সমানুপাতই সুরঋদ্ধ শব্দের উৎস। আর এই সুরের সমানুপাত থেকেই 'সৌন্দর্য'-র জন্ম।

সক্রেতিসের কাছে 'সুন্দর' ছিল মঙ্গালের সমার্থক। প্লেটো রূপের সৌন্দর্যের কথা বলেছেন। তিনি দেহাতীত বা 'দিব্য সৌন্দর্য'-কে গ্রহণ করেছেন। আরিস্ততলের কাছে 'সুন্দর' ছিল আনন্দদায়ক। তিনি দৃশ্যমান জগতেই 'সুন্দর'-কে খুঁজেছেন।

মধ্যযুগে এসথেটিকস নিয়ে আলোচনা করেন সেন্ট অগাস্টিন, টমাস একুইনাস প্রমুখ। প্রাচীন এসথেটিকস দৃষ্টিভঙ্গিাকেই তাঁরা গ্রহণ করেছেন। অগাস্টিন 'লৌকিক সৌন্দর্য'-কে ও একুইনাস 'দিব্য সৌন্দর্য'-কে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

পঞ্চম শতকে রেঁনেসাসের পর এসথেটিকসের সংজ্ঞা পালটে যায়। লাইবনিৎস, দেকার্তে, ক্রুসাৎসরা 'সৌন্দর্য'-কে আনন্দময় ছাড়াও সত্যের প্রকাশরূপে দেখেছেন। কান্ট বলেছেন, 'শিল্প উদ্দেশ্য ছাড়াই অর্থবহ।' শিলার বলেছেন, 'রূপের সৌন্দর্যই শিল্পের সৌন্দর্য।' হেগেল ও শোপেনহাওয়ার ভাববাদী সৌন্দর্যের আলোচনা করেছেন। তাঁরা প্রাকৃত থেকে শৈল্পিক সৌন্দর্যে উত্তরণের কথা বলেছেন। ভিক্তর কুঁজা সৌন্দর্য প্রসঙ্গো আধ্যাত্মিক ধারণার কথা বলেছেন। তাঁর মতে, সুন্দরের ধারণা 'ইন্দ্রিয়ানুভূতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।'

আঠারো শতকের মাঝামাঝি জার্মান দার্শনিক প্রিস্টিয়ান উলফের শিষ্য আলেকজান্ডার বোমগার্ডেনের (১৭১৪-১৭৬২) 'এসথেটিকা' গ্রন্থ প্রকাশ পায়। তিনি বিনা প্রয়োজনে ইন্দ্রিয়বোধের আনন্দকে সুন্দর বলেছেন। তিনি ও বোসাঙ্ক এসথেটিকসের সংজ্ঞার্থ দিতে কল্পনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

উনিশ শতকের শুরুতে ১৮০৪-এ বেঞ্জামিন কনস্তাঁত তাঁর 'জুর্নাল ইস্তাইম' গ্রন্থে এবং ১৮১৮-তে ভিক্তর কুঁজা তাঁর সোরবোঁ বক্তৃতামালা 'কুঁদ্য ফিলসফি'-তে 'আর্ট ফর আর্ট'স সেক' (বাংলায় 'কলাকৈবল্যবাদ') তত্ত্বের স্লোগান তোলেন। তাঁরা বললেন, সৌন্দর্যসৃষ্টি ছাড়া শিল্পের কোনও উদ্দেশ্য নেই। তাঁরা শিল্পে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব স্বীকার করলেন না। ১৮৩৫-এ ফরাসি কবি, সমালোচক ও ঔপন্যাসিক তেওফিল গোতিয়ে (১৮১১-১৮৭২) তাঁর 'মাদমোয়াজেল দ্য মোপোঁ' (১৮৩৫-৩৬) শীর্ষক উপন্যাসের মুখবন্ধে এই মতবাদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, 'জীবনের খাতিরে, সামাজিক, নৈতিক বা রাজনৈতিক বক্তব্যের জন্য শিল্পের অস্তিত্ব নয়— শিল্পের অস্তিত্ব শিল্পের জন্য।' গোতিয়ে পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্যের উৎস সন্ধান করেছেন দিব্যলোকে। তিনি বলেছেন, সৌন্দর্যের অবস্থান অলৌকিক জগতে। মাঝে মাঝে এই সৌন্দর্য ইহলোকের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়। মানুষ শিল্প-সাহিত্যে প্রতিকল্পের মাধ্যমে এই দিব্যসৌন্দর্যকে বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের অধিগম্য করে তোলার চেষ্টা করে।

ফ্রান্সে গোতিয়ের পর শার্ল বদল্যার (১৮২১-১৮৬৭) এই মতবাদের প্রচারক ছিলেন। বদল্যার-কথিত সৌন্দর্য সম্পূর্ণ এক আধ্যাত্মিক ব্যাপার। তিনি বলেছেন, ইন্দ্রিয় নয়, একমাত্র কল্পনার দ্বারাই সৌন্দর্যের সাক্ষাৎ মেলে। গোতিয়ে ও বদল্যার দু'জনেই সৌন্দর্যের দিব্যতায় বিশ্বাসী ছিলেন। দু'জনেই শিল্পকে সৌন্দর্যের অভিব্যক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম বলে বিশ্বাস করতেন।

আমেরিকান ছোটগল্প রচয়িতা, কবি-সমালোচক এডগার অ্যালান পো (১৮০৯-১৮৪৯) তাঁর 'দ্য ফিলসফি অব কম্পোজিশন' (১৮৪৬) গ্রন্থে বলেছেন, কবিতার কাজ আবেগ ও চেতনার রাজ্যে উদ্দীপনা সঞ্চার করা। চিত্তের জড়ত্ব মোচন করা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) একই কণ্ঠে বলেছেন, 'বৈষয়িকেরা যাহাই বলুন না কেন, আর কোনও উদ্দেশ্যের আবশ্যক করে না, মনে সৌন্দর্য উদ্রেক করাই যথেষ্ট। কবির ইহা অপেক্ষা মহত্তর উদ্দেশ্য আর থাকিতে পারে না।' শুধু এঁরাই নন, ভার্লেন (১৮৪৪-১৮৯৬), মালার্মে (১৮৪২-১৮৯৮) ও ভালেরি (১৮৭১-১৯৪৫) কাব্যের বিশুদ্ধ শিল্পমূর্তিতে অনুরাগ প্রকাশ করেছেন।

ইংল্যান্ডে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলেন অস্কার ওয়াইল্ড, ক্লাইভ বেল, রোজার ফ্রাই, ওয়াল্টার পেটার, আর্থার সাইমনস, সুইনবার্গ ও এ. সি. ব্রাডলে। হুইসলার এবং বেয়ার্ডস্লের মতো চিত্রশিল্পীও এই মতবাদে যথেষ্ট প্রভাবিত হলেন। অস্কার ওয়াইল্ড বললেন, 'শিল্পী রূপাবয়বহীন জীবনকে করে তোলেন রূপবান। তাই শিল্পী জীবনকে অনুকরণ করেন না। শিল্পীকে অনুকরণ করে

জীবন।' গোতিয়ের মতোই তিনি পুনরুচ্চারণ করলেন, 'যতক্ষণ কোনও বস্তু আমাদের কাছে প্রয়োজনীয় হয়ে থাকবে অথবা সুখ বা দুঃখের কারণ বলে গণ্য হবে, ততক্ষণ সেই বস্তু শিল্পের জগতে প্রবেশাধিকার পাবে না।' তিনি ফর্মকেই শিল্প বললেন। ক্লাইভ বেলও তাই বললেন, শিল্প অহিতকর কি নয়, এ বিচার অপ্রাসঙ্গিক। শিল্প হচ্ছে তাৎপর্যপূর্ণ ফর্ম।'

॥ ২॥

এই 'আর্ট ফর আর্ট'স সেক'-এর বিভায় উনিশ শতকে জন্ম নিল 'এসথেটিক থিয়েটার'। এই থিয়েটার বিষয়ের চেয়ে অভিব্যক্তিকে বেশি গুরুত্ব দিল। আঙ্গিকের সৌন্দর্যকে বেশি মূল্য দিল। সমস্ত গুরুত্ব দিল বহির্রূপের ওপর। দৃশ্য-উপস্থাপনার ওপর। দৃশ্য-সৌন্দর্যের ওপর। অলঙ্কৃত অঙ্গ-সঞ্চালনের ওপর। রেখা, পুঞ্জ এবং রঙের ওপর।

এসথেটিক থিয়েটার বিশুদ্ধ নান্দনিকতার দিকে ঝুঁকল। নিজেকে যতদূর সম্ভব সাহিত্য বিষয় থেকে অপসারিত করে রাখল। নাট্যক্রিয়া, সংগীত ও দৃশ্যপটের মধ্যে নিখুঁত ঐক্য ও লালিত্য আনার চেষ্টা করল।

এসথেটিক থিয়েটারের প্রবক্তারা মনে করলেন, জীবনকে অনুকরণ করা থিয়েটারের কাজ নয়। থিয়েটার কৌশল দেখাবারও জায়গা নয়। বুদাপেস্টের নাট্য-সমালোচক ড. আলেকজান্ডার হেভেসি বললেন, 'একশ' বছর ধরে দুটি মানুষ নাট্যশিল্পকে নষ্ট করেছে। এই দুটি মানুষ হচ্ছে 'রিয়ালিস্ট' ও 'মেশিনিস্ট'। রিয়ালিস্টরা জীবনকে অনুকরণ করে। তাই আমরা জীবনের সত্য ও আশ্চর্য ব্যাপারগুলি হারিয়ে ফেলেছি। অর্থাৎ আমরা শিল্পের আসল জিনিসটাই হারিয়ে বসেছি। অন্যদিকে মেশিনিস্টরা কৌশল করে। তারা মঞ্চের ওপর যেসব ভেলকির খেলা দেখান, তার ভিতর একটা চমৎকারিত্বের আভাস পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু তা সৌন্দর্যের পর্যায়ে স্থান পায় না।' এসথেটিক থিয়েটারের শিল্পীরা চাইলেন, থিয়েটার হোক সৃষ্টিশীল। কল্পনায় ভরপুর। থিয়েটার এমন এক শিল্পরূপ হোক যাতে শিল্পের সব লক্ষণ মূর্ত হয়ে ওঠে।

এসথেটিক থিয়েটারের শিল্পীদের কাছে বিষয়বস্তু অপ্রাসঙ্গিক। তাঁদের কাছে নান্দনিক সৌন্দর্য ও দৃশ্য সংবেদনই প্রধান। তাঁরা বিষয়বস্তু নির্বাচনে বাস্তব বা বর্তমানকে ভূমি করেন না। বাস্তব জীবনের প্রতিফলনের তুলনায় কল্পনার উদ্‌ঘাটনের দিকেই তাঁরা ধাবমান।

এসথেটিক থিয়েটারের আবেদন-প্রক্রিয়াও বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়জ। শ্রবণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয়ই তার মূল লক্ষ্য। এই দুটি ইন্দ্রিয়ের কাছেই সবটুকু আবেদন-নিবেদন।

আবেগ ও বুদ্ধির কাছে নয়। এর এফেক্ট ইমপ্রেশনিস্টিক। এ মুডকে সৃষ্টি করে। চিন্তাকে রসদ দেয় না। এ কল্পনার পাখা মেলে দেয়। নিত্য প্রয়োজনীয়তা, তুচ্ছতা ও একঘেয়েমি থেকে মানুষকে মুক্ত করে। নির্জনতা ও সৌন্দর্যের নিবিষ্ট অনুভূতি এনে দেয়। এনে দেয় মুগ্ধকর সংগীতের মতো অস্পষ্ট উল্লাস। এই অনুভূতি রূঢ় বাস্তবজীবনের বৃত্ত থেকে স্বপ্নালু জাদুমন্ত্রে প্রাত্যহিক পারিপার্শ্বিকের কদর্যতা থেকে মুক্তি দেয়। এই অনুভূতি দিব্য সৌন্দর্যের।

এসথেটিক থিয়েটারের অবস্থান সংগীতের খুব কাছাকাছি। সংগীতের মতোই এর বিষয়কে বহির্অভিব্যক্তি থেকে পার্থক্য করা যায় না। এই থিয়েটারের চরিত্র জাপানি প্রিন্টের গ্রাফিক শিল্পের আশপাশে। জাপানি শিল্পশৈলীর মতোই এই থিয়েটার বিশুদ্ধ রেখা ও রঙের সৃজনশীল কারুকার্য দেখিয়ে আনন্দদায়ক অনুভূতি আনতে চায়। এসথেটিক থিয়েটারের উপস্থাপনার ধরনটি সরল ও ইঙ্গিতবহ। এই থিয়েটার গল্পের চলন ও চরিত্রের বিকাশের চেয়ে পরিপাটি দৈহিক অঙ্গ-সঞ্চালনের ওপর বেশি ধ্যান দেয়।

'সাইকোলজিক্যাল থিয়েটার'-এর সঙ্গে 'এসথেটিক থিয়েটার'-এর পার্থক্য হল, প্রথমটির আবেদন মূলত আবেগ ও বুদ্ধির কাছে। দ্বিতীয়টির ইন্দ্রিয়ের কাছে। প্রথমটি মানবিক সম্পর্কের টানাপোড়েনের নাটক। কাহিনি ও চরিত্র বিশ্লেষণের ওপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয়টি অঙ্গ-সঞ্চালন, আলো, রং এবং শব্দের বহির্সৌন্দর্যের নাটক। এখানে অভিব্যক্তিই বড়। বিষয়-গৌরব অপ্রধান। এই থিয়েটার অপেরার সংগীতকে যেমন অকপটে গ্রহণ করে, রাশিয়ান ব্যালের দৃশ্য-সৌন্দর্যকে যেমন ব্লটিং পেপারের মতো শুষে নেয়, তেমনই ডান্স ড্রামার মতো ঐক্য ও লালিত্যকেও সে তার শরীরে সিঞ্চন করে। বস্তুত, এসথেটিক থিয়েটার হল নৃত্য, সংগীত, নয়নাভিরাম ও বর্ণময় দৃশ্যসজ্জার সংশ্লেষ। এর সঙ্গে মিশ্রিত হয় অঙ্গ-সঞ্চালনের সৌন্দর্য ও গতি। প্রথম দলে আছেন ইবসেন, শ, গলসওয়ার্দি ও ব্রিউক্স। দ্বিতীয় দলে আছেন গর্ডন ক্রেগ, মাক্স রেইনহার্ড ও রিচার্ড ভাগনার।

॥ ৩ ॥

এসথেটিক থিয়েটারের মূল ধারণাটি গ্রথিত করে দেন জার্মানির দার্শনিক, নাট্যকার, কবি, সমাজসংস্কারক, রাজনীতিবিদ এবং সংগীতস্রষ্টা রিচার্ড ভিলহেলম ভাগনার (১৮১৩-১৮৮৩)। তাঁর রচিত ও প্রযোজিত বিখ্যাত অপেরা হল : দ্য বান অব লাভ (১৮৩৫-৩৬), দ্য ফ্লাইং ডাচম্যান (১৮৪১), টানহোইজের (১৮৪৩-৪৪), লোহেনগ্রীন (১৮৪৫-৪৮), অপেরা উন্ট ড্রামা

(১৮৫১), রিয়েঞ্জি (১৮৮৩-৯০), দ্য ফেয়ারিজ (১৮৯৩-১৯৩৪)। ভাগনার তিনটি গ্রন্থ লিখেছেন : আর্ট অ্যান্ড রেভোলিউশন (১৮৪৯), দ্য আর্ট ওয়ার্ক অব দ্য ফিউচার (১৮৪৯) ও অপেরা অ্যান্ড ড্রামা (১৮৫১)।

ভাগনার বললেন, 'মানুষ প্রকৃতির অভিব্যক্তি। শিল্প মানুষের অভিব্যক্তি।' তিনি শিল্পকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। এক, যে শিল্প মানুষ নিজের প্রতিভায় গড়ে। দুই, প্রাকৃতিক উপাদান থেকে মানুষ যে শিল্প গড়ে। প্রথম ভাগে পড়ে নৃত্য, সুর ও কবিতা। দ্বিতীয় ভাগে পড়ে স্থাপত্য ও চিত্রকলা। তিনি আরও বললেন, সমস্ত মানবিক শিল্পের ভিত্তি হল ছন্দোময় দৈহিক গতি। আর আছে সুর। এই সুরের ভিতর দিয়ে নৃত্য ও কবিতা পারস্পরিক বোঝাপড়ায় বাঁধা পড়ে।

ভাগনারই প্রথম ব্যক্তি যিনি থিয়েটারকে 'কম্পোজিট আর্ট' বলেছেন। তিনিই প্রথম বলেন, দৃশ্যসজ্জা, আলো, সংগীত, বাজনা, নৃত্য এবং নাট্যবস্তু—এইসবের সংমিশ্রণে থিয়েটার এক সংমিশ্র শিল্পকর্ম। তিনি মঞ্চকে ঐন্দ্রজালিক অবস্থায় রাখতে বলতেন। দর্শকের সঙ্গো একাত্মতায় তাঁর ছিল ঘোরতর আপত্তি। তাই দর্শক ও মঞ্চের মাঝখানে তিনি একটি রহস্যময় দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান তৈরি করতেন। তিনিই প্রথম নাটকে আলোর গুরুত্ব ও মনস্তাত্ত্বিক মূল্য অনুধাবন করেছিলেন।

ভাগনার ছাপা নাটক একা বসে নিঃশব্দ পড়াকে রীতিমতো অসুস্থ অভ্যাস ভাবতেন। তাঁর চোখে আধুনিক ব্যক্তিমানুষের বিযুক্তির এক শোচনীয় উপসর্গ এই নিভৃত পাঠ।

॥ ৪ ॥

তবে এসথেটিক থিয়েটারের মূল স্থপতি ইংল্যান্ডের বিখ্যাত অভিনেত্রী এলেন টেরি-র (১৮৪৭-১৯২৪) পুত্র গর্ডন ক্রেইগ (১৮৭২-১৯৬৬)। তিনি ১৮৮৯-এ স্যার হেনরি আরভিং-এর (১৮৩৬-১৯০৫) দলে যোগদান করেন। মাত্র আট বছর বয়সে তিনি অভিনয়-জীবন শুরু করেন ও হ্যামলেট, রোমিও, মারকুচিও, ম্যাকবেথ, রিচমন্ড, ক্যাসিও, ক্লডিও, গ্র্যাসিয়ানো, পেত্রুচিও, মাস্টার ফোর্ড প্রভৃতি চরিত্রে অভিনয় করেন। ১৮৯৬-এ তিনি অভিনয় ছেড়ে মঞ্চ-ব্যবস্থাপনার দিকে ঝুঁকে পড়েন। এর কিছুকাল পরেই তিনি সাত-আটটি নাটক প্রযোজনা করেন। এসব নাটকের দৃশ্যপট, সাজসজ্জার নকশা তিনি নিজেই করেছেন।

ক্রেইগ তাঁর থিয়েটার জীবনের বেশিরভাগ সময়ই মহাদেশ ভ্রমণে কাটিয়েছেন। ১৯০৪-এ তিনি বার্লিন যান। সেখানে তিনি অটওয়ের 'ভেনিস প্রিজারভ্‌ড' প্রযোজনাটির নকশা করেন। ১৯০৫-এ তিনি এলিনরা ডিউসের

সোফোক্লিসের 'ইলেক্ত্রা' প্রযোজনার দৃশ্যপটাদি ও পোশাকের সমস্ত নকশা করেন। ১৯০৬-এ ফ্লোরেন্সের পারগোলা থিয়েটারে ম্যাডাম ডিউজ প্রযোজিত ইবসেনের 'বোজমারশথ'-এর দৃশ্যসজ্জা ও সাজপোশাকের নকশা করে দেন। ১৯১০-এ তিনি রাশিয়ার মস্কো আর্ট থিয়েটারে স্তানিস্লাভস্কি পরিচালিত শেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' নাটকের মঞ্চনির্মাণ করেন।

১৯০৮-এর প্রথমভাগে ফ্লোরেন্স থেকে অভিনয়-শিল্প সম্বন্ধে গর্ডন ক্রেইগের বিখ্যাত মাসিকপত্র 'দ্য মাস্ক' প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯১৩-তে তিনি ফ্লোরেন্সে তাঁর বিখ্যাত নাট্যবিদ্যালয় 'স্কুল ফর দ্য আর্ট অব দ্য থিয়েটার'-এর দ্বারোদঘাটন করেন। ১৯৫৫-তে তিনি লন্ডনের 'কমপ্যানিয়ন অব অনার' পুরস্কার পান। তিনি 'দ্য আর্ট অব দ্য থিয়েটার' (১৯১১), 'অন দ্য আর্ট অব দ্য থিয়েটার' (১৯১১), 'টুওয়ার্ডস আ নিউ থিয়েটার' (১৯১৩), 'দ্য মেরিওনেট' (১৯১৮), 'দ্য থিয়েটার অ্যাডভানসিং' (১৯২১), 'বুকস অ্যান্ড থিয়েটারস' (১৯২৫), 'ইনডেক্স টু দ্য স্টোরি অব মাই ডেইজ' (১৮৭২-১৯০৭) নামে সাতটি অমূল্য নাট্যগ্রন্থ লিখে রেখে গেছেন।

ক্রেইগ তাঁর 'আর্ট অব দ্য থিয়েটার' গ্রন্থে লিখলেন, 'থিয়েটার শুধু নাটক নয়, শুধু অভিনয়ও নয়। শুধু দৃশ্য নয়, শুধু নৃত্যও নয়। শুধু কথার সমষ্টি নয়, শুধু দেহের ভাষাও নয়। থিয়েটার হচ্ছে নানা শিল্পের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশেষ শিল্পরূপ। 'অ্যাকশন' হচ্ছে এর আত্মা বা জীবনীশক্তি। 'কথা' হচ্ছে এর দেহ। রং এবং রেখা হচ্ছে এর হৃদপিণ্ড। ছন্দ হচ্ছে এর অলঙ্কার। এর মধ্যে কোনও একটি অপরটির অপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। চিত্রশিল্পীর কাছে যেমন সব রং-ই দরকারি, সংগীতশিল্পীর কাছে যেমন সব সুরই তাৎপর্যপূর্ণ, তেমনই নাট্য উপস্থাপনায় সব শিল্পই মূল্যবান। সব শিল্পের সমন্বয়েই নির্মিত হয় থিয়েটার।'

ক্রেইগ বললেন, থিয়েটারের শিকড় রয়েছে নৃত্যে ও মূকাভিনয়ে। তিনি ভালো নাট্যকার আখ্যা দিলেন তাঁকেই যিনি জানেন যে, অন্য সব ইন্দ্রিয় থেকে চোখ হচ্ছে অনেক বেশি শক্তিশালী। অনেক বেশি আবেদনক্ষম। 'টুওয়ার্ডস আ নিউ থিয়েটার' গ্রন্থে তিনি গ্রিক ভাষা থেকে 'থিয়েটার' শব্দের অর্থ বের করে বললেন, 'থিয়েটার দৃশ্য দেখার জায়গা', অর্থাৎ থিয়েটার দৃশ্য-শিল্প। এই উপলব্ধির আলোয় ক্রেইগ 'অ্যাকশন' কথাটির পুনর্ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন, 'থিয়েটার শব্দটি যদি দৃশ্যত্বের ওপর প্রাধান্য দেয়, তবে থিয়েটারের অপরিহার্য উপাদান 'অ্যাকশন'কে অবশ্যই দৃশ্যময়তার আরাধনা করতে হয়। অর্থাৎ থিয়েটার হওয়া উচিত 'দৃশ্য-অ্যাকশন' বা 'মুভমেন্ট'। অ্যাকশনের এই ব্যাখ্যাই

এসথেটিক থিয়েটারের চাবিকাঠি। এই থিয়েটারে সমস্তরকম সৃষ্টিই চরিত্রগতভাবে দৃশ্য। এখানে বিষয়বস্তু ও গল্পের বিকাশ দৃশ্য-চিত্তরঞ্জনের কাছে অপ্রধান। পুরোনো থিয়েটার পুরোনো তৈলচিত্রের মতো বিষয়-স্বার্থ ও ভাব-স্বার্থকে লালন করে। এসথেটিক থিয়েটার জাপানি রং-ছাপ এবং হুইসলারের তৈলচিত্রের মতো রেখা, পুঞ্জ ও রঙের সুন্দর বিন্যাসে এক বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়জ আনন্দ দান করে।

ক্রেইগ এমন এক থিয়েটারের স্বপ্ন দেখলেন, যাতে কোনও নাটক বা কাহিনি থাকবে না। থাকবে শুধু শব্দ, আলো ও চলমান মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত মুভমেন্ট। তিনি থিয়েটারকে অর্গানের মতো এক যন্ত্রের কথা ভাবলেন, যা বড় বড় কিউবকে চালাবে। কিউবগুলি উঠবে-নামবে। তার সঙ্গে পর্দা ও আলো সমানতালে ক্রমাগত চলবে। ক্রেইগ নাট্যঘটনা, অভিনেতার চলন-বলন-কার্যকলাপ ও দৃশ্যসজ্জার রং-রূপ মিলিয়ে এক অখণ্ড ছন্দসৃষ্টির কথা বললেন। তিনি বললেন, বাস্তবতা নয়, শৈলীই হল থিয়েটারের আদর্শ।

ক্রেইগ দেখলেন, থিয়েটারে বিশুদ্ধ শিল্পের বড়ই অভাব। ম্যানেজার, নাট্যকার, দৃশ্যঅঙ্কনকারী, অভিনেতা এবং আরও অন্যান্য হাতের অবাঞ্ছিত ও অশৈল্পিক হস্তক্ষেপে এই চারুশিল্পই নষ্ট হচ্ছে। নাট্য প্রযোজনার ঐক্য ও লালিত্য আনার জন্য তিনি একজন 'সৃষ্টিশীল মন' বা শিল্পীর (ক্রেইগের ভাষায় 'আর্টিস্ট-ডিরেক্টর') আবশ্যিকতার কথা বললেন। এই শিল্পী হবেন সর্বস্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান (ক্রেইগের ভাষায় 'সুপার-আর্টিস্ট', 'সুপার-ক্র্যাফটসম্যান')। তাঁর মধ্যে শিল্প ও বিজ্ঞানের মিলন থাকবে। তিনি নাট্যশিল্পের প্রতিটি শাখার অবিসংবাদিত ব্যুৎপত্তির অধিকারী হবেন। সমগ্র প্রযোজনাটি নাট্যশিল্পের বিশুদ্ধ রীতি অনুযায়ী সৃষ্টি-গর্ভে ধারণ করবেন। তিনি নাটক লিখবেন। তাকে তিনি মনশ্চক্ষুতে দেখবেন। দক্ষ কারিগরের মতো একক নৈপুণ্যে বুনবেন। দৃশ্যপট, পোশাক, আলো ও সংগীতের নকশা করবেন। থিয়েটারের বিভিন্ন বিভাগের শিল্পী বা কর্মীদের নির্দেশ দেবেন।

ক্রেইগ চাইলেন, থিয়েটারে দৃশ্যপট শুধু লালিত্যময় পশ্চাৎপট হিসেবে কাজ করুক। দৃশ্যসজ্জা হোক শোভিত ও বিনীত। রং এবং রূপ হোক প্রযোজনার মূলভাব। ক্রেইগ নিজে 'স্ক্রিন সেটিং' নামে একটি নতুন দৃশ্যসজ্জার প্রবর্তন করলেন। দ্বিমুখী কব্জা লাগানো দুই পাল্লাবিশিষ্ট ক্রেইগের এই বিখ্যাত পর্দাগুলি যে কোনও আকৃতিতে ও আয়তনে সাজানো যায়। এগুলি নড়ে, ঘোরে, এগিয়ে আসে, পিছিয়ে যায়, মুড়ে বা খুলে যায়। দৃশ্যের মুড অনুযায়ী এগুলিকে যে কোনও রঙে আলোকিত করা যায়। এরা সহজে স্থানান্তরযোগ্য বলে দৃশ্যান্তরে কম সময় লাগে। ওপর ও পাশ থেকে আলো দিতে অসুবিধা হয় না।

ফুটলাইটগুলি বাদ দেওয়া চলে। নাট্যক্রিয়ার জন্য এক নিরপেক্ষ ও লালিত্যময় পশ্চাৎপট সৃষ্টি হয়। তথাকথিত কাব্যিক বা সাহিত্য-বিষয়ক নাটকের দৃশ্যপট হিসেবে এই পর্দাগুলি ব্যবহার করেও ক্রেইগ বিশুদ্ধ এসথেটিক নাটকের মতো অ্যাকশন, আলো ও সেটিং-এর ঐক্য আনতে সফল হলেন। এই পর্দা প্রথম ব্যবহার করে ডাবলিন থিয়েটার। ক্রেইগের 'দ্য আর্টিস্ট অব দ্য থিয়েটার অব দ্য ফিউচার' প্রবন্ধটি পড়ে স্তানিস্লাভস্কি তাঁকে মস্কো আর্ট থিয়েটারের প্রযোজনা শেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' নাটকের মঞ্চের ডিজাইন তৈরি করতে অনুরোধ করলেন। ক্রেইগ তাঁর বিখ্যাত পর্দাগুলি দিয়ে 'হ্যামলেট'-এর এক অপূর্ব সেট তৈরি করলেন। পর্দা ছাড়াও স্তম্ভ, উঁচু-নিচু স্তর ও ধাপযুক্ত সিঁড়ি ব্যবহার করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নাটক শুরু হওয়ার আগে দৃশ্যপটটি ভেঙে পড়ে।

ক্রেইগ নাটকে আলোর ব্যবহারেও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করলেন। তিনি বললেন, আলোকসম্পাত প্রকৃতির অনুকরণ হবে না। সে হবে সুন্দর। পরিবেশিক মায়াজালকে সে উজ্জ্বল করতে সাহায্য করবে। তিনি আলো-ছায়ার সাহায্যে নাটকীয়তা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দিলেন। নাটকের মুড, স্থান, কাল, পরিবেশ ও মঞ্চ-বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য আলোকে নানাভাবে কাজে লাগালেন। মঞ্চের বিভিন্ন কোণ থেকে আলোক প্রক্ষেপণ করে দৃশ্য ও নাট্যক্রিয়াকে সচল করে তুললেন।

কিন্তু ক্রেইগ সমস্যায় পড়লেন অভিনেতাদের নিয়ে। তিনি দেখলেন, অভিনেতারা পরিচালকের ইচ্ছামতো অঙ্গচালনা ও অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে পারছেন না বা করতে চাইছেন না। অন্যদিকে পরিচালকের পক্ষেও মুশকিল হল, তিনি নাটক লিখতে পারেন। দৃশ্যপট, পোশাক ও আলোর নকশা করতে পারেন। কিন্তু অভিনেতার স্থানটি নিতে পারেন না। স্বকীয়তা ও স্ব-ইচ্ছা সম্বলিত জীবন্ত অভিনেতাদের ওপর আধিপত্য করতে পারেন না। মঞ্চে তাঁদের তাৎক্ষণিক আবেগ ও দৈহিক ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণও করতে পারেন না। এই উভয় সংকটে পড়ে ক্রেইগ অভিনেতাদের থিয়েটার থেকেই নির্বাসন দিতে চাইলেন। তিনি ক্ষোভে বললেন, 'আমার কাছে অভিনেতারা হল কেবল অনতিক্রম্য বাধা এবং ব্যয়।' তিনি আরও বললেন, 'যদি অভিনেতাদের ব্যবহারই করতে হয় তবে তাঁদের কথা বলতে দেওয়া উচিত নয়। তাঁরা শুধু নৃত্যবিদের মতো দেহভঙ্গি করবে। কারণ অভিনয় হল দৈহিক ক্রিয়া। নৃত্য হল দৈহিক ক্রিয়ার কবিতা।'

ক্রেইগ থিয়েটারে অভিনেতার পরিবর্ত হিসেবে 'মেরিওনেট পাপেট' ব্যবহারের প্রস্তাব দিলেন। কারণ মেরিওনেটরা কখনই শিল্পীর প্রদত্ত বিধি বা নির্দেশ ব্যতীত দর্শকের কাছে নিজেদের জাহির করবেন না। দর্শকের ইচ্ছার কাছে অবনত হবে না। তাদের নিঃশব্দ অভিব্যক্তি ও ছন্দোময় অঙ্গ-সঞ্চালন,

ইঙ্গিতধর্মী মঞ্চসজ্জা, রঙিন আলো ও দামি পোশাকের সমন্বয়ে এক দৃষ্টিনন্দন শিল্পরূপের সৃষ্টি হবে। এই শিল্পসৃষ্টি দর্শকের ইন্দ্রিয়গুলিকে মথিত করবে। চরম তৃপ্তি দেবে। মানুষের পরিবর্তে কাঠের মূর্তির এই পরিবর্ত এক নতুন নাট্যরূপের জন্ম দিল। কেউ এই নাট্যকে বললেন, 'ড্রামা অব সায়লেন্স'। কেউ বললেন, 'ড্রামা অব দ্য সুপার-মেরিওনেট'। ক্রেগ বললেন, 'কুছ পরোয়া নেই। এটাই ভালো হবে। শব্দের অত্যাচার থাকবে না। দৃষ্টিনন্দন শোভায় কোনও সাহিত্য-বিষয়ক হস্তক্ষেপ বা অনুপ্রবেশ থাকবে না।'

কিন্তু দুঃখের বিষয়, ক্রেইগের এই 'সুপার-মেরিওনেট ড্রামা' আজ পর্যন্ত বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। কারণ তিনি যে থিয়েটারের স্বপ্ন লালন করতেন তার জন্য খরচ হত লক্ষ লক্ষ পাউন্ড। রোবট, অজস্র যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এবং জটিল ইঞ্জিনিয়ারিং দরকার ছিল তাঁর বিমূর্ত দর্শনকে বুঝতে। তাছাড়া প্রশ্ন একটি থেকেই গেছে। অভিনেতাবিহীন কোনও থিয়েটার কি আর 'থিয়েটার' পদবাচ্য হতে পারে? সেটি কি 'কাইনেটিক আর্ট' (গ্রিক ভাষায় 'কাইনেটিক' শব্দের অর্থ 'সচল'। 'কাইনেটিক আর্ট' হল 'সচল চিত্রকলা') হয়ে যাবে না?

॥ ৫ ॥

এসথেটিক থিয়েটারের দ্বিতীয় প্রতিনিধি অস্ট্রিয়ান অভিনেতা ও পরিচালক মাক্স রেইনহার্ড (১৮৭৩-১৯৪৩)। ক্রেইগ এসথেটিক থিয়েটারের স্রষ্টা এবং ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। রেইনহার্ড প্রয়োগকর্তা। ক্রেইগ চিন্তাবিদ। রেইনহার্ড কর্মী। ক্রেইগ কবি। রেইনহার্ড প্রদর্শক। ক্রেইগ ন্যাচারালিজম ও রিয়ালিজমের বিরুদ্ধে যে ইঙ্গিতময় শোভিত মঞ্চায়নের স্বপ্ন দেখেছিলেন, রেইনহার্ড বাস্তবে তার রূপ দিয়েছেন। তিনিই একমাত্র পরিচালক যিনি প্রায়োগিক ও বাণিজ্যিকভাবে এসথেটিক থিয়েটার-আন্দোলনকে সফলতা দিয়েছেন।

১৮৯০ থেকে ১৮৯২ পর্যন্ত ভিয়েনাতে নাট্যশিক্ষা সমাপ্ত করে রেইনহার্ড স্যালজবার্গের রেসিডেন্ট থিয়েটারে এক বছর কাটান। ১৮৯৩-৯৪ সালে জার্মান নাট্য-সমালোচক অটো ব্রাহ্ম (১৮৫৬-১৯১২) এই প্রভাবশালী শিল্পীকে আবিষ্কার করেন। রেইনহার্ড নয় বছর ব্রাহ্ম প্রতিষ্ঠিত ডয়েশেজ থিয়েটারে একজন শিল্পী-সভ্য হিসেবে কাটান এবং বৃদ্ধের ভূমিকায় অভিনয় করে বিখ্যাত হন। এখানে তিনি নাট্য-পরিচালনা করতেও শুরু করেন। ১৯০২-এ তিনি ক্লাইনজ থিয়েটারে স্ট্রিন্ডবার্গের 'দেয়ার আর ক্রাইমস অ্যান্ড ক্রাইমস', অস্কার ওয়াইল্ডের 'সালোমে', ওয়েদকাঁদের 'আর্ডগাইস্ট', গোর্কির 'দ্য লোয়ার ডেপথস' ইত্যাদি নাটক প্রযোজনা করেন।

১৯০৩-এ তিনি বার্লিনে ন্যুয়েজ থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন এবং এক নতুন নাট্যদল তৈরি করেন। এক বছরে তিনি এখানে ওয়াইল্ড, শিলার, গোর্কি প্রমুখ বিভিন্ন নাট্যকারের বিয়াল্লিশটি নাটক প্রযোজনা ও পরিচালনা করেন। ১৯০৫ সালে তিনি এখানে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রযোজনা শেক্সপীয়রের 'মিডসামার নাইটস ড্রিম' মঞ্চস্থ করেন। এই নাটকে তাঁর সাফল্য এতটাই বেশি হয়েছিল যে তাঁকে আবার ডয়েশেজ থিয়েটারে পরিচালনার জন্য নির্বাচিত করা হয়।

১৯০৬-এ রেইনহার্ড বার্লিন ক্যামারস্পিয়েল নামে আর একটি বিশালকায় থিয়েটার তৈরি করেন। এখানে তিনি ওয়েদকাঁদের 'দ্য অ্যাওকেনিং অব স্প্রিং' নাটকটি প্রযোজনা করে সাফল্য লাভ করেন। ১৯১০-এ তিনি ফ্রাঙ্কফুর্টের শুমান সার্কাস থিয়েটারে সোফোক্লিসের 'ইদিপাস রেক্স' মঞ্চস্থ করেন। ১৯১১-তে তিনি সি. বি. কোচরানের সংলাপহীন নাটক 'সুমুরান' মঞ্চস্থ করেন। ১৯১৭-তে তিনি জুনজ ডিইটসল্যান্ড থিয়েটার স্থাপন করেন। ১৯১৯-এ তিনি সার্কাস শুমান-কে গ্রসেস গ্রেউসপিএলহাস (গ্রেট স্পেকটকল হাউস) নাম দিয়ে 'অরেস্তিয়া' প্রযোজনা করে থিয়েটারটির উদ্বোধন করেন।

১৯২০ সালে রেইনহার্ড স্যালজবার্গ নাট্যোৎসবের সূচনা করেন এবং ১৯৩৪ পর্যন্ত প্রত্যেক বছর এই নাট্যোৎসবে গির্জার সামনে তিনি 'এভরিম্যান' নামে একটি 'মর‍্যালিটি প্লে' মঞ্চস্থ করতেন। ১৯৩৩-এ হিটলার ক্ষমতায় এলে তিনি জার্মানি ছেড়ে চলে যান এবং জীবনের শেষ পাঁচ বছর আমেরিকায় কাটান।

রেইনহার্ড নাটক ও অপেরা নিয়ে সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকা জয় করে বেবিয়েছেন। তিনি ১৯০৬-এ বার্লিন ক্যামারস্পিয়েল স্থাপন করা থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত মিউনিখ, ভিয়েনা, প্যাবিস, ভেনিস, স্টকহোম, হলিউড, লন্ডন প্রভৃতি শহরের মঞ্চে, রাস্তায়, চৌমাথায়, লেকে, বাড়িতে, গির্জায় এবং বিশালায়তন মঞ্চে নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। মধ্যযুগের 'মিরাক্‌ল' ও 'এভরিম্যান' গোষ্ঠীর নাটক অভিনয় করেছেন। আধুনিক যুগের গ্যেটে, শিলার, মেতারলিংক, শ, ও'নিল, বুচার থেকে শুরু করে অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে স্ট্রিন্ডবার্গ, অস্কার ওয়াইল্ড, ভিডেকিন্ড, তলস্তয়, গোর্কির মতো বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকারদের নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। প্রত্যেকটি প্রযোজনা তাঁকে ধাপে ধাপে সাফল্য ও যশের সর্বোচ্চ শিখরে তুলে দিয়েছে। তিনি ইউরোপের থিয়েটারে 'মিরাক্‌ল ম্যান' হয়ে পড়েছিলেন। ইউরোপের সমস্ত নাট্যশিল্পী তাঁর সামনে জড়ো হয়েছিলেন। তাঁর প্রযোজমা দেখার জন্য ও তাঁর টেকনিক শেখার জন্য বিদেশের পরিচালকরা তীর্থযাত্রীর মতো বার্লিন যাওয়া শুরু করলেন।

রেইনহার্ড একদিকে যেমন প্রথাগত প্রসেনিয়াম. ওপেন, অ্যাপ্রন, রিভলভিং

ইত্যাদি সমস্তরকম মঞ্চরূপের ব্যবহার করেছেন, তেমনই থিয়েটারের সমস্তরকম প্রচলিত প্রথাকে ভেঙে নিখুঁত কল্পনাসম্ভূত প্রয়োগশৈলী ব্যবহার করেছেন। এমনকি প্রেক্ষাগৃহকে গির্জা ও সার্কাসের তাঁবুতেও পরিণত করেছেন। তিনি যেমন ধ্রুপদি, ঐতিহাসিক, প্রকৃতিবাদী, অবাস্তববাদী, প্রতীকিবাদী নাটক পরিচালনা করেছেন, তেমনই সংলাপহীন নাটকও পরিচালনা করেছেন। প্রত্যেকটি নাটকের জন্য তিনি নতুন টেকনিক ব্যবহার করতেন। অভিনেতা, আলোকসম্পাত, দৃশ্যসজ্জা, সংগীত ও সমবেত জনতার ছন্দবদ্ধ গতিবিধি দিয়ে তিনি থিয়েটারে যে কোনও এফেক্ট সৃষ্টি করতে পারতেন। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে তিনি আশ্চর্যজনকভাবে অনেক বিচিত্রসুন্দর প্রযোজনা করেছেন। বিভিন্ন শৈলীর মিশ্রণে তিনি এত রকমের প্রযোজনা উপহার দিয়েছেন যে তাঁকে ইউরোপের শ্রেষ্ঠতম পরিচালক বলা হয়। তিনি যা ছুঁতেন তাই সোনা হয়ে যেত।

রেইনহার্ডের যে দৃষ্টিভঙ্গি থিয়েটার জগতকে সবচেয়ে বেশি বিস্মিত করেছে তা হল, তিনি থিয়েটারে কোনও ফর্মকেই চিরন্তন বলে মনে করেননি। তিনি পঁচিশ বছর ধরে প্রায় ছ'শ নাটক পরিচালনা করেছেন। এই দীর্ঘ পরিচালনার ইতিহাসে তিনি কোনও ফর্মেরই পুনরাবৃত্তি করেননি। প্রত্যেকটি নাটকে নতুন ফর্ম ব্যবহার করেছেন। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, 'বিশ্ব নাট্যসাহিত্যের বিশাল ঐশ্বর্যকে কোনও একটি বিশেষ মাপকাঠি দিয়ে ছাঁচে ঢেলে সাজাবার মতো বর্বরতা আর কিছু হতে পারে না। থিয়েটারের এমন কোনও ফর্ম নেই যা একমাত্র, অদ্বিতীয়, যথার্থ, শিল্পসম্মত ফর্ম।'

মঞ্চনির্মাণে রেইনহার্ড যেমন ব্রিটিশ নকশাকার গর্ডন ক্রেইগের অনেক চিন্তাধারা গ্রহণ করেছেন, তেমনই আলোকসম্পাতে সুইস নকশাকার অ্যাডলফ আপ্পিয়ার তত্ত্বেও প্রভাবিত হয়েছেন। কার্যত, রেইনহার্ড মঞ্চে ক্রেইগ ও আপ্পিয়ার তত্ত্বের প্রত্যক্ষরূপ দিয়েছেন। তিনি অঙ্কিত দৃশ্যপটের পরিবর্তে উচ্চ স্টাইলাইজড স্থাপত্য এনেছেন। ঘূর্ণায়মান মঞ্চ, সিঁড়ি, রানওয়ে, পাটাতন, বড় বড় থাম, স্কাই ডোর্ম, ডিপ ফোরস্টেজ ইত্যাদি আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে ত্রিমাত্রিক সেটের প্রবর্তন করেছেন। মঞ্চে বৃষ্টি বা বজ্রবিদ্যুৎ দেখাতে বেলাস্কো বা স্তানিস্লাভস্কি যেখানে মঞ্চে আসল জল দেখাবার চেষ্টা করেছেন, তিনি সেখানে অতটা বিশদতায় যাননি। তিনি কেবলমাত্র ওইগুলির প্রতীক ব্যবহার করেছেন ও বাকিটুকু দর্শকদের কল্পনার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন।

বস্তুত, রেইনহার্ডের মূকাভিনয় ও সংগীতসমৃদ্ধ প্রযোজনাগুলি বাস্তববাদী প্রযোজনার তুলনায় অনেক বেশি নাট্যধর্মী ছিল। তাঁর প্রযোজনাগুলি দর্শকের ইন্দ্রিয়শক্তির কাছে এত বেশি আবেদন রেখেছিল, তাঁদের কল্পনাশক্তির ওপর এত

বেশি নির্ভরশীল ছিল যে তাঁর এই পদ্ধতিকে 'ইমপ্রেশনিজম' আখ্যা দেওয়া হয়। 'ইমপ্রেশনিজম' (বাংলায় 'ভাবপ্রেক্ষণবাদ') শব্দটি ১৮৭২-এ প্যারিসে এক চিত্রকলা উৎসবের প্রদর্শিত ফরাসি শিল্পী ক্লদ মোনের (১৮৪০-১৯২৬) 'ইমপ্রেশন সানরাইজ' ছবিটির আলোচনা প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়। ১৮৯০ পর্যন্ত ফ্রান্সে এই শৈল্পিক আন্দোলনটি পরিব্যাপ্ত ছিল। ক্যামেরা আবিষ্কৃত হওয়ার আগে চোখে দেখা বিষয়ের রূপ নিখুঁতভাবে ছবির মধ্যে ফুটিয়ে তোলাই ছিল শিল্পীর কাজ। কিন্তু ক্যামেরা আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রকরদের চাহিদা কমতে থাকে। তখন তাঁরা ফোটোগ্রাফের থেকে আরও বাস্তব করে ছবি আঁকায় মগ্ন হলন। মনে, রনোয়া, পেসারো, ক্যাসেট, হাসান প্রমুখ চিত্রশিল্পী সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায় একই প্রাকৃতিক দৃশ্য আলার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কেমনভাবে রূপ পালটায় তার ছবি আঁকলেন। বিজ্ঞানীদের মতে, সূর্যকিরণ হল বিভিন্ন বর্ণের সমন্বয়। সুতরাং সূর্যের আলো যেখানে দেখাতে হবে সেখানে বিভিন্ন রং যদি আলাদা আলাদা লাগানো যায় তাহলে দর্শকের দৃষ্টিতে সব রং মিলে গিয়ে আরও রিয়ালিস্টিক মনে হতে পারে। এই চিত্রশিল্পীরা ঢালা রং ব্যবহার না করে ছোট ছোট টান-টোন সহযোগে লাল, নীল, হলুদ ইত্যাদি মৌলিক বর্ণের প্রয়োগ করলেন। এই অতি বাস্তববাদী চিত্রশিল্পীদেরই নাম হল 'ইমপ্রেশনিস্ট'। ইমপ্রেশনিস্টরা বললেন, বাহ্যিক জগতের চিত্রায়নের মধ্যে 'সত্য' নিহিত থাকে না। তাকে উপলব্ধি করতে হয় মনে।

সাহিত্যে 'ইমপ্রেশনিজম' শব্দটি অবশ্য ব্যাপক অর্থে বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণ অর্থে, বিষয় সম্পর্কে লেখকের 'ব্যক্তিগত অনুভব'কে ইমপ্রেশনিজম বলা হয়। আবার বহু ফরাসি সিম্বলিস্ট কবিকে 'ইমপ্রেশনিস্ট' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ইংল্যান্ডের ওয়াল্টার পেটার তাঁর 'দ্য রেঁনেসাস' বইটিতে শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে, যে সমালোচক শিল্প-বিচারে নিজস্ব প্রক্রিয়াটিই মূলত অনুধাবন করেন, তিনি ইমপ্রেশনিস্ট সমালোচক। আরথার সাইমনসের মতে, কবিতায় ইমপ্রেশনিস্টরা তাঁদের অভিজ্ঞতাকে বর্ণনা করেন না— অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়াকে বিবৃত করেন। আধুনিক উপন্যাসে ইমপ্রেশনিস্ট বলতে বোঝায় কোনও চরিত্রের অন্তর্জীবনের অন্তরঙ্গ চিত্রায়ন।

ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পীরা ব্যক্তিগত অনুভূতির রঙে রাঙিয়ে চলমান মুহূর্তকে ধরতে চান। সমালোচকদের মতে, রেইনহার্ডের প্রত্যেকটি প্রযোজনায় ব্যক্তিগত অনুভূতির রং ছড়িয়ে থাকত। তাই তাঁকে ইমপ্রেশনিস্ট বলা হত।

রেইনহার্ড থিয়েটারকে সাহিত্যের শিকল থেকে মুক্ত করে নিজের পায়ে দাঁড় করাতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'থিয়েটার থিয়েটারই, জীবন নয়। থিয়েটার

থিয়েটারের জন্যই।' অনেকে একে বলছেন, 'থিয়েট্রিক্যালিজম'। থিয়েটারের যতরকম আবিষ্কার রেইনহার্ডের পক্ষে সম্ভব, তা তিনি করেছেন। থিয়েটারের যতরকম সম্ভাবনা আছে, তা নিয়ে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। মার্টিন এসলিন তাঁর 'মাক্স রেইনহার্ড, হাই প্রিস্ট অব থিয়েট্রিক্যালিটি' নাট্যগ্রন্থে লিখেছেন, 'রেইনহার্ড মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে থিয়েটারকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। রাস্তায়, কাফেতে, প্রদর্শনীতে, হাজার হাজার দর্শকের কাছে থিয়েটারকে পৌঁছে দিতে চেষ্টা করেছেন।'

রেইনহার্ডকে থিয়েটারের 'সিসিল ডি মিলি' (কিংবদন্তী চলচ্চিত্র পরিচালক) বলা হত। কারণ প্রযোজনাকে উচ্চমার্গে তোলার জন্য এবং তার মধ্যে নতুনত্ব আনার জন্য তিনি তার প্রতিটি অঙ্গ নিখুঁত করে গড়ে তুলতেন। প্রযোজনার প্রতিটি বিশদতার ওপর তাঁর নজর ছিল। জনতার অভিনয়, মূকাভিনয়, সংগীত, আলোকসম্পাত, মঞ্চ পরিচালনা, কোনওটির প্রতিই তাঁর সামান্য অবহেলা ছিল না। সর্ব শিল্পের সমন্বয়ে তিনি 'টোটাল থিয়েটার'-এর আদর্শ তুলে ধরেছেন নাট্যজগতে। তিনি যেমন রং ও চাঞ্চল্যকর মঞ্চ-যন্ত্রের জাদুকরী এফেক্ট দিয়ে দর্শকদের আমোদিত করেছেন, তেমনই আবার খালি দেওয়ালের সামনে অত্যন্ত সাদাসিধা অভিনয় করিয়েও চমকপ্রদ সব নাটক উপহার দিয়েছেন। তিনি থিয়েটারে এনেছেন এক নতুন ধারা— 'স্টাইলাইজেশন'। নাটকের বিষয়বস্তুর চেয়ে মঞ্চ, আলো, আবহসংগীত ইত্যাদি আঙ্গিক-প্রকরণে তিনি ঝোঁক দিয়েছেন বেশি। ফলত, ঘূর্ণায়মান মঞ্চ, অ্যাপ্রন স্টেজ, সার্কাস রিং থেকে শুরু করে গ্রিকদেব মতো মুক্তমঞ্চে আঙ্গিকের মূল পরিবেশ তৈরি করেছেন।

রেইনহার্ড 'তারকা প্রথা' বিলোপ করে উচ্চ-প্রশিক্ষিত জনতা-দৃশ্য সংযোজন করেছেন। সংগীতশিল্পী ও নৃত্যশিল্পীদের নাটকের অ্যাকশনের সঙ্গে সুসংহত করেছেন। গ্রিক ও এলিজাবেথান থিয়েটারের মতো অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যে অন্তরঙ্গ সংযোগ করার জন্য তিনি তাঁর মঞ্চকে প্রেক্ষাগৃহে এগিয়ে নিয়ে এসেছেন (যাকে বলা হয় 'থ্রাস্ট স্টেজ')। ছন্দিত জনতার মুভমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে তিনি দর্শকদের নাটকের একেবারে অন্তস্তলে নিয়ে আসতেন।

রেইনহার্ড উদ্ভাবিত জার্মান ভাষায় 'রেজি বুশ' (ইংরাজি 'প্রম্পট কপি') পরিচালকদের কাছে বাইবেলের মতো। নাটক মহড়ায় যাওয়ার আগে পরিচালক এই খাতায় প্রযোজনার মঞ্চ, আলো, সংগীত ও অভিনয়ের একটি খসড়া পরিকল্পনা লিপিবদ্ধ করেন। প্রযোজনার সমস্ত খুঁটিনাটি তার মধ্যে লেখা থাকে। প্রয়োজনমতো কিছু ছবিও পরিচালক এঁকে রাখেন। মহড়া চলার সময় সংশ্লিষ্ট শিল্পীদের সঙ্গে পরিচালক তাঁর এই পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন। ছক

অনুযায়ী মহড়া দেন। মহড়ায় কিছু পরিবর্তন হলে বা উদ্ভাবিত হলে ওই খাতায় পরিচালক সেটি বিস্তারিতভাবে লিখে রাখেন।

মেধাবী রেইনহার্ড ১৯০৫-এ বাইশ বছর বয়সে ডয়েশেজ থিয়েটারে অটো ব্রাহ্‌মের উত্তরসূরি হয়ে এসে এমন সব প্রযোজনা উপহার দিয়েছেন, যেগুলি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বার্লিনকে ইউরোপের সুবিদিত থিয়েটার কেন্দ্রগুলির অন্যতম একটিতে পরিণত করেছিল। বিভিন্ন নাটকের জন্য বিভিন্ন পরিবেশ দরকার বুঝতে পেরে তিনি তিনটি মঞ্চের পরিকল্পনা করেছিলেন : আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক নাটকের জন্য 'অন্তরঙ্গ মঞ্চ', ধ্রুপদি নাট্যসম্ভারের জন্য 'বড় মঞ্চ', এবং মহাকাব্যিক মাত্রার প্রযোজনার জন্য খুব বড় 'অ্যাম্ফি-থিয়েটার মঞ্চ'। লন্ডনের ন্যাশনাল থিয়েটারে এক ছাদের নিচে ঠিক এই তিনরকমের মঞ্চ আছে। ডয়েশেজ থিয়েটারে প্রথমে ৪০০ আসন-বিশিষ্ট একটি ছোট অন্তরঙ্গ মঞ্চ তৈরি হয়। ১৯০৬-এ ইবসেনের 'গোস্টস' নাটকের অভিনয় দিয়ে এই মঞ্চটির উদ্বোধন হয়। এই অন্তরঙ্গ মঞ্চের মধ্যে বসে দর্শকরা চেকভ, স্ট্রিন্ডবার্গ বা ইবসেনের চরিত্রদের মতো একই ঘরে রয়েছেন এইরকম অনুভব করতে পারতেন।

১৯১০-এ রেইনহার্ড ফ্রাঙ্কফুর্টের সার্কাস শুম্যান বাড়িটি ভেঙে ৩৫,০০০ আসনবিশিষ্ট এক নতুন রঙ্গালয় তৈরি করেন। গ্রিক থিয়েটারের পুনর্জীবনের চেষ্টায় রেইনহার্ড এখানে 'ইদিপাস রেক্স' মঞ্চস্থ করেন। এটি ছিল একটি এরিনা প্রযোজনা। বেসিল ডিন তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থ 'সেভেন এজেস'-এ এই প্রযোজনার কথা লিখেছেন, 'সার্কাসটি প্রায় ৫,০০০ দর্শকে ঠাসা ছিল। এই বিস্ময়কর প্রযোজনা দেখে আমি সম্পূর্ণ ভাববিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম।' লন্ডনেও এমন বিপুল আয়োজন করে তিনি 'মিরাক্‌ল' নাটকটির নীরব অভিনয় দেখান।

রেইনহার্ড তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রযোজনা শেক্সপীয়রের 'দা মিড সামার নাইটস ড্রিম' নাটকে রিয়ালিজমের সঙ্গে রোমান্টিসিজমের মিশ্রণ ঘটালেন। তাঁর প্রেরণায় বিখ্যাত 'ইজেল' চিত্রশিল্পীরা সরল ও রঙিন পশ্চাদপট আঁকলেন। তাঁরা প্লাস্টিকের গাছ দিয়ে মঞ্চ সাজালেন। মেঝেতে কার্পেট বিছিয়ে দিলেন। রেইনহার্ড চিত্তগ্রাহী সংগীত ও রঙিন আলোর মেলবন্ধনে এক রঙিন ফ্যান্ট্যাসি তৈরি করলেন। পরীরা চলমান বনের মধ্যে ভেসে বেড়াল। আমেরিকায় থাকাকালীন রেইনহার্ড এই নাটকের একটি সফল চলচ্চিত্রও তৈরি করেন।

রেইনহার্ড স্যালজবার্গের ক্যাথিড্রাল স্কোয়ারের গির্জায় ১৯১০ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর 'এভরিম্যান' নাটকটি অভিনয় করেন। অভিনেতারা শহরের সমস্ত গির্জার চূড়া থেকে 'এভরিম্যান'-এর নাম ধরে ডাকলেন। দিনের শেষে যখন এভরিম্যানের আত্মা স্বর্গে এল, তখন গির্জার ভিতরের আলোগুলি

জ্বলে উঠল। কোরাস গান প্রতিধ্বনিত হল। সমস্ত গির্জার ঘণ্টা বাজতে থাকল। রেইনহার্ড স্যালজবার্গের একটি পাহাড়ে 'ফাউস্ট' নাটকটিও অভিনয় করেন। তিনি ভিয়েনা, বার্লিন ও নিউ ইয়র্কে চার্চের সামনে 'এভরিম্যান' ও 'ফাউস্ট' নাটক দুটি অভিনয় করেন। 'এভরিম্যান' মধ্যযুগ ও রেনেসাঁসের যুগ-সন্ধিক্ষণে, পনেরো শতকের একেবারে শেষের দিকের একটি বিখ্যাত ইংরাজি 'মর‍্যালিটি' নাটক। মূল বক্তব্য : বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, ধনদৌলত, সৌন্দর্য, শক্তি বা বুদ্ধি নয়, একমাত্র 'সৎকর্ম'কে সঙ্গী করে আমরা মৃত্যুর অন্ধকার পথে ঈশ্বরের কাছে অনন্তযাত্রা করতে পারি। জার্মান লেখক হফমানস্টান 'জেডারম্যান' নামে এর অনুবাদ করেন।

রেইনহার্ডের শেষ প্রযোজনা ১৯৩৭-এ ফ্রানজ ওয়ারফেলসের 'দ্য এটারনেল রোডস'। কুর্ট ভিলের এই নাটকের সংগীত পরিচালক ছিলেন। নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটন অপেরা হাউসে সকাল আটটা থেকে বিকেল তিনটে পর্যন্ত অভিনয় চলত। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে নাটকটির ১৫৩টি অভিনয় হয়।

তবে নাট্যজগতে রেইনহার্ডের শ্রেষ্ঠ অবদান 'মাইমো ড্রামা'। মাইমো ড্রামা হল সংলাপহীন নাটক। ফ্রান্সে বিপ্লবের পর 'সার্কিড অলিম্পিক, প্যাবি-তে এই নাটককে খুব জনপ্রিয় করে তোলা হয়েছিল। মেরিওনেট ড্রামা-তে অভিনেতার কাজটি চালায় কাঠের পুতুল বা পাপেট। মাইমো ড্রামা-তে রক্তমাংসের অভিনেতা অভিনয় করেন। এই রূপের নাটকে দেহকাণ্ডের দোলায়মান ছাঁচ, জমকালো পোশাক, রঙিন পশ্চাৎপট ও চলমান শরীর চোখের সামনে ভাঁজে ভাঁজে খুলে যায়। রেইনহার্ডের মাইমো ড্রামা-র শ্রেষ্ঠ উদাহরণ 'দ্য মিরাক্‌ল' ও 'সুমুরান'। 'সুমুরান' ছিল অদ্ভুত বাস্তবতা ও ভাবপ্রবণতার মিশ্রণ। গল্পের এই সংলাপহীন উপস্থাপনায় ছিল ইন্দ্রিয়জ সৌন্দর্য, নিরপেক্ষ দৃশ্যপট।

॥ ৬॥

এসথেটিক থিয়েটারের আর একটি ফর্ম হল 'পেজেন্ট'। 'পেজেন্ট' শব্দটির বাংলা আভিধানিক অর্থ— কোনও ঐতিহাসিক ঘটনা বা যুগের প্রদর্শনীস্বরূপ সমারোহপূর্ণ অনুষ্ঠান বা শোভাযাত্রা। প্রারম্ভে 'পেজেন্ট' শব্দটি চাকার ওপর গাড়ি বা চলমান মঞ্চকে বোঝাত। তেরো শতকের মধ্যভাগে ইংল্যান্ডে এই পেজেন্ট মঞ্চের উদ্ভব হয়েছিল। একটি চার বা ছয় চাকাওয়ালা ঘোড়ার বা গোরুর গাড়ির ওপর এই মঞ্চ তৈরি হত। এই গাড়িতে একটি বড় আকারের পাটতন থাকত। গাড়িটি হত দ্বিতল বা ত্রিতল বিশিষ্ট। দ্বিতল ও ত্রিতলে অভিনয় হত। নিচের তলার অংশ পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকত। এটি সাজঘরের কাজ করত,

আবার নরক দেখানোর জন্যও ব্যবহৃত হত। পশ্চাৎপট হিসেবে অঙ্কিত দৃশ্য বা পর্দা ব্যবহৃত হত। এগুলি পরিবর্তন করে দৃশ্যের স্থান পরিবর্তন বোঝানো হত। গাড়িটি তিনদিক খোলা থাকার ফলে তিনদিকে দাঁড়িয়েই দর্শক অভিনয় দেখতে পেতেন। বহু দৃশ্যের অভিনয়ের জন্য বহু গাড়ি ব্যবহৃত হত। দর্শকরা গাড়িগুলির যাত্রাপথে দাঁড়িয়ে থাকতেন।

মধ্যযুগে 'পেজেন্ট'-এর আর একটি অর্থ ছিল। টিউডর ও এলিজাবেথান স্থায়ী মঞ্চগুলিতে রাজানুগমন বা বিবাহের উৎসব পালন করা হত। সেইসব মঞ্চে গান ও নাচ সহযোগে রূপক নাটক অভিনীত হত। 'পেজেন্ট' শব্দটি 'মাস্ক'-এ (গীত ও নৃত্যবহুল নাট্যাভিনয়) কাঠ বা ক্যানভাস-কাঠামো ব্যবহারকে বোঝাত।

পরে 'পেজেন্ট' শব্দটির অর্থান্তর ঘটে দাঁড়ায় 'চিত্তাকর্ষক মিছিল'। উনিশ শতকে ইংল্যান্ডে ও আমেরিকায় পেজেন্ট ফ্যাশানে পরিণত হয়েছিল। ১৯০৫ সালে শারবোর্নে প্রথম পেজেন্ট প্রযোজনা করেন লুইস এন. পারকার। পরে এটি ওয়ারউইক, ডোভার, ইয়র্ক, অক্সফোর্ড ও অন্যান্য জায়গায় অনুসারিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় লন্ডনের নাট্যদলগুলি বহু দেশাত্মবোধক পেজেন্ট প্রযোজনা করেছিল। ১৯১৮-তে 'দ্য পেজেন্ট অব ড্রারি লেন' নামে একটি উৎসব করেছিল ড্রারি লেন। লন্ডনে হয়েছিল লর্ড মেয়রের মিছিল। এই মিছিলে লর্ড মেয়রের ঘোড়ায় টানা গাড়ির সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় চিত্রিত হয়ে গাড়ির মিছিল বের হয়েছিল।

প্রকৃতির বুকে বিশাল মাপের মুক্তমঞ্চকেও 'পেজেন্ট' বলা হয়। সেখানে গীত ও নৃত্যবহুল নাটকাভিনয় হয়। সাধারণত অভিনীত স্থানের ইতিহাস থেকে পেজেন্টের নাটক রচিত হয়। এই পেজেন্টে সাহিত্যের কোনও বিষয় থাকে না। থাকে শুধু শরীরের শোভাপ্রদ মুভমেন্ট, নৃত্য, বর্ণময় পোশাক ও দৃশ্যপটের সৌন্দর্য। এই পেজেন্ট উদ্যোক্তাদের মধ্যে আছে হারমোনি, স্পিরিটস, ডিস্ট্রিক্ট নার্সিং অ্যাসোসিয়েশন, দ্য বয় স্কাউট, উইমেন'স ইনস্টিটিউটস এবং আরও অনেক সংগঠন। উদ্যোক্তারা ও অভিনেতারা অভিনয়ের শেষে সবাই একসঙ্গে গান করেন, 'ল্যান্ড অব হোপ অ্যান্ড গ্লোরি'।

পেজেন্ট-এর বিখ্যাত আখ্যানগুলির মধ্যে আছে : 'স্পিরিট অব দ্য এজেস', 'ফাদার টাইম', 'দ্য রোমান্স অকুপাইং ব্রিটেন', 'দ্য ফাউন্ডিং অব আবে', 'অ্যান ওল্ড ইংলিশ ফেয়ার', 'দ্য ভিজিট অব গুড কুইন বিস', 'দ্য অ্যারাইভাল অব চার্লস ওয়ান অন দ্য ইভ অব আ ব্যাটল'।

আবহাওয়া, অনিশ্চয়তা, বিশাল অর্থব্যয়, সময়, ঝামেলা ও উৎসাহের

প্রয়োজন সত্ত্বেও পেজেন্ট এখনও জনপ্রিয় প্রধানত পাঁচটি কারণে। এক, স্থানীয় দেশাত্মবোধ। দুই, হাসপাতাল বা অন্যান্য স্থানীয় দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রচুর অর্থসংগ্রহ। তিন, এই বিনোদন সর্বশ্রেণীর উপভোগ্য। চার, এই বিনোদন-মাধ্যম এমন সব প্রতিভার অন্বেষক ও আবিষ্কারক যাঁরা কোনওদিনই মঞ্চাভিনয়ের সুযোগ পেতেন না। পাঁচ, এই শিল্প-মাধ্যমটি সমস্ত শিল্পীদের কাছেই বেশ মজার।

অনেকে পেজেন্ট-কে শিল্পের মর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু অনেকেই আবার একে শিল্প বলে স্বীকার করতে চাননি। প্রশ্ন হল, পেজেন্ট কি নাট্যশিল্পের একটি ফর্ম? এর সম্ভাবনা ও ঝুঁকি কী কী? পেজেন্ট বলতেই আমাদের সামনে কী কী দৃশ্য ভেসে ওঠে? সুন্দর এক বহির্মঞ্চে অসংখ্য অসংযুক্ত আখ্যান, উদ্বেল জনতা, রং, মিছিল, সংগীত ও নৃত্য। প্রথমে দৃষ্টিনন্দন এবং তারপরে রোমান্টিক ফর্মে ইতিহাসের বিনির্মাণ। অভিনেতারা সম্পূর্ণ অপেশাদার। তাদের মধ্যে আবার বেশিরভাগই নিয়মিত অপেশাদারও নন। আর দর্শক? পেজেন্ট-এর দর্শকসংখ্যা বিরাট। এক সুন্দব সূর্যকরোজ্জ্বল দিনে তাঁরা বন্ধুদের অপরিচিত পোশাকে দেখেন। তাঁদের দেখে হাসেন। তাঁদের প্রশংসা করেন। তাঁদের অসামঞ্জস্য দেখে আনন্দ পান। তাঁরা আবেগের অভিজ্ঞতা লাভ কবতে যান না। মনন বা কল্পনার চর্চাও করতে চান না। তাঁরা পেজেন্ট-এর কাছে খুব কম প্রত্যাশা করেন। তাঁরা সহজেই খুশি হন। সমস্ত দেশ এই মিছিলের সঙ্গো সঙ্গো চলে। সুসজ্জিত জনতা প্রত্যেকটি দৃশ্যে অংশ নেন। অভিনয়স্থলকে ভর্তি করে দেন। প্রত্যেকেই নিজেরা প্রচুর আনন্দ করেন।

পেজেন্ট-এ থাকে ইতিহাসের উপস্থাপনা। এখানে ইতিহাসের আসল নাটক দেখাবার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। ব্যক্তির সাথে জনতার দ্বন্দ্ব, মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অগ্রজ্ঞানশক্তি, পশ্চাৎচিন্তার প্রতিক্রিয়া, চরিত্র এবং বুদ্ধির আধিপত্য অথবা পরাজয়, মানসিকতার বাড়ন্ত যন্ত্রণা— এইসব বিষয় উপস্থাপনার সুযোগ। ইতিহাসকে উপস্থিত করা নয়, ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করাই এই নাট্যের কাজ। এই নাট্যে দর্শক ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ হলেও কিছু এসে যায় না। সদ্যপ্রবহমান মানুষের জীবননাট্য তাঁদের দেখাতে পারলে তাঁরাও প্রতিক্রিয়া দেখাবেন, যেহেতু তাঁরা এই অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের এক অংশ। এই নাট্যে অভিনেতারা প্রশিক্ষিত না হলেও কিছু এসে যায় না, কারণ যেসব মানুষ পেজেন্ট-এর জনতা হন তাঁরা সবাই নগর বা গ্রামকে ভালোবাসেন। যদি তাঁরা প্রতিক্রিয়া দেখাবার সুযোগ পান তাঁরা সবাই অভিব্যক্তিতে ফেটে পড়তে চান।

পেজেন্ট-এর মূল উপকরণ তিনটি : স্থান, ব্যক্তি ও জনতা। প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ 'স্থান'। স্থান এবং মানুষের মধ্যে একটি সম্পর্ক আগে

থেকেই থাকে। অনেকে সেখানে হয়তো দীর্ঘদিন বাস করছেন। অনেকে প্রায় অর্ধশতক ধরে। স্থানটি তাঁদের কাছে এক জীবন্ত ব্যক্তিত্ব। স্থানটি তাঁদের কাছে একটি চরিত্র। একটি ভগ্ন দুর্গ মুহূর্তমধ্যে তাঁদের কাছে এনে দেয় একদল সৈন্য, যুদ্ধ, প্রতিরক্ষা, কোলাহল, পেশীর শক্তি। একটি গির্জা বা মঠ তাঁদের মনে করিয়ে দেয় নির্জনতা, শিক্ষা, সেবা, পবিত্রতা। একটি পুরোনো পাথর অথবা গাছ ইতিহাসকে সময়ের সঙ্গো যুক্ত করে দেয়। একটি সেতু, একটু পুরোনো রাস্তার মোড়, একটি পথপার্শ্ব ভোজনালয়— এসবই পেজেন্ট-এর পক্ষে উপযুক্ত স্থান। এগুলি সর্বক্ষণ ব্যবহার করা যায়।

পেজেন্ট-এর দ্বিতীয় উপকরণ 'ব্যক্তি'। প্রাচীনকালের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, 'ব্যক্তি' সেই সময় জনতার ওপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল। পেজেন্ট-এ এমন 'ব্যক্তি-চরিত্র' বেছে নেওয়া হয় যাঁর জনমানসে খুব উঁচু ও শক্তিশালী প্রভাব আছে। পেজেন্ট-এ চরিত্রের সূক্ষ্ম আবেগ অথবা জটিল মানসিক দ্বন্দ্ব দেখাবার কোনও সুযোগ নেই। প্রধান চরিত্রগুলি অবশ্যই কোনও নিশ্চিত বিশ্বাসের অধিকারী হবে। সেই বিশ্বাস এতটাই শক্তিশালী হবে যে, প্রায় প্রতীকি বা লিজেন্ড হয়ে যাবে। প্রায়ই দেখা যায়, একক ব্যক্তি-প্রতিভা কোনও যুগান্তকারী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় বা পরিবর্তনের কথা বলে। পেজেন্ট সেই ব্যক্তির যুগান্তকারী চিন্তা বা মতাদর্শের সঙ্গো জনতার রক্ষণশীলতার দ্বন্দ্ব দেখায়। ব্যক্তি তাঁর নতুন ধারণাটি জনগণের মধ্যে প্রজ্জ্বলিত করার চেষ্টা করেন। তাঁর শক্তি জনগণকে আন্দোলনের পথে নামাতে সমর্থ হয়। তাঁদের সম্মিলিত মনকে জয় করতে সমর্থ হয়। একটি স্পষ্ট উদাহরণ হল, 'জুলিয়াস সিজার' নাটকে 'জনগণের সভাস্থলের দৃশ্য'। আমরা মানবেতিহাসে এই দৃশ্যটি বারবার অভিনীত হতে দেখি। তারপর ধরা যাক 'কৃষক বিদ্রোহ', 'স্বাধীনতার যুদ্ধ', 'ক্রুসেড'-এর উপদেশ। উলটোটাও দেখা যেতে পারে। যেমন 'জনতা'র নিষ্ঠুর শক্তি দিয়ে একটি মতাদর্শের জয়, 'কার্টিস্ট দাঙ্গা' ইত্যাদি। তবে দু'দল জনতার প্রত্যক্ষ সমর্থন না থাকলে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আর এক ব্যক্তির সংঘাতের নাটক পেজেন্ট-এ চলে না। কিন্তু জনতার বিরুদ্ধে মানুষ হিসেবে এক ব্যক্তির সংঘাতের নাটক পেজেন্ট-এ স্থান পায়। ব্যক্তি তখন এমন এক অসামান্য শক্তিতে পরিণত হয় যে, সে তার বিপরীতে থাকা বিশাল জনতার শক্তির সমকক্ষ হয়ে ওঠে। তখন দুটি বিপরীতমুখী শক্তির এক আশ্চর্য ভারসাম্য রচিত হয়। এইজন্য পেজেন্ট-এর 'ব্যক্তিটি'কে হতে হয় অতিমানব।

পেজেন্ট-এর তৃতীয় উপাদান হল 'জনতা'। 'জনতা' কোনও একটি দৃশ্যে সংঘবদ্ধ হয়ে প্রধান চরিত্র হতে পারে। কোনও একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে

অ্যাকশন করতে পারে। জনতার ভিতর দিয়ে মানবমনের ক্রমবিকাশ দেখানো যেতে পারে। প্রজন্মের পর প্রজন্মে কীভাবে জনতার চরিত্র পালটে যায় অথবা মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কই বা কী দাঁড়িয়েছে তা দেখানো যায়। এই 'জনতা'কে নিয়ে কাজ করতে গেলে 'জনতা' সম্পর্কে অনেক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা প্রয়োজন। মুভমেন্টের ঐকতান, স্টাইলাইজেশন, সংলাপ বলার পদ্ধতি ইত্যাদি ইত্যাদি। মঞ্চের চার দেওয়ালের মধ্যে এই জনতার অভিনয় আধুনিক মঞ্চে অনেক দেখা যায়। কিন্তু মঞ্চের বাইরে নজরে পড়ে না। জার্মানিতে 'ল্যাবন স্কুল অব মুভমেন্ট' এবং রুডলফ ল্যাবন ও কুর্ট জুসের শিক্ষা পেজেন্ট প্রযোজনার জন্য অত্যাবশ্যক।

দর্শকরা দীর্ঘ পেজেন্ট পছন্দ করেন না। তাই দুই বা আড়াই ঘণ্টার মধ্যে তিন থেকে পাঁচটি আখ্যান নিয়ে পেজেন্টের নাটক তৈরি হয়। প্রত্যেকটি আখ্যান অন্য আখ্যান থেকে স্বতন্ত্র হয় এবং দর্শককে এক মুড থেকে আর এক মুডে নিয়ে যায়। পেজেন্ট-এ ট্রাজেডি ও কমেডি দুই রূপই প্রয়োজনীয়। দুটিই শক্তিশালী হওয়া চাই। টাট্টু ঘোড়ার ছন্দময় চলার মতো এর চলন হওয়া চাই।

পেজেন্ট উন্মুক্ত স্থানে অভিনীত হয়। সেখানে শব্দ প্রক্ষেপণের একটি সমস্যা থাকে। সেখানে বৃষ্টি বা বাতাস সর্বদাই শত্রু। দুইয়ের মধ্যে বৃষ্টি সর্বনাশী। অভিনেতারা বৃষ্টিতে ভিজে অভিনয় করলেও তাঁদের কণ্ঠস্বর দর্শকের কানে পৌঁছয় না। তবে এই সমস্যা দূরীকরণের রাস্তা দেখিয়েছেন প্রাচীন গ্রিক ও রোমান থিয়েটারের নির্মাতারা। শেলডন চিনোয় তাঁর 'দ্য ওপেন এয়ার থিয়েটার' ও এ. ই. হেইগ তাঁর 'দ্য অ্যান্টিক থিয়েটার' গ্রন্থে এই সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য জানিয়েছেন। গ্রিক ও রোমান থিয়েটারে অভিনেতা ও দর্শকের তুলনামূলক স্তরটি খুব সতর্কভাবে গবেষণা করা হয়েছিল। তাই তাঁরা প্রাকৃতিক মঞ্চ তৈরিতে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন। প্রধান অভিনেতাদের অভিনয়স্থল ছিল দর্শকের তৃতীয় ও চতুর্থ সারির স্তরে। সামনে জমি থাকত অল্প। বাকি প্রেক্ষাগৃহ থাকত মঞ্চ-স্তরের ওপর। অভিনেতারা যদি দর্শকের থেকে ওপরে থাকেন, তবে তাঁর কণ্ঠস্বর বাইরে বেরিয়ে যায়। আমেরিকার হার্স্ট গ্রিক থিয়েটারে দশ হাজার দর্শক মঞ্চে কথোপকথনের সময় প্রত্যেকটি উচ্চারিত শব্দ শুনতে পান। প্রসঙ্গত, আমেরিকাতে এখন অনেক উন্মুক্ত স্থানে নাটক অভিনীত হচ্ছে।

প্রাকৃতিক পরিবেশে অভিনয় করার সুবিধা-অসুবিধা দুই-ই আছে। যেমন গাছ। পশ্চাৎপট সৃষ্টিতে তার জুড়ি মেলা ভার। এতে শব্দকে সম্মুখমুখী করাও সহজ। মঞ্চ-তৈরি করতে, প্রবেশ-প্রস্থানকে আড়াল করতে, আলো-ছায়া সৃষ্টি করতে গাছ সাহায্য করে। কিন্তু এক্ষেত্রে জোরে বাতাস বইলে কথা শোনা যায়

না। পশ্চাৎপটে যদি পাহাড় বা মালভূমি থাকে অথবা যদি ঝুলন্ত গাছ থাকে তাহলে শব্দ-প্রক্ষেপণ ভালো হয়। অভিনেতার কণ্ঠস্বর সহজশ্রাব্য হয়। আরও ভালো হয় যদি জল থাকে। অভিনয়-স্থানের নিচে যদি শান্ত নদী বা পুকুর থাকে তবে শব্দ সহজেই শ্রুত হয়।

॥ ৭॥

'এসথেটিক থিয়েটার'-এর প্রবক্তাদের 'আর্ট ফর আর্ট'স সেক' নান্দনিক মতাদর্শটি অনেক সমাজমনস্ক শিল্পী-সাহিত্যিক মেনে নেননি। তাঁরা বলেছেন, শিল্প শুধু শিল্পসৃষ্টির আনন্দেই তৃপ্ত থাকবে না, মানুষের কল্যাণের কথাও ভাববে। শিল্প শুধু ভূমা নয়, ভূমির মানুষের কল্যাণাশ্রয়ও। তাঁদের অভিমত, এই জীবনরহিত শিল্পসৃষ্টির মতাদর্শের মূলে আছে শিল্পীর শূন্যতাবোধ ও প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারা। তাঁরা মনে করেন, কলাকৈবল্যবাদীদের মূল লক্ষ্য হল আঙ্গিক বা রূপসৃষ্টি। বিষয়বস্তুর কোনও ভূমিকা সেখানে নেই।

রুশ চিন্তাবিদ প্লেখানভ বলেছেন, 'শিল্পের জন্য শিল্প'-র প্রচারক সেইসব শিল্পী যাঁরা বিশ্বাস করেন, শিল্প সমাজ-নিরপেক্ষ। বিশ্বাসটি সাংঘাতিক ও হতাশাজনক।' ক্রিস্টোফার কডওয়েল বলেছেন, 'এইসব শিল্পী হাড় থেকে মাংস আলাদা করার মতো সামাজিক ক্রিয়া থেকে শিল্পকে বাদ দিয়েছেন।' বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'আমোদ ভিন্ন অন্য লাভ যে কাব্যে নেই, সে কাব্য সামান্য বলিয়া গণ্য হয়।' বার্নাড শ বলেছেন, 'শিল্পের জন্য শিল্প' তত্ত্বটিকে মেনে নিলে 'অর্থের জন্য সাফল্য' তত্ত্বটিও মেনে নিতে হয়। অথচ শিল্প কখনই শিল্পের জন্য জন্ম নেয় না।'

অথচ আমরা দেখেছি, পাশ্চাত্য দেশে মহাকাব্যের জন্মদাতা হোমার, আলকিদামাস থেকে আরম্ভ করে আরিস্ততল পর্যন্ত আনন্দসৃষ্টিই শিল্পীর একমাত্র কাজ বলে নিদান দিয়েছেন। পরবর্তীকালে ক্রোচে প্রমুখ বলেছেন, বিষয়ের গুরুত্বের ওপর সৌন্দর্যের গুরুত্ব নির্ভর করে না। প্রকাশভঙ্গি বা ফর্মই সৌন্দর্যসৃষ্টির নিয়ামক। সৌন্দর্যের প্রাণ। বিষয় এখানে গৌণ, ফর্মই প্রধান। তাঁরা বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গির সংযোগে সৌন্দর্যের জন্ম হয় বলেও স্বীকার করেন না। অন্যদিকে ব্রাডলি প্রমুখ অনেকে বলেছেন, বিষয়ের গুরুত্ব যে একেবারেই অকিঞ্চিৎকর তা নয়, তবে কেবলমাত্র বিষয়ের গুরুত্ব দ্বারা আর্টের গুরুত্ব নির্ণয় হয় না। আমাদের দেশে এই তত্ত্বের সপক্ষে অনেকের সমর্থন পাই। জয়ন্ত বলেছেন, বস্তুর নতুনত্ব না থাকলেও তার বিন্যাসের নতুনতা থাকতে পারে। কুন্তক বলেছেন, শব্দ ও অর্থের বিচিত্র বিন্যাসের ওপরই কাব্যের সৌন্দর্য নির্ভর

করে। রবীন্দ্রনাথও বিনা প্রয়োজনের যে আনন্দ তাকেই সৌন্দর্যের স্বরূপ বলে বর্ণনা করেছেন। অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর 'আর্ট' গ্রন্থে লিখেছেন, 'আর্টের খাতিরে আর্ট' বলি যখন, তখন এই কথাটাই বোঝাতে চাই যে আর্ট নয় সামাজিক বা আধ্যাত্মিক বা নৈতিক বা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের উপায়। আর্ট হচ্ছে আপনি আপনার উদ্দেশ্য। আপনি আপনার উপায়।' তবে তিনি এও বলেছেন যে, 'আর্টের খাতিরে আর্ট' যদিও বলি, তবু একথাও স্বীকার করি যে আর্টের ফল সুদূরপ্রসারী। তার প্রত্যক্ষ ফল রূপভোগ ও রসভোগ, কিন্তু পরোক্ষ ফল এমন সব পরিবর্তন যা সমাজনায়ক বা রাষ্ট্রনায়কের স্বপ্ন।' ড. সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর 'সৌন্দর্যতত্ত্ব' বইতে লিখেছেন, 'যখন বলি 'শিল্পের জন্য শিল্প' বা 'সাহিত্যসৃষ্টি সাহিত্যসৃষ্টির জন্য' তখন আমাদের ইহাই বলিবার তাৎপর্য যে সাহিত্যের দ্বারা অপকার কি উপকার হয়, মঙ্গল কি অমঙ্গল হয় ইহা আমাদের বিচার করিবার বিষয় নহে। পাঁচরকমের উপকার বা মঙ্গলকার্য যেমন আমাদের বিধেয় পর্যায়ভুক্ত, সাহিত্যসৃষ্টিও তেমনি কবির একটি স্বাভাবিক বিধেয়কর্ম। ইহা অন্য কিছুর প্রতি গৌণভূত দ্বার বা সাধন নহে। কোনও কাব্যে বা চিত্রে ধর্ম বা ভক্তির উদ্রেক হইতে পারে। কোনও কাজে দেশভক্তি জাগিতে পারে, কোনও কাব্যে বা যৌনবৃত্তি উদ্রিক্ত হইতে পারে, কিন্তু ইহার কোনটিই সাহিত্যের উদ্দেশ্য নহে। সাহিত্যসৃষ্টির উদ্দেশ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি। ইহা এতদাতিরিক্ত কোনও বাহ্য অর্থকে স্বীকার করে না। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, এই দৃষ্টিতে দেখিলে আর্টকে জীবন হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখা হয়, কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। জীবনের যে নানাপ্রকার দাবী আছে সেই দাবীর মধ্যে সৌন্দর্য সৃষ্টিরও একটি স্থান আছে। জীবনের সকল দাবীগুলি এমন নহে যে, তাহাদের প্রত্যেকটিকে অপরটির সহিত সাধ্যসাধন পরম্পরায় সাজানো যায়। ক্ষুধার দাবীর সঙ্গে ধর্মের দাবীর কোনও সাধ্যসাধন নাই। ধর্মের চাওয়া একরূপ, ক্ষুধার চাওয়া আর একরূপ। ক্ষুধার চাওয়া আহারে মেটে, কিন্তু সেই দাবী মিটাইলে ধর্মের দাবী মেটে না। জীবনে যেমন জৈববৃত্তি আছে তেমনি বীক্ষাবৃত্তি আছে। জৈববৃত্তির সার্থকতা জৈবব্যাপারে জীবনের রক্ষণ বর্ধন স্থাপন প্রভৃতিতে, এই জন্য জীবনোপযোগী যাহা কিছু তাহারই তাহার নিকট মূল্য আছে। কিন্তু বীক্ষাবৃত্তির সার্থকতা সৌন্দর্যানুভবে ও সৌন্দর্য সৃষ্টিতে। বীক্ষাবৃত্তির কাছে সেই জন্য সৌন্দর্যেরই মূল্য সর্বাপেক্ষা অধিক।'

এইভাবে দুইদিকে দুই প্রকারের একান্তবাদী আছেন। একজন বলেন, শিল্পে 'বিষয়ই' সর্বস্ব। আর একদল বলেন, শিল্পে 'রূপ'ই প্রধান। কেউ কেউ মনে করেন, শিল্প-সাহিত্য চলে শিল্প-সাহিত্যের নিয়মে, সমাজের নিয়মে নয়। অন্যেবা

মনে করেন, শিল্পী-সাহিত্যিকরা যখন সমাজে বাস করেন, কেবল খাওয়া-পরা নয়, শিল্প-সাহিত্যের উপাদানও যখন জোগাড় করেন সমাজ থেকে এবং তা ফিরে আসে সমাজবাদী মানুষের উপভোগের জন্যেই, তখন শিল্পী-সাহিত্যিককে সমাজের কাছে দায়বদ্ধ থাকতেই হয়। সমাজের সুনীতি-দুর্নীতির কথা ভাবতেই হয়। একদিকে যেমন 'শিল্পের জন্যই শিল্প' মতের বহু পোষক আছেন, অন্যদিকে তেমনই 'শিল্পের উদ্দেশ্য শিক্ষা' মতের পক্ষেও বহু মানুষ আছেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন, বিষয় ও প্রকাশভঙ্গিঙ্গা উভয়ের সার্থক সম্মেলনের ওপরই সৌন্দর্য নির্ভরশীল।

বিষয়টিকে বোঝার চেষ্টা করা যাক। কালিদাসের 'মেঘদূত', অজন্তার ছবি কিংবা মহাবলীপুরমের ষাঁড়ের ভাস্কর্য দেখে সরাসরি কোনও সমাজহিতের কথা মনে পড়ে না। তাই বলে কি তার কোনও দরকার নেই? আচ্ছা, ওইসব ঐতিহ্যগত উদাহরণের কথা ছেড়ে হাল আমলের কথায় আসা যাক। তারাশঙ্করের 'অগ্রদানী', গগন ঠাকুরের 'সিঁড়ি' এবং রামকিঙ্করের ভাস্কর্য 'রবীন্দ্রনাথ' সরাসরি কোনও লোকহিতৈষণাব কথা বলে না। তা বলে এগুলি কি পাশ কাটিয়ে যাব? অন্তত আমরা না চাইলেও এগুলি যে থেকে যাচ্ছে এবং সম্ভবত আরও অনেকদিন থেকে যাবে তা স্পষ্ট। কেন থাকছে? তার কারণ, এখানে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে।

আবার এরই পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', অবনীন্দ্রনাথের 'ভারতমাতা' কিংবা একেবারে একালের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হারানের নাতজামাই' এবং সলিল চৌধুরীর আইপিটিএ-র গানও থেকে গেছে। তার মধ্যে সামাজিক বক্তব্যই প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে।

শিল্প-সাহিত্যের গোড়ার কথাটি ভাবলে বোধকরি বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে। মানুষ যখন এখনকার মতো মানুষ হয়ে ওঠেনি, তখন থেকেই শিল্পের উৎপত্তি। প্রথমে রেখাচিত্র, যেমন আলতামিরার গুহায় দেখা যায়। পরে সংগীত, যেমন পিকিং মানবের গুহায় বাঁশির মতো ফুটোওয়ালা পশুর সরু হাড় দেখে মনে করা হয়। কবিতা এসেছে তারও কিছু পরে, যৌথ গান ও নাচের লিরিক বা যাদুমন্ত্র হিসেবে। কাজেই প্রতিটি শিল্প-মাধ্যমেরই দেখা যাচ্ছে মূল লক্ষ্য সামাজিক ব্যবহার। যদিও যখনকার কথা বলা হল, তখনও সঠিক অর্থে হয়তো সমাজ গড়ে ওঠেনি, মানুষ ছিল নিতান্তই গোষ্ঠীবদ্ধ প্রাণী।

আবার অন্য দিক থেকে দেখলে বলা যায়, যেসব শিল্পী আলতামিরার ওইসব হরিণ-বাইসনের শিকার দৃশ্য এঁকেছে, তারা তো শুধু শিকারের দৃশ্য এঁকে অন্যদের শিকারে মদত দিয়ে থামেনি, ছবিগুলি যাতে যথাসাধ্য যথাযথ হয়,

বেগবান হয় এবং দ্রষ্টার মনে নান্দনিক সুখানুভূতি জাগে সেদিকেও খেয়াল রেখেছে। বাঁশীর সুরকার এবং গানের গীতিকারও এইভাবে গোষ্ঠী হিসেবে টিকে থাকার সংগ্রামে সাহায্য করেও, শ্রোতাদের নান্দনিক আনন্দের দিকে অবহেলা করেনি।

অনেক পরে মানুষ প্রত্যক্ষ প্রয়োজন থেকে শিল্প-সাহিত্যকে বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছিল। কারণ সে বোধহয় টের পেয়েছিল যে সৌন্দর্যের নিজেরও কিছুটা সামাজিক চাহিদা আছে, তারও হিতকারী প্রভাব আছে। যাঁরা কডওয়েল কিংবা টমসনের বই পড়েছেন তাঁরা সৌন্দর্য সৃষ্টির সামাজিক প্রয়োজনের কথা ভালোই জানেন। তাঁরা জানেন, মানুষ শুধু জীবন সংগ্রামে প্রেরণা পাবার জন্যই শিল্পসৃষ্টি করে না, ওই সংগ্রামে তার যে পরিশ্রম, ক্লান্তি এবং কখনও কখনও হতাশা, অবসাদ ইত্যাদি ঘটে তারও শুশ্রূষা পায় সে শিল্প থেকে। যে শিল্পে সরাসরি সামাজিক দায়দায়িত্বের কথা নেই, সেখান থেকেও পেতে পারে সারাদিনের ক্লান্তির পর অবগাহনের সজীবতা।

গত যুদ্ধের সময় যাঁরা বয়োপ্রাপ্ত ছিলেন, তাঁদের হয়তো মনে পড়বে, শিক্ষিত বিদেশি সৈনিকদের হিপ-পকেটে অনেক সময়েই থাকত সস্তা সরু এডিশনের গল্প-কবিতার সংগ্রহ। মৃত্যু যখন পায়ে পায়ে, তখন সেই চাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার রাস্তা ছিল তাদের সামনে গল্প-কবিতা পড়া। এরা গান-বাজনা, থিয়েটার-সিনেমারও সমঝদার ছিল।

শিল্প-সাহিত্যের যে গণ্ডির প্রয়োজন শরীরের শ্রান্তি এবং মনের চাপ কাটানোর জন্যে, তার সব থেকে ভালো উদাহরণ পাওয়া গেছে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়। প্রথমে জাপানি, তারপর ফরাসি এবং সবশেষে মার্কিনি হামলাবাজদের সঙ্গে তিন দশক ধরে লড়াই করেছিল ভিয়েতনামের অজেয় মুক্তিযোদ্ধারা। শেষের দিকে মার্কিনিরা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে, নদীর জলে বিষ ঢেলে, নাপাম বোমায় গাছপালার পাতা পুড়িয়ে এক নজিরহীন পৈশাচিক যুদ্ধ চালিয়েছিল। কিন্তু প্রতিরোধ ও প্রতি-আক্রমণও চলছিল ছোট ছোট গেরিলা দলে বিভক্ত হয়ে। প্রতিটি আশ্রয়ই ছিল তখন অনিশ্চিত ও বিপদসঙ্কুল। কিন্তু তখনও ভিয়েতনামি গেরিলারা গোপন আশ্রয়ে বসে কবিতা ও নাটক লিখে আবৃত্তি ও অভিনয় করত, গান গাইত। তাদের কঠিন লড়াইয়ের এসবই ছিল অনিবার্য জীবনসঙ্গী।

তাই বলা যাক, কেবল মদত দেবার সাহিত্য-শিল্প নয়, যা সৌন্দর্যময় তারও দরকার আছে। সৌন্দর্যের অবগাহনযোগ্যতা আছে। মনের মালিন্য মুক্ত করার ক্ষমতা আছে।

রিয়ালিস্টিক থিয়েটার

- 'বাস্তবের বিশ্বস্ত প্রতিচিত্রায়নই হল 'রিয়ালিজম'। সমাজের অকৃত্রিম চিত্ররূপই হল 'রিয়ালিস্টিক আর্ট'।'

  —অনরে দোমিয়ে ও গুস্তাভ ক্যুরবে

- 'উপন্যাসের নায়কের সর্বদা অসাধারণ হওয়া জরুরি নয়— সাধারণ মানুষও উপন্যাসের নায়ক হতে পারেন।' *—শঁ ফ্ল্যারি*

- 'উইলিয়ামস হলেন কাব্যিক রিয়ালিস্ট বা বলা যেতে পারে রিয়ালিস্টিক কবি। উনি তাঁর নাটকের চরিত্রগুলিকে দেখতে পান। উনি দৃশ্য-লেখক'।

  —মার্টিন ব্রাউন

- 'সারা ইউরোপ 'ইবসেনিয়াস'-এ আবিষ্ট হয়ে গেছে।' *—বার্নাড শ*

- 'সমাজতন্ত্রের কয়েকটি ভালো দিক তো আছেই। খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচানোর নিরাপত্তা ধনতন্ত্রী দেশের চেয়ে ভালো। কিন্তু স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায়? রাষ্ট্র আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছে চালিত করবে, হয় না তা।'

  —আর্থার মিলার

- 'এমন বাহ্যিক রূপসমৃদ্ধ ও বিস্ময়কর নিয়মানুবর্তিতা-সমৃদ্ধ প্রযোজনা আমরা মস্কোবাসীরা আগে কখনও দেখিনি।'

  —কনস্তানতিন স্তানিস্লাভস্কি

- 'সংগীতে যেমন লিরিক, নাটকে তেমনি আলোকসম্পাত। আর কোনও উপাদানই নাটকের মুড ও চরিত্রের অনুভূতি প্রকাশে এতটা কার্যকরী নয়।' *—ডেভিড বেলাস্কো*

- 'নিরাবরণ বাস্তব নিয়ে ফোটোগ্রাফি হতে পারে, শিল্প হয় না।'

  —লুইজি পিরানদেল্লো

- 'বাস্তববাদের নামে অনুভূতিবাদ জীবনকে খণ্ডিত ও সীমিত করে কল্পনাকে বন্দি করে রাখে।' *—অগাস্ট স্ট্রিন্ডবার্গ*

- 'থিয়েটারকে বাস্তব জগতে পরিণত করার চেষ্টা বাতুলতা ছাড়া আর কিছু নয়।' —*গর্ডন ক্রেইগ*
- 'শিল্প আনন্দদায়ক সফর নয়। শিল্প একটি যুদ্ধ।' —*আর্থার মিলার*
- 'আপনি বলতে চান চীনের একজন মার্ক্সিস্ট আর সোভিয়েত ইউনিয়নের একজন মার্ক্সিস্ট এক?' —*আর্থার মিলার*

॥ ১॥

দর্শনে 'রিয়ালিজম' শব্দটি 'নমিনালিজম' ও 'আইডিয়ালিজম' মতবাদ দুটির বিপরীতার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'নমিনালিজম' বলে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শুধু নাম ছাড়া কিছু নয়। তাই বাংলায় এই মতবাদকে বলা হয় 'নামবাদ'। 'আইডিয়ালিজম' বলে, বাস্তবে আমরা যা দেখি সবই মায়া। তার জন্য এই মতবাদকে বাংলায় বলে 'মায়াবাদ'। 'রিয়ালিজম' এই দুই মতবাদের একেবারে বিরুদ্ধ মতবাদ। 'রিয়ালিজম' বলে, বস্তুর বাস্তব অস্তিত্ব আছে।

সাহিত্যে 'রোমান্টিসিজম' ও 'নিও-ক্লাসিজিম'-এর প্রতিবাদী মতবাদ হিসেবে 'রিয়ালিজম'-এর জন্ম হয়। আঠারো শতকের মধ্যভাগে ফরাসি দেশে শঁ ফ্ল্যারির 'ল রিয়ালিজম' গ্রন্থে প্রথম 'রিয়ালিজম'-এর সচেতন বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ফ্ল্যারিই সর্বপ্রথম বলেন, 'উপন্যাসের নায়কের সর্বদা অসাধারণ হওয়াটা জরুরি নয়—সাধারণ মানুষও উপন্যাসের নায়ক হতে পারে।'

আঠারো শতকের শেষদিকে জার্মান কবি, নাট্যকার ও সাহিত্যতত্ত্বের অন্যতম পুরোধা ফ্রিডরিশ শিলার (১৭৫৯-১৮০৫) বহির্বাস্তব অর্থে 'রিয়ালিজম' শব্দটি ব্যবহার করেন। এই সময়ে চিত্রশিল্পে ফরাসি শিল্পী অনরে দোমিয়ে (১৮১০-১৮৭৯) এবং গুস্তাভ ক্যুরবে (১৮১৯-১৮৭৭) রিয়ালিস্টিক আন্দোলন শুরু করেন। তাঁরা বলেন, 'বাস্তবের বিশ্বস্ত প্রতিচিত্রায়নই হল 'রিয়ালিজম'। সমাজের অকৃত্রিম চিত্ররূপই হল 'রিয়ালিস্টিক আর্ট'।'

বস্তুত শিল্প-সাহিত্যে রিয়ালিজম বলতে বাস্তব জীবনের সত্যবাদী অনুকরণকে বোঝানো হয়েছে।

উনিশ শতকে রিয়ালিস্টিক সাহিত্যিক হয়ে এলেন ফ্রান্সের স্তাঁদাল, বালজাক ও ফ্লোবেয়ার; রাশিয়ার পুশকিন, গোগোল ও অস্ত্রোভস্কি; ইংল্যান্ডের ডিকেন্স ও জেমস এবং আমেরিকার হাওয়েলস। এই বাস্তববাদী সাহিত্যিকরা এই সত্য মানলেন যে, সাহিত্যের বিষয়বস্তু হবে বাস্তব ও জীবনকেন্দ্রিক। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাই হবে মুখ্য উপজীব্য। এই সাহিত্যিকরা তাঁদের গল্প-উপন্যাস-

কবিতায় সাধারণ মানুষের দুঃখ-দৈন্যর ছবি ফুটিয়ে তুললেন। এঁরা একই সঙ্গে সামাজিক অধঃপতন, উৎপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে অস্ত্ররূপে নিজের লেখনীকে ব্যবহার করলেন। পুঁজিপতিদের সুতীব্র অর্থলালসা ও চারিত্রিক ব্যভিচারের ক্লেদাক্ত দৃশ্য উদ্‌ঘাটন করলেন।

অনরে দ্য বালজাক (১৭৯৯-১৮৫০) তাঁর বিখ্যাত 'ড্রোল স্টোরিজ'-এ বিত্তবান পরিবারের মানুষগুলির চরিত্রের বিভিন্ন দিকের দৈন্য ফুটিয়ে তুললেন। জুলিয়েঁ সোরেলের মতো এক যুবকের আত্মিক পরাজয়ের করুণ কাহিনি লিখে স্তাঁদাল ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কুফল দেখালেন। তিনি দেখালেন, কল-কারখানায় বিকশিত পুঁজিপতিরা কাঞ্চনমূল্যের বিনিময়ে শুধু মানুষের শ্রম কেনে না, তাদের স্বাধীনতাও কিনে নিতে চায়। জুলিয়েঁ সোরেল সেই বিপন্ন মানুষের প্রতিনিধি।

গুস্তাভ ফ্লোবেয়ারের (১৮২১-১৮৮০) 'মাদাম বোভারি' (১৮৫৭) উপন্যাস প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ফরাসি উপন্যাসে রোমান্টিক যুগের শেষ ও বাস্তববাদের যুগ শুরু হয়। ফ্লোবেয়ার বললেন, 'উপন্যাসকে হতে হবে সমকালীন সমাজের যথাযথ দলিল। ইতিহাসবিদ ও জীবনীগ্রন্থকারের মতো তথ্য বিচার-বিশ্লেষক।' আলেকজান্দার পুশকিন (১৭৯৯-১৮৩৭) তাঁর 'ক্যাপ্টেন'স ডটার' (১৮৬৬) রচনায় ১৭৭৩-৭৫ সালে পুগাচেভের নেতৃত্বে যে কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল বাস্তববাদী দৃষ্টি দিয়ে তার কাহিনি লিখলেন। চার্লস ডিকেন্স (১৮২২-১৮৭০) তাঁর 'ডেভিড কপারফিল্ড', 'ব্লিক হাউস' প্রভৃতি উপন্যাসে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অর্থের লালসা ও নানাবিধ সামাজিক উৎপীড়নের নগ্ন চেহারা উদ্‌ঘাটিত করলেন।

রিয়ালিজম-কে নাট্যসাহিত্যে অধিষ্ঠিত করলেন রাশিয়ার নিকোলাই গোগোল (১৮০৯-১৮৫২) ও নিকোলাভিচ অস্ত্রোভস্কি (১৮২৩-১৮৮৬); জার্মানির গেওর্গ বিকেনার (১৮১৩-১৮৩৭), ফ্রিডরিশ হেবেল (১৮১৩-১৮৫৩), গেরহার্ট হাউপ্টমান (১৮৬২-১৯৪৬) ও ফ্রাঙ্ক ওয়েদকাঁদ (১৮৬৪-১৯১৮); ফ্রান্সের অনরে দ্য বালজাক (১৭৯৯-১৮৫০); ব্রিটেনের থমাস উইলিয়াম রবার্টসন (১৮২৯-১৮৫০), জর্জ বার্নাড শ (১৮৫৬-১৯৫০), সমারসেট মম (১৮৭৪-১৯৬৫) ও জন গলসওয়ার্দি (১৮৬৭-১৯৩৩); আমেরিকার ডেভিড বেলাস্কো (১৮৫৩-১৯৩১), টেনিসি উইলিয়ামস (১৯১৪-১৯৩৮) ও আর্থার মিলার (১৯১৫-২০০৫) এবং নরওয়ের হেনরিক ইবসেন (১৮২৮-১৯০৬)।

গোগোলের বিখ্যাত নাটক 'দ্য গভর্নমেন্ট ইন্সপেক্টর' (১৮৩৬)। নাটকটির মূল রুশ নাম 'রেভিজর'। নাটকটি ইংরাজিতে 'দ্য ইন্সপেক্টর', 'দ্য গর্ভনমেন্ট ইন্সপেক্টর' ইত্যাদি নামে অনূদিত হয়েছে। বিশ্বের প্রায় সর্বত্র নাটকটি অভিনীত

হয়েছে।

অস্ত্রোভস্কিকে মাসকোভিট মার্চেন্ট এর 'বালজাক' বলা হত। তাঁর বিতর্কিত 'দ্য ব্যাংক্রাপ্ট' (১৮৪৭) নাটকটির ১৮৪৮-এ নাম হয় 'ইট ইজ অল ইন দ্য ফ্যামিলি'। নাটকটি ৩০ বছর যাবৎ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু পাণ্ডুলিপিটি চারপাশে গোপনে ছড়িয়ে যাওয়ার সুবাদে জনসাধারণে সুপরিচিত হয়ে যায়। এই নাটকটি লেখার জন্য অস্ত্রোভস্কির অসামরিক সরকারি চাকরিটি চলে যায়। অস্ত্রোভস্কির অন্যান্য নাটক : 'পোভার্টি ইন নো ডিসট্রেস' (১৮৫৩), 'স্টর্ম' (১৮৬৯), 'দ্য স্কাউন্ড্রেল' (১৮৬৮), 'অ্যান আরডেন্ট হার্ট' (১৮৬৯), 'দ্য ফরেস্ট' (১৮৭১), 'দ্য কমেডিয়ান অব দ্য সেভেনটিনথ সেঞ্চুরি' (১৮৭২) ও 'দ্য স্নো মেইডেন' (১৮৮২)। ঐতিহাসিক ও রূপকথাসমৃদ্ধ তাঁর শেষের নাটকটি বহু ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ১৯৪৪-এ অস্ত্রোভস্কির কিছু নাটক ডেভিড ম্যাগারস্যাক ইংরাজিতে অনুবাদ করেন, যেমন, 'ইভন আ ওয়াইজ ম্যান স্ট্যাম্বলস' (পরে এটির নাম হয় 'এনাফ স্টুপিডিটি ইন এভরি ওয়াইজ ম্যান'), 'ইজি মানি' (শেক্সপীয়রের 'টেমিং অব দ্য শ্রু' অবলম্বনে রচিত) এবং 'উলভস অ্যান্ড শিপ'। অস্ত্রোভস্কির যে নাটকটি ইংরাজিতে সবচেয়ে বেশি পরিচিত তা হল 'স্টর্ম'। এই নাটকটি ১৯০০, ১৯১৯ ও ১৯৬২-তে নিউ ইয়র্কে পুনঃপ্রকাশিত হয় এবং ১৯২৯-এ লন্ডনে ও ১৯৬৬-তে ওল্ড ভিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। অস্ত্রোভস্কির বেশিরভাগ নাটকই প্রযোজিত হয়েছিল মস্কোর মালি থিয়েটারে। ১৮৮৫-তে সোসাইটি অব রাশিয়ান প্লেরাইট প্রতিষ্ঠার পর তিনি মস্কো ইম্পিরিয়াল থিয়েটারের পরিচালক নির্বাচিত হন।

বিকেনারের নাটক 'দাঁতঁ'স ডেথ' (১৮৩৫) ও 'উওইজেক' (১৮৩৬), হেবেলের 'মারিয়া মডলেনা' (১৮৪৪)। 'দাঁতঁ'স ডেথ' নাটকটি ১৯০৩-এ বার্লিনে অভিনীত হয়। কিন্তু এক বছর পর এই নাটকে সমসাময়িক রাজনীতিতে অসন্তোষ প্রকাশ করায় ও বৈপ্লবিক মত প্রচার করায় বিকেনারকে জার্মানি থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু ১৯২৭-এ বার্লিনে নাটকটি পুনরুজ্জীবিত হয়, ১৯৩৯-এ নিউ ইয়র্কের মার্কারি থিয়েটারে এবং ১৯৭১-এ লন্ডনে অভিনীত হয়। লন্ডনে ক্রিস্টোফার-প্লামার দাঁতঁ-র চরিত্র অভিনয় করে প্রশংসিত হন।

হাউপ্টমানের রিয়ালিস্টিক নাটক : 'বিফোর ডন' (১৮৮৯), 'দ্য উইভার্স' (১৮৯২), 'রোজ বার্নড' (১৮৯৩), 'লোনলি লাইভস' (১৮৯৬), 'মাইকেল ক্র্যামার' (১৯২৪), 'দ্য বীভর কোট' (১৯২৮), 'পিরিয়ড অব অ্যাডজাস্টমেন্ট' (১৯৬০), 'দ্য নাইট অব ইগুয়ানা' (১৯৬১), 'দ্য মিল্ক ট্রেন ডাজ নট স্টপ হিয়ার এনি মোর' (১৯৬২)। ১৯১২-তে হাউপ্টমান নোবেল পুরস্কার পান। তাঁর

একাধিক নাটক বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

ওয়েদকাঁদের চারটি নাটক : 'দ্য ওয়ার্ল্ড অব ইয়ুথ' (১৮৯৯), 'দ্য টেনর' (১৮৯৯), 'স্প্রিং অ্যাওকেনিং' (১৯০১) ও 'লুলু' (১৯৭০)।

বালজাকের তিনটি নাটক : 'দ্য স্টেপমাদার' (১৮৪৮), 'মারকাডেট' (১৮৫১) ও 'দ্য জবার' (১৮৫১)।

রবার্টসনের 'ডেভিড গ্যারিক' (১৮৬৪) নাটকটি একটি ফরাসি নাটকের ওপর ভিত্তি করে রচিত। তাঁর অন্যান্য নাটক : 'সোসাইটি' (১৮৬৫), 'আওয়ারস' (১৮৬৬), 'কাস্ট' (১৮৬৭) ও 'প্লে' (১৮৬৮)।

বার্নাড শ অনেক উচ্চাঙ্গের রিয়ালিস্টিক নাটক লিখেছেন। যেমন, 'মিসেস ওয়ারেন'স প্রফেশন' (১৮৯৩), 'আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান' (১৮৯৪), 'ক্যানডিডা' (১৮৯৪), 'দ্য ডেভিলস ডিসপল' (১৮৯৭), 'সিজার অ্যান্ড ক্লিয়োপেট্রা' (১৮৯৯) 'জন বুলস অদার আয়ল্যান্ড' (১৯০৪), 'মেজর বারবারা' (১৯০৫), 'ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান' (১৯০৫), 'দ্য ডক্টর'স ডায়লেমা' (১৯০৬), 'অ্যান্দোক্লেস অ্যান্ড দ্য লায়ন' (১৯৩৩), 'পিগম্যালিয়ন' (১৯১৩), পরে এই নাটকটির নাম হয় 'মাই ফেয়ার লেডি' (১৯২৯), 'সেন্ট জোয়ান' (১৯২৪), 'ব্যাক টু ম্যাথুসেলা' (১৯২১), 'দ্য অ্যাপল কার্ট' (১৯২৯)। ১৯২৫-এ বার্নাড শ নোবেল পুরস্কার পান।

সমারসেট মমের নাটক : 'আ ম্যান অব অনার' (১৯০৪), 'লেডি ফ্রেডরিক' (১৯০৮), 'জ্যাক স্ট্র' (১৯০৮), 'মিসেস ডট' (১৯০৮), 'দ্য এক্সপ্লোরার (১৯০৮), 'দ্য সার্কল' (১৯২১), 'ক্যারোলিন' (১৯১৬), 'সিজার'স ওয়াইফ' (১৯১৯), 'হোম অ্যান্ড বিউটি' (১৯১৯), 'ইস্ট অব সুয়েজ' (১৯২২), 'আওয়ার বেটারস' (১৯২৩), 'দ্য কনস্ট্যান্ট ওয়াইফ' (১৯২৭), 'দ্য সেকেন্ড ফ্রেম' (১৯২৮), 'দ্য বেডউইনার' (১৯৩০), 'মারভিসেস রেনডারড' (১৯৩২)।

গলসওয়ার্দির নাটক : 'দ্য সিলভার বক্স' (১৯০৬), 'স্ট্রাইফ' (১৯০৯), 'জাস্টিস' (১৯১০), 'দ্য স্কিন গেমস' (১৯২০), 'লয়ালিটিজ' (১৯২২), 'ওল্ড ইংলিশ' (১৯২৪) ও 'দ্য রুফ'। গলসওয়ার্দি ১৯২৯-এ ও-এম ও ১৯৩২-এ নোবেল পুরস্কার পান।

বেলাস্কোর নাটক : 'দ্য গার্ল আই লেফট বিহাইন্ড মি' (১৮৯৩), 'দ্য হার্ট অব মেরিল্যান্ড' (১৮৯৫), 'ম্যাডাম বাটারফ্লাই' (১৯০০), 'দ্য গার্ল অব দ্য গোল্ডেন ওয়েস্ট' (১৯০৫) ও 'দ্য অকেশনার' (১৯০১)।

১৯৪৫ থেকে ১৯৬০— এই পনেরো বছর আমেরিকার সর্বজনপ্রিয় নাট্যকার ছিলেন টেনেসি উইলিয়ামস। তিনি 'আমেরিকান ব্লুজ' (১৯৩৯)

শিরোনামে চারটি একাঙ্ক নাটকের সংকলনের জন্য থিয়েটার গিল্ড পুরস্কার, 'দ্য গ্লাস মিনাজারি'-র (১৯৪৫) জন্য নিউ ইয়র্ক ড্রামা ক্রিটিক সার্কল পুরস্কার, 'আ স্ট্রিট কার নেমড ডিজায়ার' (১৯৪৭) ও 'ক্যাট অন আ হট টিন রুফ' (১৯৫০) নাটকের জন্য পুলিৎজার পুরস্কার পান। তিনি 'সামার অ্যান্ড স্মোক' (১৯৪৮) 'ইউ টাচড মি' (১৯৫৪), 'দ্য রোজ টাট্টু' (১৯৫১) ও 'ক্যামিনো রিয়াল' (১৯৫৩) নাটক চারটিও রচনা করেন।

১৯৩৭-এ মানার্স অব সেন্ট লুইস-এ তাঁর 'ক্যান্ডেলস টু দ্য সান' ও 'ফিউগিটিভ কাইন্ড' নাটক দুটি মঞ্চস্থ হয়। মেমফিস-এ অভিনীত হয় তাঁর প্রথম নাটক 'কায়রো, সাংহাই, বোম্বে'। ১৯৪৪-এ শিকাগো শহরে 'দ্য গ্লাস মেনেজারি' নাটকটি অভিনীত হওয়ার সঙ্গো সঙ্গো এতটাই সাড়া জাগায় যে, নাটকটি ব্রডওয়েতে অভিনীত হয়। এরপর ব্রডওয়েতে পরপর তাঁর নাটকগুলি অভিনীত হতে থাকে। ১৯৫০-এ 'দ্য গ্লাস মেনেজারি' ও ১৯৫১-তে 'আ স্ট্রিট কার নেমড ডিজায়ার' চলচ্চিত্রে রূপায়িত হলে বিশ্বজুড়ে তাঁর দর্শক তৈরি হয়। এই সময় তিনি খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছন। তাঁর 'আ স্ট্রিট কার নেমড ডিজায়ার' নাটকে অভিনয় করেই মার্লো ব্রান্ডো 'তারকা' বনে যান।

রিয়ালিস্টিক নাটকের অন্যতম রূপকার আর্থার মিলারের নাটক : 'অল মাই সন্স' (১৯৪৭), 'দ্য ক্রুসিব্‌ল' (১৯৫৩), 'আফটার দ্য ফল' (১৯৬৪), 'ইনসিডেন্ট অ্যাট ভিশি' (১৯৬৬), 'দ্য প্রাইস' (১৯৬৯), 'ডেথ অব আ সেলসম্যান' (১৯৪৯), 'আ ভিউ ফ্রম দ্য ব্রিজ' (১৯৫৫), 'আ মেমারি অব টু মানডেজ' (১৯৫৫) ও 'ফিনিশিং দ্য পিকচার' (১৯৭২)। মিলার 'অল মাই সন্স'-এর জন্য নিউ ইয়র্ক ড্রামা ক্রিটিক সার্কল ও 'ডেথ অব আ সেলসম্যান'-এর জন্য মাত্র ৩৪ বছর বয়সে পুলিৎজার পুরস্কার পান।

তাঁর 'আ ভিউ ফ্রম দ্য ব্রিজ' নাটকটির অভিনয় লর্ড চেম্বারলিন নিষিদ্ধ করে দেন। কিন্তু ১৯৫৩-তে নিউ ওয়াটারগেট থিয়েটার ক্লাব গোপনে নাটকটি মঞ্চস্থ করে কমেডি থিয়েটারে। মিলার পরে নাটকটি তিন অঙ্কে বিস্তৃত করেন। 'দ্য প্রাইস'-এর প্রথম অভিনয় হয় লন্ডনে, ১৯৬৯-এ। পরিচালনা আর্থার মিলারের। 'ডেথ অব আ সেলসম্যান' ব্রডওয়ের ৫০টি দীর্ঘতম নাট্য-প্রযোজনার একটি। নাটকটি ১৯৪৯-এ শুরু হয়ে ৭৪২ বার অভিনীত হয়। নাটকটির দুটি চলচ্চিত্রও তৈরি হয়। প্রথমটি ১৯৬১-তে। পরিচালক এ. বেনেডেক। চিত্রনাট্য সেন্ট রবার্ট। দ্বিতীয়টি ১৯৮৫-তে। পরিচালক ফোলকার শ্লোয়েনডর্ফ। মিলার দ্বিতীয় ছবিটির তারিফ করেছেন। বিখ্যাত নাট্য-পরিচালক ইলিয়া কাজান তাঁর 'দ্য ক্রুসিব্‌ল' নাটকটিকে আমূল ভেঙেচুরে নব নাট্যরূপ দিয়ে প্রযোজনা করেন। জাঁ পল সার্ত্রও

নাটকটির একটি নতুন ভাষ্য ও চিত্রনাট্য (১৯৫৭) গড়েন। মিলারের কোনওটিই পছন্দ হয়নি। ইলিয়া কাজানের শিল্পিত নব সৃষ্টিকে তিনি যথেষ্ট নাট্যিক বলে মনে করেননি। সার্ত্রের চিত্রনাট্যকে তিনি কমিউনিজমের প্রচার বলেছেন। মিলার নিজে নিকোলাস হাইটনার পরিচালিত (১৯৯৬) 'দ্য ক্রুসিব্‌ল' ছবির চিত্রনাট্য তৈরি করেন।

মিলারের 'ফিনিশিং দ্য পিচার' নাটকটি শিকাগোতে প্রথম অভিনীত হয়। নাটকের কাহিনি : খামখেয়ালি এক নায়িকার দৌলতে কীভাবে এক পরিচালক তাঁর ছবি শেষ করতে পারছেন না। আর কে সেই নায়িকা, সকলেরই জানা। হলিউডের এই 'গ্ল্যামার গার্ল' মেরিলিন মনরোর সঙ্গেই একদা গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন মিলার (মেরিলিন মিলারের দ্বিতীয় স্ত্রী)। লেখক নর্মান মেইলার বলেছিলেন, 'শ্রেষ্ঠ মার্কিন বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে শ্রেষ্ঠ মার্কিন সৌন্দর্যের রাজযোটক।' কালক্রমে সে বিয়ে টেঁকেনি। বিবাহবিচ্ছেদ এবং তারপর এক রাতে মেরিলিনের রহস্যময় মৃত্যু। মনরোর শেষ ছবি 'মিসফিটস'-এর চিত্রনাট্যকার আর্থার মিলার।

বিশ শতকের পাঁচের দশকে আমেবিকার সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী সেনেটর ম্যাকার্থি ভাবতেন, যেসব লেখক বুদ্ধিজীবী জনগণের জন্য ভাবিত, লেখায়-কথায় সামাজিক, তাঁরা নির্ঘাত কমিউনিস্ট। ম্যাকার্থির প্ররোচনাতেই ১৯৫৬-তে অন্যান্য বিখ্যাত বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে মিলারকেও 'হাউস কমিটি অন আন-আমেরিকান অ্যাকটিভিটিজ'-এর সামনে কমিউনিস্টদের বন্ধু হিসেবে জেরা করা হয়। তিনি তাঁর ১০ বছর আগের বামপন্থী বন্ধুদের নাম প্রকাশ করতে অস্বীকার করেন। তাঁকে বিচারের জন্য আদালতে পাঠানো হয়। সেখানে তিনি বেকসুর খালাস পান।

মার্কিন সরকারের প্রোপাগান্ডা (তথ্য) বিভাগ 'ডেথ অব আ সেলসম্যান' নাটকটির বহু সংলাপ ও দৃশ্য বাদ দিয়ে, অনেক কিছু অবাঞ্ছিত বিষয় যোগ করে নাট্যকারকে না জানিয়েই একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিল। ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রী মার্কিন দেশে একজন সেলসম্যান কত সুখী, এই ধরনের চিত্রনাট্য ছিল। মূল নাটকের মতো সেলসম্যানের কোনও প্রতীকী মৃত্যুও হয় না, বরং খুশিতে জীবন ভরপুর। এই প্রচারকেই ছবিতে প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা ছিল। ছবিটি পৃথিবীর নানা দেশে দেখানোর জন্যই মূলত নির্মাণ করা হয়েছিল। ধনতান্ত্রিক সমাজ সম্পর্কে কমিউনিস্টরা যে চিত্র জনমানসে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তার বিপরীত ভাষ্য রচনার উদ্দেশ্য ছিল ম্যাকার্থির। জানতে পেরে মিলার উকিলের নোটিস পাঠান। তথ্য বিভাগ ছবিটি বাতিল করে দেয়।

তবে মজার ব্যাপার হল, স্বভূমিতে 'কমিউনিস্ট' বলে চিহ্নিত হলেও মিলার

আবার কমিউনিস্ট দেশে 'আমেরিকান' বলে আক্রমণের লক্ষ্য ছিলেন। কট্টর মার্ক্সবাদীরা তাঁর নাটকে সমাজ-বাস্তবতার লক্ষণ না পেয়ে হতাশ হয়েছেন। মিলারকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'আপনি কি কমিউনিজমে আস্থাশীল?' তিনি বলেন, 'না, তবে একথা ঠিক যে সমাজতন্ত্রের কয়েকটি ভালো দিক তো আছেই। খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচানোর নিরাপত্তা ধনতন্ত্রী দেশের চেয়ে ভালো। কিন্তু স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায়? রাষ্ট্র আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছে চালিত করবে, হয় না তা।'

সোভিয়েত ইউনিয়নে ইগরে মোরাথের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে 'ইন রাশিয়া'র প্রস্তুতিপর্বের সময় একজন লেখক বেমক্কা একটা প্রশ্ন করে বসলেন আর্থার মিলারকে : 'তুমি কি মার্ক্সিস্ট?' আর্থার বললেন, 'মার্ক্সিস্ট কাকে বলে?' লেখকটি বললেন, 'কাকে আবার? মার্ক্সিস্ট মানে মার্ক্সিস্ট।' আর্থার বললেন, 'আপনি বলতে চান, চীনের একজন মার্ক্সিস্ট আর সোভিয়েত ইউনিয়নের একজন মার্ক্সিস্ট এক? দু'দেশের সীমান্তে একে অপরের দিকে বন্দুক বাগিয়ে আছে। দু'দেশের ওই কোটি কোটি মানুষ এবং দু'পক্ষই লাঠির ডগায় কার্ল মার্ক্সের ছবি এঁটে খুনোখুনি করছে। একজন চাইনিজ মার্ক্সিস্ট সীমান্তে দাঁড়িয়ে একজন ভিয়েতনামের মার্ক্সিস্টের সঙ্গে লড়াই করছে, কিংবা ভিয়েতনামের মার্ক্স-ভক্তরা কাম্বোডিয়ার গুরুভাইদের মেরেই ফেলে দিচ্ছে, অথবা কাম্বোডিয়ার পল পটপন্থীরা কাম্বোডিয়ার ভিয়েতনামি সমর্থকদের মারছে। ইজরায়েল আর সিরিয়ার কথা তো ছেড়েই দিলাম।'

২০০৫-এর ১০ ফেব্রুয়ারি দুনিয়া কাঁপানো নাট্যকার মিলারের মৃত্যুর দিন শোকজ্ঞাপনের জন্য রাত ৮টায় নিষ্প্রদীপ করে দেওয়া হয় নিউ ইয়র্কের নাটকপাড়া 'ব্রডওয়ে'।

রিয়ালিস্টিক নাটকের আর এক পথিকৃৎ নাট্যকার হলেন হেনরিক ইবসেন। তাঁর নাটক : 'দ্য পিলারস অব দ্য সোসাইটি' (১৮৭৭), 'আ ডল'স হাউস' (১৮৭৯), 'গোস্টস' (১৮৮১), 'অ্যান এনিমি অব দ্য পিপল' (১৮৮২), 'দ্য ওয়াইল্ড ডাক' (১৮৮৪), 'দ্য লেডি ফ্রম দ্য সী' (১৮৮৮), 'হেড্ডা গ্যাবলার' (১৮৯০), 'দ্য মাস্টার বিল্ডার' (১৮৯২), 'হোয়েন উই ডেড অ্যাওয়েকেন' (১৮৯৯)। ১৮৮৯-এ 'আ ডল'স হাউস' প্রথম লন্ডনে অভিনীত হয়। ১৮৯০ সালে মিউনিখে ও ১৮৯১ সালে লন্ডনের ভ্যাডোভেলি থিয়েটারে তাঁর 'হেড্ডা গ্যাবলার' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। বিখ্যাত ইতালিয়ান অভিনেত্রী এলিনোরা ডিউজ ও ইংরাজ অভিনেত্রী এলিজাবেথ রবিনস এই নাটকের নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করেন। ইবসেনের নাটকগুলি ইউরোপের বারোটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

এখনও পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে তাঁর নাটক অভিনীত হয়।

ইবসেনের শেষ নাটক 'হোয়েন উই ডেড অ্যাওয়েকেন'। নাটকটির উপ-শিরোনামে আছে একটি নাটকীয় 'এপিলোগ'। ১৮৯৯-এ নাটকটি বিরাট সাফল্যের সঙ্গে প্রথমে অসলোতে, তিন বছর পরে লন্ডনে এবং ১৯০৫-এ নিউ ইয়র্কে অভিনীত হয়। ১৮ বছরের প্রখ্যাত লেখক জেমস জয়েস 'ফোর্টনাইটলি রিভিউ' পত্রিকায় নাটকটির উচ্চ প্রশংসা করেন। নাটকটির কেন্দ্রীয় চরিত্রে আছে রুবেক নামে এক ভাস্কর। শৈল্পিক সৃজনশীলতা ও সত্যের মধ্যে সম্পর্কই নাটকের বিষয়বস্তু।

পিরানদেল্লোর মতে, শেক্সপীয়রের পরেই আধুনিক নাটকে ইবসেনের স্থান। তফাত হল, শেক্সপীয়রের নায়করা মৃত্যুবরণ করেছে। ইবসেনের কেন্দ্রীয় চরিত্ররা মৃত্যুবরণ না করে যন্ত্রণা ভোগ করেছে। শেক্সপীয়রের নাটকে স্বগতোক্তি আছে। ইবসেন স্বগতোক্তি ব্যবহার ত্যাগ করেছেন। শেক্সপীয়রের নাটকে আছে অনেক দৃশ্যের সংলাপ। ইবসেন একটিমাত্র দৃশ্যপটের প্রবর্তন করেছেন।

দারিদ্র্য ও সংগ্রাম ইবসেনকে বাস্তবমুখী করেছিল। সেই সঙ্গে ফরাসি বিপ্লবের চিন্তাধারা থেকে আগত উদ্দীপনা ও দ্বন্দ্ব তাঁকে উদ্দীপিত করেছিল। নিজে কিছুদিন সোস্যালিস্ট পার্টির নেতা থাকলেও রাজনীতির কাছে তিনি আত্মবিক্রয় করেননি।

॥ ২॥

রিয়ালিস্টিক নাট্যরচনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন ইবসেন। তাঁকে উনিশ শতকের ট্রাজেডি রচনায় নব্যধারার পথিকৃৎ বলা হয়। বার্নাড শ বলেছেন, 'সারা ইউরোপ ইবসেনিয়াসে আবিষ্ট হয়ে গেছে।' তাঁর প্রত্যেকটি নাটকের বিষয়বস্তু সমাজ-সংকট থেকে উদ্ভূত। তিনি দুর্নীতি, ভণ্ডামি, ভ্রান্ত ধারণা, পুরুষশাসিত সমাজের সংকীর্ণতা, ব্যভিচার ইত্যাদি যেসব সমস্যার কথা নাটকে আলোকপাত করে গেছেন, তা আজও দূর হয়নি। এইখানেই ইবসেনের নাটক কালের গণ্ডি অতিক্রম করে গেছে।

নাট্যরচনাতেও কয়েকটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছেন ইবসেন। তিনি নাটকে পঞ্চাঙ্করীতি, নেপথ্য ভাষণ, স্বাগত ভাষণ ইত্যাদি প্রচলিত প্রথার বিলোপসাধন করেছেন। ঘটনার পরিবর্তে 'আলোচনা'কেই নাট্যসংঘাতের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছেন। তিনিই প্রথম রোমান্টিক চরিত্রের পরিবর্তে স্বামী-স্ত্রী, ভাই-ভাই, মা-ছেলে প্রভৃতি সাধারণ মানুষের গল্প বলেছেন। তিনি একেবারে অন্দর মহলের মূল ধরে টান দিয়েছেন। তাঁর বেশ কিছু নাটকের ঘটনা আবর্তিত হয়েছে গার্হস্থ্য

জীবনের অন্দর মহলে। রোমান্টিক ধারা বর্জন করে গার্হস্থ্য-সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যামূলক বাস্তবজীবনের জটিলতাকে নাটকে বিবৃতি করেছেন বলে তাঁর নাটককে 'থিসিস প্লে' বা 'প্রবলেম প্লে' নামে অভিহিত করা হয়।

ইবসেনের নাটকের ভাষা সর্বজনবোধ্য, স্বাভাবিক, বাস্তবানুসারী ও হৃদয়গ্রাহী। এ ভাষাতে সাধারণ মানুষ কথা বলে। এর মধ্যে কৃত্রিমতা নেই। আরোপিত কাব্যছন্দ নেই। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি বাস্তবানুগ। কোনওটিই রঞ্জিত কল্পিত চরিত্র নয়। তারা অতি সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষের মতোই তারা কথা বলে, কাঁদে, হাসে, লড়াই করে।

ইবসেনের দৃশ্যরচনার ক্ষেত্রেও বাস্তবধর্মীতারই প্রতিফলন ঘটেছে। যেমন তাঁর 'ওয়াইল্ড ডাক' নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য। পর্দা উঠলে দেখা যায় ব্যবসায়ী ওয়ারলির পড়ার ঘর। দামি বুককেস, বই, পর্দা ও গদি দিয়ে সুসজ্জিত। ঘরের ঠিক মাঝখানে নানা কাগজপত্র সমেত একটি পড়ার টেবিল। সবুজ রঙের শেড দেওয়া বাতির আলোকে ঘরটি মৃদুভাবে আলোকিত। পিছনের দরজার পর্দাটি গুটিয়ে ওপরে তোলা। তার ফাঁক দিয়ে ভিতরের উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত বড় ঘরটি দেখা যাচ্ছে। ডানদিকে আর একটি দরজা দিয়ে ওয়ারলির অফিস ঘরে যাওয়া যায়। ঘরের বাঁদিকে একটি ফায়াব প্লেসে আগুন জ্বলছে। ফায়ার প্লেসের পিছনেই খাবার ঘরে যাওয়ার আর একটি দরজা রয়েছে। চারজন পরিচারক ঘরটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সাজিয়ে-গুছিয়ে তুলছে। খাবার ঘরের ভিতর থেকে কথাবার্তা ও হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে।

ইবসেনের 'ডল'স হাউস' নাটকের নায়িকা নোরা নারীমুক্তি আন্দোলনের মূর্ত প্রতীক। পুরুষশাসিত সমাজের অবিচারের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। সমাজে নারীর অধিকারকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। নাটকের এক জায়গায় স্বামী হেলমারকে নোরা বলছে : 'আমাদের এ ঘর একটা খেলাঘর ছাড়া কিছুই না। এখানে পুতুলের মতো আমি তোমার খেলনা স্ত্রী, যেমন বাড়িতে ছিলাম বাবার খেলনা সন্তান। আর আমার সন্তানরা এখন আমার খেলনা।' এই নাটকের শেষাংশে নোরা হেলমারকে বলছে :

নোরা (পোশাক পালটে আসে) আমি সব ছেড়ে এসেছি।

হেলমার কেন ছেড়ে এলে—

নোরা কারণ আমি তোমার সঙ্গো আর থাকতে পারছি না।

হেলমার নোরা! তুমি কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ। আমি তোমাকে বারণ করছি—

নোরা তোমার বারণের আর প্রয়োজন নেই।

হেলমার তুমি কী আর আমাকে ভালোবাস না?

নোরা　না।

হেলমার　তুমি কিন্তু তাই বলতে!

নোরা　আর বলব না।

হেলমার　বুঝেছি, আমি বুঝেছি— এক নরক নেমে এসেছে আমাদের মাঝখানে। এই ফাঁক কি আর ভরাট করা যায় না নোরা?

নোরা　না। (ক্লোক, টুপি ও ছোট ব্যাগ তুলে নেয়) আমি তোমার স্ত্রী নই।

হেলমার　নোরা, এখনই যেও না। অন্তত কাল পর্যন্ত—

নোরা　একজন আগন্তুকের ঘরে একটা রাতও আমি থাকতে পারি না।

হেলমার　সব শেষ? তুমি কী আমার কথা ভাববে না?

নোরা　ভাবব। তুমি, আমার সন্তান আর এই সংসারের কথা মাঝে মাঝেই মনে পড়বে আমার। বিদায় (নোড়ার প্রস্থান)

ইবসেনের 'অ্যান এনিমি অব দ্য পিপল'-এর গল্পটিও হল : একটি ছোট শহরের ব্যবসায়ীদের আয়ের উৎস একটি মনোরম স্নানাগার। নাটকের নায়ক ড. স্টকম্যান এই স্নানাগারের জল পরীক্ষা করে প্রমাণ পান যে, এর মধ্যে প্রচুর রোগজীবাণু রয়েছে। তিনি স্থানীয় সংবাদপত্রে বিষয়টি ছাপিয়ে দেন। এতে সমাজের স্বার্থান্বেষী মানুষেরা তাঁর প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং তাঁকে নানাভাবে অপদস্থ করতে থাকে। এদের প্ররোচনায় শহরের প্রায় সব লোক ডাক্তারের শত্রু হয়ে ওঠে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় অসাধু ব্যবসায়ীদের ষড়যন্ত্র ও পেশাদার সংবাদপত্র সম্পাদকের অর্থের বিনিময়ে আত্মবিক্রয়। গৃহহীন, কর্মচ্যুত হয়েও স্টকম্যান অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সংকল্প ত্যাগ করেন না। এই পৃথিবীতে তিনিই সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ, যিনি একা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারেন'— স্টকম্যানের এই উক্তি দিয়ে নাটকের সমাপ্তি। এই নাটকটি পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত ও অভিনীত হয়েছে।

ইবসেনের 'গোস্টস' নাটকটির কাহিনি হল, মদ্যপ ও চরিত্রহীন স্বামী, স্বামীর অবৈধ কন্যা, নিজপুত্র, স্বামীর মৃত্যুর পর তার স্মৃতিরক্ষা— সব কর্তব্য ও দায়িত্ব নীরবে পালন করেও স্ত্রীর জীবনে নেমে আসে শূন্যতা। স্বামীর কৃতকর্মের ফলভোগ করতে হয় তাকে। পুত্র অসওয়াল্ড তার পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যৌনব্যাধি লাভ করে। নাটকের শেষ দৃশ্যটির কথা স্মরণ করলেই আমরা শিউরে উঠি :

অসওয়াল্ড　মা আমাকে সূর্য এনে দাও।

আলভিং　কী, কী বলছ তুমি, অসওয়াল্ড?

অসওয়াল্ড　(বিবশ কণ্ঠে) সূর্য— সূর্য।

আলভিং অসওয়াল্ড, কী হল তোমার? (অসওয়াল্ড কুঁকড়ে যাচ্ছে। এলিয়ে পড়ছে। ভাবলেশহীন মুখ। শূন্য দৃষ্টি) একি? (কেঁদে ওঠে) অসওয়াল্ড! তোমার কী হল— কী হল? (অসওয়াল্ডকে ঝাঁকুনি দেয়) অসওয়াল্ড। অসওয়াল্ড। চেয়ে দেখো— আমার দিকে চেয়ে দেখো। আমায় চিনতে পারছ না?

অসওয়াল্ড (অবসন্ন কণ্ঠে) সূর্য— সূর্য।

আলভিং (দু'হাতে চুল ছিঁড়তে থাকে। কাঁদতে থাকে) আমি এ সহ্য করতে পারছি না। (বিড়বিড় করে— ভয়ে স্থানু হয়ে যায়) এ আমি সহ্য করতে পারছি না— কিছুতেই না। (হঠাৎ) কোথায় রাখল ওষুধের কৌটোটা? (দ্রুত অসওয়াল্ডের বুক পকেট হাতড়াতে থাকে) এই যে পেয়েছি (কয়েক পা পিছিয়ে কেঁদে ওঠে) না-না-না। হ্যাঁ— না-না। (কয়েক পা দূরে সরে গিয়ে ছেলের দিকে বাকহীন আতঙ্কে চেয়ে থাকে)

অসওয়াল্ড (সম্পূর্ণ চলৎশক্তিহীন) সূর্য— সূর্য—

ইবসেনের 'দ্য পিলারস অব দ্য সোসাইটি' নাটকটি ভণ্ডামির একটি কদর্য দলিল। এই নাটকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মিথ্যা সম্ভ্রমবোধের প্রতি ইবসেনের ঘৃণা সুতীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। এই নাটকে তিনি কুৎসিত ব্যবসায়ী, মিথ্যাবাদী, মেদবহুল ধর্মোপদেশ প্রদানকারী ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের অজস্র চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। এই নাটকটি ইবসেনের প্রথম গদ্যে লেখা সামাজিক নাটক। ১৮৭৭ সালে প্রথম কোপেনহেগেনে অভিনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জার্মানিতে ইবসেনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রথম প্রকাশনার পর নাটকটি বার্লিনে পাঁচটি নাট্যসংস্থা পাঁচ মাসের মধ্যে মঞ্চস্থ করে। নাটকটি লন্ডনে অভিনীত হওয়ার জন্য উইলিয়াম আর্চার 'কুইকস্যান্ডস' নামে ইংরাজিতে অনুবাদ করেন। পরে ১৮৮০-তে গেইটি থিয়েটারে 'দ্য পিলারস অব দ্য সোসাইটি' নামেই অভিনীত হয়।

ইবসেনের ভাবশিষ্য জর্জ বার্নাড শ বললেন, 'সস্তা ও হালকা নাচগানের জন্য থিয়েটার নয়। থিয়েটার হবে শিক্ষিত ও মার্জিত-রুচি দর্শকের জন্য।' তিনি তীক্ষ্ণ যুক্তি, শানিত ব্যঙ্গ ও বক্র কটাক্ষের কড়া চাবুক হাতে নিয়ে নাট্যজগতে প্রবেশ করলেন। প্রচলিত বিবাহপ্রথা, গণিকাবৃত্তি, বিধ্বংসী যুদ্ধ, অনৈতিকতা, সামাজিক বৈষম্য, কুসংস্কার, অসদুপায়ে অর্জিত ধন উপভোগ প্রভৃতির বিরুদ্ধে তাঁর নাটকে অবিরাম প্রচারকার্য চালিয়ে গেলেন। সমস্যার উত্থাপন ও তার আলোচনাই ছিল তাঁর নাট্যরচনার বৈশিষ্ট্য। তিনি তাঁর প্রত্যেকটি নাটকে দীর্ঘ

ভূমিকা লিখেছেন।

বার্নাড শ তাঁর 'মিসেস ওয়ারেন'স প্রফেশন' নাটকে লিখলেন, 'গণিকাবৃত্তি হল ধনতান্ত্রিক সমাজের অন্যতম পাপ। এর জন্য সমগ্র সমাজই দায়ী।' 'আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান' নাটকে তিনি বললেন, 'যুদ্ধ ভয়ঙ্কর জিনিস। তার মধ্যে আদর্শ, মহত্ত্ব ও বীরত্বের সন্ধান করা মানবচরিত্রের নিদারুণ মূঢ়তাকেই প্রকট করে।' তাঁর 'ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান' নাটকে 'লাইফ ফোর্স' মতবাদ প্রতিষ্ঠিত। 'লাইফ ফোর্স' এমন এক বিশেষ শক্তি যা মানুষকে উন্নততর ও পরিপূর্ণ জীবন অভিমুখে নিয়ে যায়। এরই প্রেরণায় নারী উচ্চতর জাতি সৃষ্টির জন্য অসাধারণ পুরুষকে আকর্ষণ করে।

শ-এর 'পিগম্যালিয়ন' নাটকে ধ্বনিতত্ত্বের অধ্যাপক হেনরি হিগিনস তার বন্ধু কর্নেল পিকারিং-এর সঙ্গে বাজি ফেলে যে, সে একজন সামান্য ফুল বিক্রেতার মেয়ে এলিজা ডুলিটলকে ৬ মাসের মধ্যে অভিজাত রমণীতে পরিণত করবে। হিগিনস এলিজাকে তার বাড়ি নিয়ে যায় ও ৬ মাস ধরে কঠোর অনুশীলন করায়। এলিজা ধীরে ধীরে অভিজাত নারীর মতোই হয়ে ওঠে। হিগিনস বাজি জেতেন। কিন্তু তার নির্মম হৃদয় ও ঔদাসীন্যে এলিজা খুশি হয় না। সে হিগিনসকে ছেড়ে চলে যায়।

শ-এর 'সেন্ট জোয়ান' নাটকে সামাজিক বিধান ও প্রতিভা— এই দুই প্রতিকূল শক্তির দ্বন্দ্ব আছে। কাহিনিটি এইরূপ : ফ্রান্সের তখন খুব দুর্দিন। দেশটা ইংরাজদের হাতে। সর্বত্র অরাজকতা। এই সময়ে এক প্রতিভাময়ী, প্রাজ্ঞ, মহৎ নারী জোয়ান ফ্রান্সের রাজাকে জাগ্রত ও উদ্বুদ্ধ করে। রাজা জোয়ানকে সৈন্য চালনার ভার দেয়। জোয়ানের উপস্থিতিতে উদ্বুদ্ধ ফরাসি সেনারা ক্রমাগত বিজয় অভিযান চালায়। কিন্তু বিশপ, যাজক ও সামন্ত প্রভুরা তাকে সহ্য করতে পারে না। তার বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহের অভিযোগ আনে। শাস্তি হিসেবে জোয়ানকে অগ্নিদগ্ধ করে মারা হয়।

টেনেসি উইলিয়ামসের নাটকগুলি বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর বিতর্কিত নাটকগুলির উপপাদ্য ছিল অবদমিত যৌনতা ও পারিবারিক দ্বন্দ্ব। তিনি ব্যক্তিমানসের অন্তস্তলে আলোকপাত করেছেন। অবদমিত কাম ও তজ্জনিত সংকট, হিংসা, ঈর্ষা, উন্মত্ত অস্থিরতা ও আত্মসংগ্রামে লিপ্ত মানুষের চরিত্র অঙ্কন করেছেন। মার্টিন ব্রাউন বলেছিলেন, 'উইলিয়ামস হলেন কাব্যিক রিয়ালিস্ট, বা বলা যেতে পারে রিয়ালিস্টিক কবি। তিনি তাঁর নাটকের চরিত্রগুলিকে দেখতে পান। তিনি দৃশ্য-লেখক।'

উইলিয়ামসের 'ক্যাট অন আ হট টিন রুফ' নাটকে প্রকাশ পেয়েছে সভ্যতার

আড়ালে আদিম রিপুতাড়িত, লোভ, ঈর্ষা ও লালসায় পীড়িত মানুষের নগ্ন রূপ। 'আ স্ট্রিট কার নেমড ডিজায়ার'-এ দেখি এক ধর্ষিতা নারী, আশ্রয়হীনা, অপমানিত, হতাশার বিরুদ্ধে ক্রমাগত যুদ্ধরতা। সর্বশেষে, সে পাগল হয়ে যায়।

উইলিয়ামস তাঁর 'দ্য গ্লাস মিনাজারি' নাটকের আরম্ভেই বিস্তৃত মঞ্চনির্দেশ, এমনকি আলোকসম্পাতেরও নির্দেশ দিয়েছেন। এই নাটকটি বিফল মনোরথ এক নারী-চরিত্রের কাহিনি।

বস্তুত, উইলিয়ামসের নায়িকারা মনোবিকারের পাত্রী। তিনি এদের মনোবীক্ষণ করেছেন। পরিবেশের সঙ্গে এই নারী-চরিত্রগুলি খাপ খাওয়াতে পারছে না। বাইরের সংঘাত ও আশাভঙ্গ তাদের ভিতরে ক্রমশ বিকৃতির সৃষ্টি করছে।

নিজের বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা ও জীবন থেকেই উঠে এসেছে মিলারের নাটক। ঘাম, রক্ত ঝরানোর অভিজ্ঞতা আছে বলেই তাঁর প্রতিটি নাটক আজও এত জীবন্ত। এবং প্রতিটি দেশে। 'ডেথ অব আ সেলসম্যান'-এ মিলার এক স্বপ্নচারী মানুষের কথা বলতে চেয়েছেন। এই মানুষটি অতীতকে নিয়ে বর্তমান, বর্তমানকে নিয়ে ভবিষ্যতের রঙ্গময় কল্পনায় নিমগ্ন এবং অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের দোলাচলে প্রাণিত সৃজনীজগতে কীর্ণ, জীবনসংঘাতে জীর্ণ। চারিত্রিক বিশ্লেষণে মিলার তার ভিতরের ও বাইরের প্রেম, উদ্বেল জাগরণ ও অস্থিরতা দেখিয়েছেন। দরিদ্র সেলসম্যান উইলি লোম্যান স্বপ্ন দেখে, তার ছেলেরা জীবনে সফল হবে। কিন্তু তা হয় না। উইলি আত্মহত্যা করে। অনেকের মতে, এটিই মিলারের শ্রেষ্ঠ নাটক। হতেই পারে। কেননা ১৯২৯-এ মার্কিন মুলুকে জনজীবনে যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটেছিল, যাকে বলা হয় 'দ্য গ্রেট ক্র্যাশ অব নাইনটিন টোয়েন্টি নাইন', তার তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল কিশোর আর্থারের মনে। এই নাটকটি রচিত হওয়ার ৩৫ বছর পর ১৯৮৩-তে বেজিংয়ে মঞ্চস্থ হয়।

মিলারের 'অল মাই সন্স' নাটকে কারখানার মালিক জো কেলার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় লাভজনক কন্ট্রাক্টের আশায় খুঁতওয়ালা মেশিন সরকারের কাছে বিক্রি করে। এই মেশিনের ত্রুটির জন্য কর্মরত বহু শ্রমিকের মৃত্যু হয়। ক্রমে প্রলোভন বড় হয়ে ওঠে এবং জো অসাধু পথ ধরে। জো আশা করেছিল তার এই অর্থ ও সম্পত্তি তার ছেলেরা ভোগ করবে। কিন্তু বাস্তবে ঘটল অন্য। পিতার অসাধুতার কথা জানতে পেরে এক ছেলে আত্মহত্যা করল। অন্য ছেলে পিতাকে পুলিসের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য তৈরি হল। জানতে পেরে জো আত্মহত্যা করল।

মিলারের 'অল মাই সন্স' ও 'ডেথ অব আ সেলসম্যান'— এই দুটি নাটকই

আমেরিকার গ্রুপ থিয়েটার দলের পরিচালক এলিয়া কাজান পরিচালনা করেন। মার্লো ব্র্যান্ডো, জেসিকা ট্যানডি, কার্ল ম্যানডেন ও কিম স্ট্যানলির মতো প্রখ্যাত অভিনেতারা এই নাটক দুটিতে অভিনয় করেন।

মিলারের 'আ ভিউ ফ্রম দ্য ব্রিজ' নাটকের কাহিনি : ইতালিয়ান খালাসি এডি কারবন তাঁর স্ত্রী বিয়াট্রিসের ভাগ্নি ক্যাথারিনের প্রতি ক্রমশই আকৃষ্ট হতে থাকে। বিয়াট্রিসের দুই ভাই এসে হাজির হয়। তার মধ্যে 'মার্কো' নামের ভাইটি ক্যাথারিনের মন জয় করে ফেলে। ঈর্ষান্বিত হয়ে ও ক্যাথারিনকে হারানোর ভয়ে এডি মার্কোকে খুন করে। এই নাটকে আইনজীবী 'আলফিয়েরি' কোরাস হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৬৯২-এর ম্যাসাচুসেটসের সালেমের বহুকথিত ডাকিনীমন্ত্রের কাহিনি হলেও, কেউ কেউ এমত বলেছেন যে, বিশ শতকের পাঁচের দশকের ম্যাকার্থি-সময়কালে মার্কিন প্রশাসন ও সমাজই ছিল মিলারের 'দ্য ক্রুসিব্‌ল' লেখার মূল লক্ষ্য। ধর্মীয় পুরোহিত, সমাজকর্তা এখানে প্রশাসক। রাষ্ট্রযন্ত্র। দেশ এখানে ম্যাকার্থির ডাকিনীবিদ্যায় আবৃত, পরিচালিত।

গলসওয়ার্দির নাটকে সমাজ-সমস্যার মর্মান্তিক পরিচয় ছড়িয়ে আছে। তাঁর নাট্য-সমগ্রের মধ্যে আধুনিক সভ্যতার রথচক্রপিষ্ট মানুষের করুণ আর্তনাদ তীব্র বেদনায় ঝংকৃত হয়েছে। ব্যক্তি বিশেষের মহাপাতনের ছবি তিনি আঁকেননি। তিনি সমাজের নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার ও শোষণের ট্রাজিক কাহিনি রচনা করেছেন।

গলসওয়ার্দি 'দ্য সিলভার বক্স' নাটকে বিচার ব্যবস্থার প্রহসনের এক চিত্র এঁকেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, বর্তমান বিচার-ব্যবস্থায় একই অপরাধে অভিযুক্ত এমপি-র পুত্র মুক্তি পায়, কিন্তু কর্মহীন সোস্যালিস্ট কর্মী কারারুদ্ধ হয়। তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক 'জাস্টিস' তদানীন্তন কারা ব্যবস্থায় যে ভয়াবহ অত্যাচারের বর্ণনা করেছে, তা তদানীন্তন সমাজকে চমকিত ও ভাবিত করেছে। এই নাটকের জন্যই কারাজীবনের কঠোরতা শিথিল হয়েছিল। তাঁর 'স্ট্রাইফ' নাটকে আছে পুঁজিবাদ ও শ্রমবাদের দ্বন্দ্ব। এই নাটকে একদিকে আছে কারখানার পরিচালক জন অ্যান্টনি, কারখানায় ধর্মঘটের বিরুদ্ধে তিনি দৃঢ়, কঠোর, অনমনীয়। অন্যদিকে রয়েছে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শ্রমিক নেতা রবার্টস। নাটকের শেষে উভয়পক্ষেরই ক্ষতি হতে দেখা যায়। অ্যান্টনি ও রবার্টস উভয়ই স্বদলীয় ব্যক্তি দ্বারা পরিত্যক্ত হয়। পুরাতন শর্তেই ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়। রবার্টসের স্ত্রী অনশনে মৃত্যুবরণ করে।

শ্রমিক শ্রেণীর বঞ্চনা নিয়ে হাউপ্টমান লিখেছেন দুটি ট্রাজেডি— 'বিফোর ডন' ও 'দ্য উইভার্স'। শেষোক্ত নাটকটি তাঁতী বিদ্রোহের বিষয় নিয়ে রচিত। এতে রক্ষণশীল শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর বিদ্রোহকে রূপায়িত করা

হয়েছে। এই নাটকটি যথার্থ অর্থেই একটি 'গণ-নাটক'। এই নাটকে ব্যক্তির পরিবর্তে গণকেই মূল চরিত্ররূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। নাটকের দৃশ্য-পরিকল্পনায় বাস্তবের হুবহু অনুকরণ করা হয়েছে। কৃষকদের জীবন নিয়ে হাউপ্টমান লিখেছেন, 'রোজ বার্নড', 'লোনলি লাইভস', 'মাইকেল ক্র্যামার' ও ফ্লোবিয়ান মেয়ার'।

গোগোল তাঁর 'গভর্নমেন্ট ইন্সপেক্টর' নাটকে বাস্তবতা ও ফ্যান্টাসির মোড়কে জারতন্ত্রের অধীনে রাশিয়ার আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি ও শঠতাকে যে ব্যঙ্গ করেছেন তার প্রাসঙ্গিকতা আজও বর্তমান। তাই বহু দেশে, বহু ভাষায়, বহু রূপান্তরে, আজও এই নাটক অভিনীত হয়ে চলেছে। নাটকের কাহিনি : এক কপর্দকহীন সরকারি কেরানিকে ছদ্মবেশী ইন্সপেক্টর হিসেবে ভুল করে রাশিয়ার এক জেলা শহরের দুর্নীতিগ্রস্ত আমলারা ব্যতিব্যস্ত ও তটস্থ হয়ে ওঠে। রাজকীয় অভ্যর্থনা, ভূরিভোজ, পকেট-বোঝাই উৎকোচ, মেয়রের কন্যার সঙ্গে বিবাহের প্রতিশ্রুতির পর আসল ইন্সপেক্টর আসছে শুনে আমলারা বিপর্যস্ত ও হতভম্ব হয়ে পড়ে।

ওয়েদকাঁদ যৌন-ট্রাজেডির প্রতি বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন। তাঁর 'দ্য ওয়ার্লড অব ইয়ুথ' ও 'দ্য অ্যাওয়েকেনিং অব স্প্রিং' নাটক দুটিতে তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক অভিভাবকহীন যুবক-যুবতীদের যৌন সমস্যা ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর 'প্যান্ডোরাজ বক্স' নাটকটিতেও দুর্দমনীয় যৌন আকাঙ্ক্ষার ভয়াবহ পরিণতি রূপ পেয়েছে। তাঁর নাটকগুলি যেমন নৈতিক শিক্ষাদায়ক, তেমনই আবার বিষাদঘন ও পীড়াদায়ক।

॥ ৪ ॥

রিয়ালিজমকে নাট্যসাহিত্য থেকে নাট্যমঞ্চ ব্লটিং পেপারের মতো শুষে নিল। কৃত্রিম মঞ্চসজ্জা ও বাকসর্বস্ব অভিনয়কে পুঁজি করে 'রোমান্টিসিজম' ও 'মেলোড্রামা'র যে জোয়ার থিয়েটারকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, সেই মূলস্রোতকে একেবারে ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে বিশ্বরঙ্গালয়ে আবির্ভূত হল এই নতুন নাট্যপ্রবাহ। মঞ্চমায়া সৃষ্টি করে পরিবেশ, চরিত্র ও অভিনয়কে অবিকল বাস্তব জগতের অনুরূপ করে তুলল এই থিয়েটার। বাস্তব জীবনের যা পরিচিত, যা প্রাত্যহিক, যা স্বাভাবিক, তাকেই উদ্‌ঘাটন করল সে।

১৮৫০ সালে ইংল্যান্ডে প্রথম রিয়ালিস্টিক থিয়েটারকে প্রতিষ্ঠিত করেন ইংরাজ নাট্যকার, অভিনেতা এবং পরিচালক উইলিয়াম ববার্টসন (১৮২৯-১৮৫০) এবং ইংরাজ অভিনেতা ও ম্যানেজার স্যার ক্যুয়োর বামক্র্যাফ্‌ট (১৮৪১-১৯২৬)। রবার্টসনের প্রত্যেকটি নাটকই লন্ডনের প্রিন্স অব ওয়েলস

থিয়েটারে (পূর্বতন স্কালা থিয়েটার) অভিনীত হয়। রবার্টসনের 'সোসাইটি' নাটকটির সাফল্য শুধু নাট্যকার হিসেবে তাঁকেই প্রতিষ্ঠিত করল না, মঞ্চ-সংস্কারক হিসেবে ব্যানক্রাফটকেও অভাবিত সম্মান এনে দিল। পরিচিত অন্দর মহল, সাধারণ মানুষদের নিয়ে সমকালের গল্প, আটপৌরে সংলাপ নিয়ে বয়ন করা এই যে থিয়েটার, সেই সময় ইংল্যান্ডে এর নাম দেওয়া হয়েছিল 'দ্য কাপ অ্যান্ড সসার ড্রামা।'

রবার্টসন নিজেই তাঁর নাটক প্রযোজনা করতেন, এবং এক সময় তাঁকে প্রথম আধুনিক পরিচালক বলে গণ্য করা হত। রিয়ালিজমকে সংস্থাপিত করার জন্য তাঁর উদ্যম তাঁর সময়ে নাট্যজগতে এক গভীব ছাপ ফেলেছিল এবং পরবর্তী পর্যায়ে অনেক নাট্যকারকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। অন্যদিকে ব্যানক্রাফট ও তাঁর স্ত্রী মেরি উইলটন (১৮৩৯-১৯২১) মঞ্চের ও মঞ্চকর্মীদের সুযোগ-সুবিধার অনেক সংস্কার করেন। তাঁরা রবার্টসনের অনেক নাটকে অভিনয় করেন। মেলোড্রামার পরিবর্তে ড্রইংরুম নাটক মঞ্চস্থ করেন। ব্যানক্রাফটই প্রথম উইংস ও ড্রপস অপসারণ করে মঞ্চের ওপর আসল বস্তুর প্রতিস্থাপন করেন। আসল রুটি ও চা পরিবেশন করেন। ব্যানক্রাফটই প্রথম অভিনেতাদের উচ্চহারে মাহিনা ও এবং অভিনেত্রীদের ওয়ারড্রোব দিয়েছিলেন। স্বামী-স্ত্রীর সুমিষ্ট ব্যবহারের জন্য অভিনেতা, কলাকুশলী, এমনকি দর্শকরাও তাঁদের প্রভূত শ্রদ্ধা করতেন। ১৮৯৭ সালে ব্যানক্র্যাফট 'নাইটহুড' উপাধি পান।

১৮৭৪-এ জার্মানির বিখ্যাত নাট্যদল মেইনিনজেন কোম্পানি (১৮৭৪-১৮৯০) বাস্তবনিষ্ঠ নাট্য-প্রযোজনার মধ্য দিয়ে জার্মান মঞ্চের বৈপ্লবিক রূপান্তরের সূচনা করে এবং ইউরোপের বাস্তববাদী আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলে। এই নাট্যদলটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন নাট্যপ্রেমী, পোশাক ও দৃশ্য পরিকল্পক এবং পরিচালক স্যাক্স মেইনিনজেনের ডিউক দ্বিতীয় জর্জ (১৮২৬-১৯১৪) এবং তাঁর অভিনেত্রী স্ত্রী এলেন ফ্রাঞ্জ (১৮৩৯-১৯২৩)। তাঁরা বিপুল অর্থব্যয়ে এই নাট্যগোষ্ঠী গঠন করেন। যদিও ডিউক নিজেই নাটক পরিচালনা করতেন, তিনি তৎকালীন জার্মান প্রতিভাবান পরিচালক লুডভিগ ক্রোনেককে (১৮৩৭-১৮৯১) এই নাট্যদলের প্রশাসক নিযুক্ত করেন ১৮৮৫ সালে। লুডভিগ নিয়মানুবর্তিতায় আপসহীন কঠিন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি ডিউকের অনেক স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে সাহায্য করেছেন। তিনি গ্যাস ও বৈদ্যুতিক আলোকে নানাভাবে মঞ্চে ব্যবহার করেছেন।

ডিউককে সত্যিকার অর্থে 'প্রথম নাট্য পরিচালক' বলা হয়ে থাকে। কারণ 'পরিচালকের থিয়েটার' বলতে যা বোঝায় তিনি ১৮৭৪ সালেই তার সূচনা করে

গেছেন। এর আগে থিয়েটার ছিল নাট্যকার ও শিল্পীদের হাতের মুঠোয়।

ডিউক তাঁর 'ডিউসচব্যুহনে' প্রবন্ধে পরিচালনার কয়েকটি নীতি লিপিবদ্ধ করে গেছেন, যেগুলি বর্তমানেও নাট্য-পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। নীতিগুলি এইরূপ :

১. দুই বা ততধিক অভিনেতা কখনই একরেখায় সমান্তরালভাবে দাঁড়াবেন না, চলাফেরা বা বসা-শোয়ার কাজ করবেন না।
২. সর্বদা মঞ্চের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অভিনয় করার প্রবণতা পরিত্যাগ করতে হবে।
৩. মঞ্চের পিছনের আঁকা দৃশ্যের পারসপেকটিভ হবে অবিকল স্বাভাবিক। অভিনেতা হাত বা দেহস্পর্শ দিয়ে এই পারসপেকটিভ নষ্ট করবেন না।
৪. মঞ্চ হবে জীবন্ত ছবির মতো। এই সাজানো ছবির ফ্রেমে অভিনেতারা নির্ধারিত ছকে নিজের নিজের কাজ করে যাবেন।
৫. অভিনেতারা দর্শকদের দিকে তাকাবেন না।
৬. যেহেতু থিয়েটারের দর্শক নিরবচ্ছিন্ন অ্যাকশন দেখতে চান, তাই অভিনেতাদেব মঞ্চে দাঁড়ানো, চলাফেরা ও প্রপসের ব্যবহারে সর্বদাই অ্যাকশনের বোধকে জাগিয়ে রাখতে হবে। যেমন, একজন অভিনেতা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকলে এক পা ওপরেব সিঁড়িতে ও এক পা নিচের সিঁড়িতে রেখে দাঁড়াবেন। তিনি কোনও প্রপস স্পর্শ করলে সেটা যে আসল, তা তাঁকে প্রমাণ করতে হবে।
৭. কোনও বিশেষ যুগের নাটক প্রস্তুতির সময় অভিনেতারা প্রথম থেকেই সেই যুগের পোশাক পবে মহড়া দেবেন, যাতে অনভ্যস্ত পোশাকেও তাঁরা অভ্যস্ত হয়ে যান এবং সাবলীলভাবে চলাফেরা করতে পারেন।

নাটক পরিচালনার ক্ষেত্রে ডিউক 'মিস-এন-সিন' বা পূর্ব পরিকল্পনার রীতি প্রয়োগ করতেন। যুগধারার নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি দৃশ্যরচনা, আসবাব, পোশাক-পরিচ্ছদ, দলগত অভিনয় প্রভৃতি সব কিছুকেই বাস্তবনিষ্ঠ করে তুলতেন। বাস্তবতা দেখাতে তিনি সত্যিকারের বাস্তব জিনিস ব্যবহার করতেন। একবার একটি নাটকে মৃত ঘোড়ার খোলসের মধ্যে খড় ভর্তি করে তাকে প্রকৃত ঘোড়ার অনুরূপ সৃষ্টি করেছিলেন। 'জুলিয়াস সিজার' নাটকে জনসভার যে সেট তিনি নির্মাণ করেছিলেন এবং তাতে তৎকালীন রোমান স্থাপত্য ও আনুষঙ্গিক উপকরণ দিয়ে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন, তাতে দর্শকদের মনে হয়েছিল সত্যি যেন রোম শহরটাকে তুলে এনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। মঞ্চনির্মাণে তিনি এতটাই রিয়ালিস্টিক ছিলেন যে বিয়র্নসনের 'মেরি স্টুয়ার্ট ইন স্কটল্যান্ড' এবং

শিলারের 'দ্য মেইডস অব ওরলিয়ানস'-এর সেট তৈরির জন্য জিয়র্গ ফাদারিংগে ও ডমরেমি ঘুরে এসেছিলেন। 'গোস্টস' নাটক প্রযোজনার সময় ইবসেনকে নরওয়ের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি বিশদ বিবরণ পাঠাতে বলেছিলেন।

ডিউক আধুনিক অভিনয়েরও ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন। তিনি তাঁর অভিনেতাদের আট বছর ধরে কঠিন নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে অনুশীলন করিয়েছেন। তিনি প্রত্যেক অভিনেতার অঙ্গাচালনা ও পোশাকের 'পূর্ব-পরিকল্পনা' করতেন। প্রত্যেক অভিনেতার কথা বলা ও চলাফেরা নির্দেশ করে দিতেন। দৃশ্যপট ও অভিনেতাদের মধ্যে সামঞ্জস্য এনে সব কিছু ছক-বাঁধা একটা পদ্ধতির মধ্যে এনে ফেলতেন। তিনি তাঁর অভিনেতাদের মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে দর্শকের দিকে মুখ করে অভিনয় করতে দিতেন না। তিনি তাঁদের মঞ্চের সর্বত্র চলাফেরা করতে উপদেশ দিতেন। তিনি প্রত্যেক দৃশ্যের গুরুত্ব ও গুণমান অনুযায়ী অভিনেতাদের গ্রুপিংকে সাজাতেন। 'জনতার দৃশ্য' সাজানো ডিউকের বিশেষত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সমস্ত জনতা যেন একটি চরিত্রের মতো চলাফেরা করত। দৃশ্যের লয়বৃদ্ধির কাজে জনতাকে ব্যবহার করার টেকনিক তিনিই প্রথম ব্যবহার করেন।

ডিউক দলের ছোট বড় সব অভিনেতাকেই সমান নিয়মানুবর্তিতা ও কঠোর অনুশীলনের মধ্যে রাখতেন। কেউ নিয়মভঙ্গ করলে কঠিন শাস্তি পেতেন। তিনি 'তারকা-প্রথা' উচ্ছেদ করার জন্য কোনও নাটকের প্রধান ভূমিকার অভিনেতাকে পরের নাটকে পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করতে দিতেন। শোনা যায়, একজন তারকা-অভিনেত্রী ছোট চরিত্রে অভিনয় করতে অস্বীকার করায় তাঁকে তিনি বরখাস্ত করেছিলেন। রঙ্গালয়ে কয়েক মিনিট দেরিতে আসার জন্য একজন অভিনেত্রীকে তিনি দল থেকে বিতাড়িত করেছিলেন।

বার্লিনে প্রচুর সুনাম পাওয়ার পর ডিউক প্রায় ৬৬ জন অভিনেতা ও কলাকুশলী নিয়ে হল্যান্ড, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক ও সুইডেনের ৩৮টি শহর ভ্রমণ করেন। ১৮৭৬-এ বার্লিনে ইবসেন তাঁর প্রথম দিকের প্রযোজনা 'দ্য প্রিটেনডার্স' দেখেন। ১৮৮১ সালে স্কটল্যান্ডের নাট্যকার ও সমালোচক উইলিয়ম আর্চার (১৮৫৬-১৯২৪) তাঁর 'জুলিয়াস সিজার' প্রযোজনাটি দেখেন। ১৮৮৫-তে মস্কোতে স্তানিস্লাভস্কি তাঁর নাটক দেখে এতটাই মুগ্ধ হন যে তিনি তাঁর ও তাঁর দলের সঙ্গো এক বছর কাটান। স্তানিস্লাভস্কি ডিউকের প্রযোজনা দেখে বলেছেন, 'এমন বাহ্যিক রূপসমৃদ্ধ ও বিস্ময়কর নিয়মানুবর্তিতা-সমৃদ্ধ প্রযোজনা আমরা মস্কোবাসীরা আগে কখনও দেখিনি।' ১৮৮৮-তে ব্রাসেলসে আঁতোয়ান তাঁর 'উইনটার'স টেল' প্রযোজনাটি

দেখেন। বিখ্যাত ব্রিটিশ অভিনেতা ও ম্যানেজার স্যার হেনরি আরভিং (১৮৩৮-১৯০৫) তাঁর প্রযোজনা দেখেন ও বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। আঁতোয়ান ও স্তানিস্লাভস্কি স্বীকার করেছেন যে ডিউকের এই মেইনিনজেন দলটি থিয়েটারে তাঁদের নতুন ভাবনায় দীক্ষিত করেছে। তাদের মহড়ার পদ্ধতি, সুশৃঙ্খল দলগত অভিনয়, প্রযোজনার ঐক্য ও ধারাবাহিকতা আঁতোয়ানের তিয়েত্রা লিবার ও স্তানিস্লাভস্কির মস্কো আর্ট থিয়েটারের বিশুদ্ধতার মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

১৮৮৯-এ মেইনিনজার দলটি লন্ডনে ফিরে এসে শিলারের 'দ্য রবার্স' ও 'উইনটার'স টেল' এবং শেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সিজার' ও 'টুয়েলফথ নাইট' মঞ্চস্থ করে। সংবাদপত্র, সমালোচক, দর্শক ও নাট্যব্যক্তিত্বরা তাদের অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করে। 'জুলিয়াস সিজার' নাটকে জনতার উদ্দেশে অ্যান্টনির বক্তৃতা অভিনব পদ্ধতিতে পরিবেশিত হয়। কাল্পনিক জনতার পরিবর্তে অ্যান্টনির ভূমিকাভিনেতা দর্শকদের উদ্দেশ্য করে বক্তৃতা দিয়ে চলেন। তাঁদের প্রশ্ন করেন। প্ররোচিত করেন। উত্তেজিত করে তোলেন। যেন তাঁরা সত্যি সত্যি রোমান নাগরিক। যেন এটা বঙ্গামঞ্চ নয়, এটা রোম শহর। দর্শকরা নিজেদেব অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে রোমানদের মতো আচরণ করতে থাকেন। প্রতিক্রিয়া দেখাতে থাকেন। ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।

আমেরিকায় রিয়ালিজমের শ্রেষ্ঠ রূপস্রষ্টা হয়ে এলেন নাট্যকার, অভিনেতা-ম্যানেজার, আলোকশিল্পী ও পরিচালক ডেভিড বেলাস্কো (১৮৫৩-১৯৩১)। ১৮৮২-তে স্টেজ ম্যানেজার ও আবাসিক নাট্যকার হিসেবে তিনি নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার থিয়েটারে যোগ দেন। ১৮৯০-এ তিনি স্বাধীন প্রযোজক হিসেবে কাজ শুরু করেন। থিয়েট্রিকাল সিনডিকেটের হয়ে তাঁর সফল প্রযোজনা: 'দ্য ওয়াইফ' (১৮৮৭), 'ম্যাডাম বাটারফ্লাই' (১৯০০), 'আন্ডার টু ফ্ল্যাগস' (১৯০১), 'দ্য অকেসনার' (১৯০১), 'ডুব্যারি' (১৯০১)। ১৯০২ থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত তিনি ৪২টি প্রযোজনা নিয়ে নিউ ইয়র্ক ও অন্যান্য জায়গা ভ্রমণ করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা হল : 'দ্য ডারলিং অব দ্য গডস' (১৯০২), 'দ্য গার্ল অব দ্য গোল্ডেন ওয়েস্ট' (১৯০৫), 'দ্য রোজ অব দ্য র‍্যানচো' (১৯০৬), 'দ্য ইজিয়েস্ট ওয়ে' (১৯০৯), 'দ্য গভর্নর'স লেডি' (১৯১২)। তিনি ১৯০৭-এ বেলাস্কো থিয়েটার গঠন করেন। সেখানে তিনি চমকপ্রদ সব নাটক উপহার দেন। 'দ্য থিয়েটার থ্রু ইটস স্টেজ ডোর' নামে তাঁর একটি আত্মজীবনী গ্রন্থ ১৯১৯-এ প্রকাশিত হয়।

বেলাস্কো বাস্তবানুগ জীবনরূপ মঞ্চে ফুটিয়ে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। যেমন, 'দ্য ইজিয়েস্ট ওয়ে' নাটকে ভগ্নপ্রায় বাড়ির একটি বড ঘর দেখানোর জন্য

তিনি একটি ঘরের দরজা জানালা সমেত ভিতের সমস্ত আসল আসবাবপত্র সংগ্রহ করে মঞ্চে সাজিয়ে দেন। 'দ্য গভর্নর'স লেডি' নাটকের দৃশ্যসজ্জার জন্য নিউ ইয়র্কের একটি রেস্টুরেন্ট কিনে ফেলেন। তারপর সেটির প্রত্যেকটি অংশ খুলে ও তুলে এনে ব্রডওয়ে মঞ্চে স্থাপন করেন। 'দ্য ডারলিং অব দ্য গডস' নাটকে তিনি মঞ্চে আসল ঘোড়া নিয়ে আসেন। 'দ্য রোজ অব দ্য র‍্যানচো' নাটকে বাস্তবের অবিকল প্রতিরূপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি মঞ্চে সত্যিকার টেলিফোন, লিনোটাইপ যন্ত্র, চলন্ত সিঁড়ি প্রভৃতি ব্যবহার করেন। সত্যিকার 'বার' সৃষ্টি করে দর্শকের মধ্যে পানীয় বিতরণ করেন।

মঞ্চে জাদুকরী আলোর এফেক্ট সৃষ্টি করাই থিয়েটারে বেলাস্কোর শ্রেষ্ঠ অবদান। চরিত্রের ভাবাবেগ সৃষ্টিতে বৈদ্যুতিক আলোকসম্পাতে তিনি দিশারী হয়ে রয়েছেন। তিনি ফুটলাইটকে গোপন জায়গায় বসিয়ে রাখতেন। তিনি বেবি স্পটকে অনেক উন্নত করেছেন। তিনি নাটকে আলোকসম্পাতকেও চেতনার প্রতীক হিসেবে রূপদান করে তাকে এক নতুন শক্তিতে বলীয়ান করেছেন। তিনি বলতেন, 'সংগীতে যেমন লিরিক, নাটকে তেমনই আলোকসম্পাত। আর কোনও উপাদানই নাটকের মুড ও চরিত্রের অনুভূতি প্রকাশে এতটা কার্যকরী নয়।' পরীক্ষামূলক আলোকসম্পাতের জন্যও তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। 'দ্য ডারলিং অব দ্য গডস' নাটকে তিনি একটি আলোর এফেক্ট ১৫ মিনিট ধরে দেখিয়েছিলেন। 'দ্য গার্ল অব দ্য গোল্ডেন ওয়েস্ট' নাটকে সিয়েরা নেভাদা পাহাড়ের ওপর ক্যালিফোর্নিয়ায় সূর্যাস্তের রং দেখানোর জন্য তিনি তিন মাস পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন।

বেলাস্কো তাঁর অভিনেতাদের প্রশিক্ষণে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতেন। তিনি চাইতেন, দর্শকরা যেন তাঁর অভিনেতাদের অভিনয় দেখে বলেন, মনেই হয় না অভিনয় দেখছি, এত স্বাভাবিক এদের অভিনয়। তিনি চাইতেন, অভিনেতারা শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে অবস্থান করেও অ-নাটকীয় থাকুন। তাঁদের সংলাপ বলা যেন স্বাভাবিক কথোপকথনের মতো হয়। তাঁরা এমন অভিনয় করুন, যাতে অন্তরঙ্গ দৃশ্যগুলিতেও দর্শকের যেন এমন অনুভূতি হয় যে, তাঁরা গোপনে অন্যদের আলাপচারিতা শুনছেন।

বেলাস্কোর অনেক অদ্ভুত ও বিচিত্ররকম অভ্যাস ছিল। যেমন, তাঁর ব্রিফকেসের ওপর সোনার অক্ষরে লেখা থাকত 'যে নাটকটা আমি এখন লিখছি।' তিনি তাঁর প্রযোজনায় কখনই মঞ্চে উজ্জ্বল রঙের, বিশেষ করে লাল রঙের ফুল রাখতেন না। কারণ তিনি মনে করতেন, এতে দর্শকের চিত্তবিক্ষেপ ঘটবে। এক নাট্যকার তাঁর পাণ্ডুলিপি নিয়ে বেলাস্কোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে

অনুরোধ করেন সেটি মঞ্চস্থ করতে। বেলাস্কো পাণ্ডুলিপি নিয়ে তাঁর সহকারীকে সেটি দিয়ে বলেন, 'এটি ভালো করে টুকরো টুকরো করে কাটবে ও আজ রাতে বরফের ঝড় দেখাতে ব্যবহার করবে।' মহড়ায় তিনি ছিলেন উৎপীড়ক। সমালোচক ব্রুক অ্যাটকিনস লিখেছেন, 'বেলাস্কো অভিনেতাদের ওপর অত্যাচার করতেন। একবার একটি দৃশ্যে আর্তনাদ করার জন্য তিনি এক অভিনেতার গায়ে পিন ফুটিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি সব সময় একটি সস্তা ঘড়ি হাতে পড়তেন এবং রেগে গেলে বা হতাশ হলে অভিনেতার সামনে সেটিকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন ও পা দিয়ে মাড়াতেন।'

যে রিয়ালিজম ইউরোপের নাট্যচিন্তা ও নাট্যশিল্পকে অধিকার করে বসেছিল, বিশ শতকের সাতের দশক থেকে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর দেখা দিতে শুরু করল। রিয়ালিজমের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ করলেন সুইডিস নাট্যকার স্ট্রিন্ডবার্গ। তিনি বললেন, 'বাস্তববাদের নামে অনুকৃতিবাদ জীবনকে খণ্ডিত ও সীমিত করে কল্পনাকে বন্দি করে রাখে। জীবনে যা আছে তা দেখানোই শিল্প নয়, জীবন যা হতে চায় তাকে রূপ দেওয়াই শিল্পের ধর্ম। মানুষের স্বপ্ন ও কল্পনাই শিল্প-সত্য। তাকেই নাটকে রূপ দিতে হবে।' ইতালির নাট্যকার লুইজি পিরানদেল্লোও শিল্পে বাস্তবতাকে অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন, 'নিরাবরণ বাস্তব নিয়ে ফোটোগ্রাফি হতে পারে, শিল্প হয় না। এই হয়ে ওঠার কিছু আবশ্যিক সত্য আছে। এখানে চোখে দেখা জগতের সঙ্গে মনের ভাবজগতের রাজযোটক মিল হওয়া চাই। যুগে যুগে যত মহৎ শিল্প তৈরি হয়েছে তাতে কিন্তু বস্তু ও কল্পনার সম্মিলন ঘটেছে গাণিতিক নির্ভুলতায়।' গর্ডন ক্রেইগও থিয়েটারকে নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ না রেখে জীবনের পরিধিতে বিস্তৃত করতে বললেন। তুলে ধরতে বললেন শিল্পীর অঙ্গীকারহীন রূপ। তিনি বললেন, 'থিয়েটারকে বাস্তবজগতে পরিণত করার চেষ্টা বাতুলতা ছাড়া আর কিছু নয়। থিয়েটারে থাকবে বাস্তবতার মায়া, বাস্তবতার কান্না নয়। ওই মায়া সৃষ্টির জন্য যেটুক আবশ্যক, সেইটুকুই যথেষ্ট। তার বেশি আতিশয্য।'

অন্যদিকে, পরিবেশকে সর্বতোভাবে লৌকিককল্প করার ঝোঁক মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ায় বাস্তববাদীদের মধ্যেও নানা বৈচিত্র্য দেখা দিল। সম্পূর্ণ বাস্তববাদ বা বাস্তবের যথাযথ পুনরুক্তি মঞ্চে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হল না। বেলাস্কো মঞ্চে আসল ঘোড়া নিয়ে আসতে পারলেও পাহাড়, আকাশ বা সরোবর আনতে পারলেন না। ডিউক মঞ্চে প্রকৃত ঘর ও আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পারলেও দর্শকের জন্য তাঁকে একখানা দেওয়াল সরিয়ে দিতেই হল। তাছাড়া বাস্তবে ঘটিত কাহিনির দীর্ঘ সময়কে মঞ্চে স্বল্প সময়ে বাঁধাও সম্ভব হল না।

এই সমস্ত কারণে থিয়েটারে আবির্ভূত হল 'সিলেকটিভ রিয়ালিজম'। এই মতবাদে বলা হল, শিল্প প্রকৃতির অনুকৃতি নয়। প্রকৃতি থেকে নির্বাচন করে নতুন কিছু গড়ে তোলাই হল শিল্প। মঞ্চে হুবহু বাস্তবকে টেনে আনার চেষ্টা না করে তার কিছু অংশ নিয়ে এসে বাস্তবের প্রতীতী জন্মানো ও পরিবেশ রচনা করে নেওয়াই শিল্পের উদ্দেশ্য। এই মতবাদীরা মঞ্চচিত্রকে সরল করলেন। সুনির্বাচিত কয়েকটি জিনিসের সাহায্যে সমগ্রতার আভাস দিলেন। দর্শকের মনোযোগ যাতে নাটক বা চরিত্র থেকে বিক্ষিপ্ত না হয়ে পড়ে তার জন্য তাঁরা অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটিগুলি বর্জন করলেন। একটি জানালা, একটি ঘরকে, দুটি গাছ একটি বনকে উপস্থিত করল। একটি পাল, একটি মাস্তুল এবং কয়েকটি তক্তা 'ওথেলো' নাটকের সাইপ্রাস সমুদ্রবন্দরের জেটিঘাটের পরিবেশ বুঝিয়ে দিল। পেরেকের গায়ে একটি ছেঁড়া শার্ট ও একটি ভাঙা লণ্ঠন দরিদ্র গৃহের পরিবেশ সৃষ্টি করল। 'রকেট টু দ্য মুন' নাটকটির মঞ্চায়নে দাঁতের ডাক্তারের অফিসের সব কিছুই বিশদভাবে দেখানোর দরকার হল না। দাঁতের চিকিৎসা বা অপারেশন করানোও দেখানো হল না। পিছনের ওয়েটিং রুমের লাগোয়া ঘরটিতে সেসবের বেশিরভাগটাই দেখানো হল। তার কাজের কিছু নমুনা দেখানো হল মাত্র। স্বামী ও প্রেমিক হিসেবে মানুষটির ব্যক্তিগত সংগ্রামের যে অত্যাবশ্যকীয় নাটক তা মঞ্চ-উপকরণের বিশদতায় হারিয়ে গেল না।

ফেমিনিস্ট থিয়েটার

- 'দিন আর রাত্রি যেমন সময়ের দুটি ভাগ, পুরুষ ও মেয়ে সমাজের দুটি অংশ। সমাজে দু'জন দু'জনকে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে এটাই শেষ কথা।' —*রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*
- 'নারীকে একবার পুরুষের সমান বলিয়া গ্রহণ করা হইলে দেখা যাইবে তিনি পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি উন্নতমানের।' —*সক্রেতিস*
- 'যে সমাজে মেয়েরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, যে সমাজে নারীরা সম্মান পায় না, সে সমাজের শোভা নেই, বৃদ্ধি নেই, সৌন্দর্য নেই।' —*ভীষ্ম*
- 'মেয়েরা পুরুষের অধীন থাকার ফলে মানবজাতির উন্নতির পথে বাধা হচ্ছে। কারণ মানবজাতির অর্ধেক প্রতিভা অব্যবহৃত থেকে যাচ্ছে।' —*জন স্টুয়ার্ট মিল*
- 'কোনও দেশের মুক্তিআন্দোলনই সফল হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ হিসেবে নারী সমাজও তার অংশীদার হয়ে উঠছে এবং তাদের মুক্তিসংগ্রামও বৃহত্তর মুক্তিসংগ্রামের অংশ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে।' —*লেনিন*
- 'নারীরা আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ বা ইহুদিদের মতো সংখ্যালঘু কোনও সম্প্রদায় নয়। তারা পৃথিবীর অর্ধেক বাসিন্দা। একথাটা ক্ষমতাসীন পুরুষদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে।' —*সিমন দ্য বোভোয়ার*
- 'যে দেশের পুরুষ জাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে।' —*ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর*
- কোনও দেশের সভ্যতার বিচার করতে হলে, তার উন্নতি অগ্রগতির

কথা ভাবতে হলে, আমাদের প্রথমেই নারীদের সম্পর্কে ভাবা উচিত।'

—*চার্লস কুরিয়ের*

- 'আকাশের অর্ধেক তুলে ধরে আছে নারী।' —*মাও জে দং*
- 'যত বন্ধন আছে, সকল বন্ধনে স্ত্রীগণকে বাঁধিয়াছে। পুরুষ জাতির জন্য একটিও বন্ধন নাই কেন? ইহা যদি অধর্ম না হয়, তবে অধর্ম কাহাকে বলে, বলিতে পারি না।' —*বঙ্কিমচন্দ্র*
- 'আমাদের যথাসম্ভব অধঃপতন হওয়ার পর দাসত্বের বিরুদ্ধে কখনও মাথা তুলিতে পারি নাই। তাহার প্রধান কারণ এই বোধহয় যে, যখনই কোনও ভগ্নি মস্তক উত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছিল, তখনই ধর্মের দোহাই বা শাস্ত্রের বচনরূপ অস্ত্রাঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে।'

— *বেগম রোকেয়া*

॥ ১ ॥

সভ্যতার উষাকালে পূর্ব ও পশ্চিম, দুই সমাজেই নারী ও পুরুষ সমান অধিকার নিয়ে বসবাস করত। সেই সময় এই দুই মানব সমাজই ছিল মাতৃতান্ত্রিক। 'ঋগ্বেদ সংহিতা'য় দেখা যায় বৈদিক যুগে নারীর সম্মান সর্বাগ্রেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে যজ্ঞ করত, উপযুক্ত শিক্ষালাভ করত। নারীরা যুদ্ধবিদ্যা, অসিচালনায় পারদর্শী ছিল। তারা বেদের মন্ত্র রচনা করত। গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা প্রমুখ শাস্ত্ররচয়িতা নারী বিরাট জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁরা পুরুষের তুলনায় কোনও অংশে কম ছিলেন না। প্রাচীন পশ্চিম দুনিয়ায়ও মাতৃতন্ত্রই ছিল প্রথম ও শেষ কথা। গ্রিক সভ্যতায় সর্বসুকুমার বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী যে ন'জন 'মিউজ', তারা প্রত্যেকেই নারী। রকমারি সংগীত, বাদ্যযন্ত্র, ট্রাজেডি, কমেডি, জ্যোতির্বিদ্যা, এমনকি ইতিহাসের অধিকারী দেবীও ছিল নারী। শুধু তাই নয়, সেই দুনিয়ায় দৈববাণী উচ্চারিত হত একমাত্র নারীকণ্ঠে। ডেলফি, ডডোনা— তাদের বাণীর জন্য উৎকর্ণ ছিল সেই প্রাচীন দুনিয়া।

পরবর্তী সময়ে পুরুষ, বিশেষ করে সমাজের উচ্চবর্ণের পুরুষ, তার নিজের স্বার্থে নারীর অধিকারকে খর্ব করল। জবরদস্তি করে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করল। নারীকে পুরুষশাসিত সমাজের অনুশাসন মানতে বাধ্য করা হল। তারপর থেকে যুগ যুগ ধরে পিতৃতন্ত্র, পুরুষশাসিত সমাজ ও ধর্মীয় অনাচারের বলি হল নারী। আঠারো শতক পর্যন্ত পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেরই রাষ্ট্র ও সামাজিক গঠন ছিল মহিলা সমাজের পক্ষে চরম পক্ষপাতদুষ্ট ও নির্যাতনমূলক। পিতৃতন্ত্রে

পুরুষদের জানাই ছিল, মানুষের জানা। নারীদের জানার কোনও স্থান থাকল না সেখানে। পুরুষতন্ত্র বিচার করে দেখাল, সাদা অপেক্ষা কালো যেমন নিকৃষ্ট, পুরুষ অপেক্ষা নারী তেমনই হীন।

নারী-শক্তির বিরুদ্ধে সবচেয়ে কদর্য ভূমিকা নিল ধর্মগ্রন্থগুলি। হিন্দু ধর্মগ্রন্থ 'মহাভারত'-এ বলা হয়েছে : 'তুলাদণ্ডের একদিকে যম, বায়ু, মৃত্যু, পাতাল, ক্ষুরধার বিষ, সর্প ও বহ্নিকে রেখে অপরদিকে নারীকে স্থাপন করলে ভয়ানকত্বে উভয়ে সমান-সমান হবে।' 'দেবী ভাগবত'-এ বলা হয়েছে, 'নারীরা জোঁকের মতো সতত পুরুষের রক্তপান করে থাকে। পুরুষ যাকে পত্নী মনে করে, সেই পত্নী সম্ভোগের সুযোগ দিয়ে বীর্য, ধন ও মান সবই হরণ করে।' 'বৃহদারণ্যক উপনিষদ'-এ বলা হয়েছে, 'লাঠি দিয়ে মেরে নারীকে দুর্বল করা উচিত, যাতে নিজের দেহ বা সম্পত্তির ওপর তার কোনও অধিকার না থাকে।' 'মনুসংহিতা'য় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, 'যে স্ত্রী শুধুমাত্র কন্যা-সন্তানের জন্ম দেয়, তাকে ত্যাগ করা যায়। মৃত সন্তানের জন্মদানকারী স্ত্রীকে ত্যাগ করা যায়। কিন্তু, সন্তানের জন্ম দিতে পারার অক্ষমতার কারণে নির্বীর্য পুরুষকে ত্যাগ করা যায় না।' মনু আরও বলেছেন, 'পতি সদাচারহীন, পরস্ত্রীর সঙ্গে যৌন সম্পর্কে যুক্ত হলেও সতী স্ত্রী সেই পতিকে দেবতার মতোই পুজো করে যাবে।' মনুর বিধান, 'পতির মৃত্যুর পর পত্নী ফলমূলের স্বল্পাহার দ্বারা দেহ ক্ষয় করবে, তবু পরপুরুষের নামও করবে না। কিন্তু পত্নীর মৃত্যু হলে দাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষে পুরুষ আবার বিয়ে করবে।'

অন্যদিকে ইসলাম ধর্মের 'কোরান'-এ আছে, 'পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লা তাদের এককে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। স্ত্রীদের মধ্যে যারা অবাধ্য তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা বর্জন করো এবং প্রহার করো।' সুরা নিসা : ৩-এ বলা হয়েছে, 'বিয়ে করবে নারীদের মধ্যে যাদের ভালো লাগে— দুই, তিন অথবা চার।' মুসলিম নীতি-নির্দেশক গ্রন্থ 'হাদিস'-এ বলা হয়েছে, 'নারী শয়তানের রূপে আসে ও যায়।' মসজিদে দুই শ্রেণীর প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ। এক, শয়তান। দুই, নারী। এদের উপস্থিতিতে মসজিদ অপবিত্র হয়ে যায়।

'বাইবেল'ও পুরুষতন্ত্রের এক মৌলিক দলিল। সেখানে আদম-ইভের কাহিনি কিংবা স্বর্গ থেকে পতনের উপাখ্যানে ইভকে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে তা নারীর প্রতি বিদ্বেষের প্রমাণ। ঈশ্বর প্রথমে পুরুষকে সৃষ্টি করেন এবং তার উবুর মাংসপিণ্ড থেকে সৃষ্টি করা হয় নারীকে। বিজ্ঞানের কল্যাণে আজ এটি সর্ববাদীসম্মত যে, প্রাণসৃষ্টি একমাত্র নারীর পক্ষে সম্ভব।

ভারতের হিন্দু সংস্কার-সংস্কৃতিতেও পুরুষের সম্পত্তি বলে স্ত্রী গণ্য। ফলে

প্রচলিত প্রবাদ : 'পুরুষের ভালোবাসা, মোল্লার মুরগি পোষা।' হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী স্ত্রী 'ভস্ত্রা' বা চর্মপাত্রবিশেষ, সন্তান উপহার দেওয়াই তার প্রধান কাজ। সুতরাং মেয়েদের মধ্যে চলতি কথা, 'ভাত দেয় না ভাতারে, বাত দেয় গতরে।' বাংলা প্রবাদে আমাদের দেশের মেয়েদের হালচাল কী, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। একটি প্রবাদ বলে, 'লোহা জব্দ কামারবাড়ি, বউ জব্দ শ্বশুরবাড়ি।'

এই যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ও ধর্মের অনুশাসনের জবরদস্তি, এর ফলে পৃথিবীর সব দেশের মহিলারা নিদারুণ বঞ্চনার দুঃখে জর্জরিত হতে থাকল। অত্যাচারিত ও বিপন্ন নাগরিক হিসেবে কদর্য জীবনযাপনে বাধ্য হল। আর ভারতবর্ষের তো কথাই নেই। হিন্দু ধর্মের নামে, সমাজের নৈতিকতা, শুদ্ধতা ও শৃঙ্খলার নামে হাজার হাজার বছর ধরে মহিলাদের ওপর চলল অমানবিক নিষ্ঠুর নিপীড়ন, নিরবচ্ছিন্ন বর্বর অত্যাচার। সেই অত্যাচার ও নিপীড়নের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। কালের শিলালেখে অশ্রুজলে লেখা আছে সেসব অমানুষিক হৃদয়-বিদারক করুণ কাহিনী।

॥ ২॥

নারী জাতির প্রতি এই বৈষম্য, অবিচার, অবমাননা ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে আঠারো শতকে একদল প্রগতিশীল নারী-পুরুষ গর্জন করে উঠলেন। নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিয়ে সারা বিশ্বব্যাপী আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। নারীমুক্তির এই আন্দোলনের নাম 'ফেমিনিজম' (বাংলায় 'নারীবাদ')। বিভিন্ন মতাদর্শকে আদর্শ করে গড়ে উঠল বিভিন্ন ফেমিনিস্ট সংগঠন। যেমন, লিবারেল ফেমিনিজম, সোস্যালিস্ট ফেমিনিজম, র‍্যাডিকাল ফেমিনিজম, ইকো ফেমিনিজম। 'নারীবাদ' চায় নারী-পুরুষের সমান অধিকার। 'নারীবাদ' পুরুষতন্ত্রের বিরোধিতা করে— পুরুষের নয়। পিতৃতান্ত্রিক শাসনের অকল্যাণে যে অসংখ্য অনুচিত সামাজিক নিয়মের বলি হতে হয়েছে নারী জাতিকে, 'নারীবাদ' শুধু চায় সেই অনিয়মগুলির পরিবর্তন। সেই অন্যায়গুলির প্রতিকার। 'নারীবাদ' চায় পুরুষতন্ত্রের বদলে মানবতন্ত্র। নারীতন্ত্র নয়। 'নারীবাদ' চায় সাম্য, স্বাধিকার। অনেকে তাই 'ফেমিনিস্ট' শব্দটির বদলে 'উওম্যানিস্ট' শব্দটি ব্যবহার করতে চান।

ফেমিনিস্ট আন্দোলনকারীদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন ফ্রান্সের শার্ল কোরিয়ে। তাঁকে নারী-স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রবক্তা বলা হয়। তিনি সে যুগের প্রতিকূল মাটির ওপর দাঁড়িয়ে গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছিলেন, 'কোনও দেশের সভ্যতার বিচার করতে হলে, তার উন্নতি-অগ্রগতির কথা ভাবতে হলে আমাদের প্রথমেই নারীদের সম্পর্কে ভাবা উচিত।' জার্মানির

স্বনামধন্য দার্শনিক হেগেলও অনুরূপ কথা বলেছিলেন। আধুনিক সাম্য দর্শনের প্রবক্তা বিশ্বখ্যাত কার্ল মার্ক্স তাঁর নারীমুক্তি ভাবনার জন্য শার্ল কোরিয়ের দ্বারা বহুলাংশে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

মহিলাদের সপক্ষে সাম্য, মৈত্রী ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অভয়মন্ত্র শোনালেন আর এক বিদুষী ফরাসি মহিলা ওলমিনিয়া গুচ। তিনি প্রাচীনপন্থীদের অগ্রাহ্য করে স্পষ্ট ভাষায় বললেন, 'তোমরা সকলেই নারীজাতির সন্তান, নারীরাও মানুষ।' হইহই করে উঠল তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসন। হিংসায় উন্মত্ত হয়ে তারা মাদাম গুচকে গ্রেপ্তার করে কারাগারের নোংরা অন্ধকার ঘরে পুরে দিল। খাদ্য নেই, পানীয় নেই। নেই বেঁচে থাকার বিন্দুমাত্র উপকরণ। এইভাবে তৎকালীন শাসক সমাজের চরম নিষ্ঠুরতায় মৃত্যু হল মাদাম গুচের।

অন্যদিকে ইংল্যান্ডে নারীর স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার নিয়ে মেরি অ্যাসটেল. ইংরাজ কবি শেলীর স্ত্রী মেরি ওলস্টনক্র্যাফট প্রমুখ নারীবাদী নেত্রী আন্দোলন শুরু করলেন। ১৭৯২-এ ওলস্টনক্র্যাফট তাঁর 'আ ভিনডিকেশন অব রাইটস অব উওম্যান' নামে যুগান্তকারী বইটিতে নারীশিক্ষার পক্ষে কলম ধরলেন। পুরুষকে আনন্দ দেওয়ার জন্য নারীর জীবন নয়, তা তিনি এই বইতে জোর গলায় বললেন। এই বইতে তিনি যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে নারীদের অধিকতর সুযোগ-সুবিধার দাবি উপস্থাপন করলেন। বস্তুত, ওলস্টনক্র্যাফটের এই বইটি থেকেই পাশ্চাত্য দেশে নারীমুক্তি-আন্দোলন শুরু হয়।

এরপর উনিশ শতকে ফ্রান্সের এক প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব পাওয়ার বাব ১৮৬৮ সালে প্রকাশ করলেন তাঁর নারীবাদী বই। 'ক্রিমিনালস, ইডিয়টস, উইমেন অ্যান্ড মাইনরস : ইজ দিস ক্ল্যাসিফিকেশন সাউন্ড?' ১৮৬৯-এ নারীদের পরাধীনতা নিয়ে অর্থনীতিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩) লিখলেন, 'দ্য সাবজেকশন অব উইমেন' বইটি নারী-আন্দোলনের ধাত্রীর ভূমিকা পালন করল। মিল দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেন, 'মেয়েরা পুরুষের অধীনে থাকার ফলে মানব জাতির উন্নতির পথে বাধা হচ্ছে। কারণ মানব জাতির অর্ধেক প্রতিভা অব্যবহৃত থেকে যাচ্ছে।' তিনি আইন, রাজনীতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য সম্পূর্ণ সমানাধিকার দাবি করলেন। এই দাবির ফলে ১৯২৪ সালে ইংল্যান্ডে পুরুষ ও নারীর ভোটের সমানাধিকার স্বীকৃতি পেল। ইউরোপ, ফিনল্যান্ড ও নরওয়েতেও নারীদের ভোটাধিকার মেনে নেওয়া হল। ১৯৩৪ সালে লাতিন আমেরিকায়, ১৯৬৭-তে ফিলিপিন্সে, ১৯৪৫-এ ফ্রান্সে ও জাপানে এবং ১৯৪৬-এ বেলজিয়ামে নারীদের ভোটাধিকার মেনে নেওয়া হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নারী-আন্দোলন শুরু হয় উনিশ শতকে। ১৮৪৫-এ নিউ

ইয়র্ক ট্রিবিউন পত্রিকার লিটারারি এডিটর ও দ্য ডায়াল পত্রিকার সম্পাদক মারগারেট ফুলারের (১৮১০-১৮৫০) 'উইমেন ইন দ্য নাইনটিনথ সেঞ্চুরি' বইটি আমেরিকায় সাড়া ফেলে দিল। ১৮৪৬-এ এলিজাবেথ ক্যাডি স্ট্যানটন, সুব্রেনিয় মট, লসি স্টোন, গ্রিমফি ভগ্নিদ্বয়, আন্না হাওয়ার্ড শ এবং ক্যারি চ্যাপম্যান নিউ ইয়র্কের সেনেকা ফলসের ওয়েসলিয়ান চার্চে একত্র হয়ে 'দ্য মেনেকা ফলস ডিক্লারেশন অব সেন্টিমেন্টস অ্যান্ড রেজলিউশন' নামে একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন। এই ঘোষণাপত্রে নারী সমাজের সম্পত্তি ও ভোটাধিকারের সঙ্গে দাবি করা হল আরও নানারকম অধিকার। ১৮৭২-এ সুশান বি. অ্যান্টনি ৫০ জন মহিলার একটি দল দিয়ে রচেস্টার শহরে গিয়ে রাজনৈতিক নির্বাচনে ভোট দিলেন ও গ্রেপ্তার হলেন। বিচারে তাঁর ১০০ ডলার জরিমানাও হল। ১৮৯০ সালে ন্যাশনাল আমেরিকান উওম্যান সাফরেজ অ্যাসোসিয়েশন (১৯৬৬-১৯৭০) সংবিধান সংশোধনের দাবিতে সমস্ত আমেরিকা জুড়ে আন্দোলন চালাতে থাকল। ১৯২০-তে এই সংগঠনের দাবি মেনে সংবিধান সংশোধনও করা হল। বিশ শতকের মাঝামাঝিতে এমা গোল্ডম্যান ঘোষণা করলেন, 'স্বাধীনভাবে ও পুরুষের সমান অধিকার নিয়ে নারীদের বেঁচে থাকার জন্মগত অধিকার আছে।' মার্গারেট স্যাঙ্গার এই সময়েই করলেন আজকের জন্ম-নিরোধ আন্দোলনের সূত্রপাত। ১৯৬৩-তে নিউ ইয়র্কে বেটি ফ্রেইডেনের (১৯২১) প্রকাশিত 'দ্য ফেমিনিন মিসটিক' বইটি নারীমুক্তি আন্দোলনের এক বিপ্লবী 'ম্যানিফেস্টো'। এই বই নারীমুক্তি আন্দোলনে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিল। এই বইতে ফ্রেইডেন জানালেন, 'আজকের শিক্ষিত নারী আর বাড়ির গৃহিণী হয়ে থাকতে চায় না। সে-ও স্বামীর মতো ক্যারিয়ার চায়; শিক্ষা, রাজনীতি ও জীবিকাক্ষেত্রে সমান অংশ চায়।' আমেরিকান লেখিকা মেরি এলম্যানের 'থিংকিং অ্যাবাউট উইমেন', জারমেল গ্রিয়ারের 'দ্য ফিমেল ইউনাক' ও কেট মিলেটের 'সেক্সুয়াল পলিটিক্স' বই তিনখানিও নারীবাদী আন্দোলনের প্রেরণারূপে কাজ করল।

১৯৪৯-এ প্রকাশিত হয় ফরাসি লেখিকা সিমোন দ্য বোভোয়ারের (১৯০৮-১৯৮৬) গ্রন্থ 'দ্য সেকেন্ড সেক্স'। এই বইটিতে বিশ্লেষণাত্মক বৈজ্ঞানিক ভিত্তিভূমিতে নারীর স্থান নিরূপণ ও মর্যাদার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ঐতিহাসিক বিচারের মাধ্যমে লেখিকা দেখিয়েছেন যে, মৌল কাঠামোর দিক থেকে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনও তারতম্য নেই। সমাজ তথাকথিত 'নারীত্ব', 'চিরনারী' ইত্যাদির ধারণা তার ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। এই বইতে বোভোয়ার বললেন, 'নারীরা আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ বা ইহুদিদের মতো সংখ্যালঘু কোনও সম্প্রদায় নয়,

তারা পৃথিবীর অর্ধেক বাসিন্দা। একথাটা ক্ষমতাসীন পুরুষদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে।' বোভোয়ারের বইটি পশ্চিম বিশ্বের নারীদের সচেতন করে তোলে। মেয়েরা পুরুষের সমান অধিকারের দাবিতে সমগ্র ইউরোপ জুড়ে আন্দোলন করতে থাকে। দলে দলে নারী মিছিলে যোগ দেয়। তালাকের সংখ্যা বাড়তে থাকে। বিবাহপ্রথার বিরুদ্ধেও আন্দোলন শুরু হয়। বিশ শতকের ষাটের দশকে ইউরোপে নারীবাদীদের একটি জনপ্রিয় স্লোগানই হয়ে উঠেছিল, 'উইমেন উইদাউট ম্যান, ফিস উইদাউট বাইসাইকেল'। মাছের যতটুকু বাইসাইকেল প্রয়োজন, নারীর ততটুকুই পুরুষের প্রয়োজন।

আঠারো ও উনিশ শতকে ওলস্টনক্র্যাফট, মিল, ফুলার, ফ্রেইডেন, বোভোয়ার ও তাঁদের সমচিন্তকরা ব্রিটেনে ও আমেরিকায় নারীজাগরণের যে স্রোতস্বতী বহাতে চেয়েছিলেন, বন্যার মতো তা এসে আছড়ে পড়ল ব্রিটিশ অধিকৃত, নানা বিজেতার অত্যাচারে বিধ্বস্ত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবর্ষে। উনিশ শতকের সামাজিক আন্দোলনের ধ্রুবপদই হয়ে দাঁড়াল নারীকেন্দ্রিক। সতীপ্রথা, বহুবিবাহ, বিধবা-বিবাহ ও নারী শিক্ষা নিয়ে আন্দোলন হল অনেক। আন্দোলনের পুরোধায় এলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগব এবং ভারতবন্ধু খ্রিস্টান মিশনারি উইলিয়াম কেরি।

১৭৯৪-এ গঙ্গাসাগরে শিশুসন্তান বিসর্জন দেওয়ার প্রতি উইলিয়াম কেরির (১৭৬১-১৮৩৪) দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। কেরি তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ওয়েলেসলির কাছে এই কুপ্রথা বন্ধের আবেদন জানালেন। ১৮০২ সালে ওয়েলেসলি একে হত্যাকাণ্ড বলে ঘোষণা করলেন এবং হত্যাকারীকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে বলে আইন প্রণয়ন করলেন।

উনিশ শতকের প্রথম দিকে সারা ভারতবর্ষে সতীদাহ প্রথা ব্যাপক হারে চলছিল। তখন শুধুমাত্র সহমরণই নয়, চলছিল অনুমরণও। বিশেষত, কোঙ্কন আর অখণ্ড বাংলাদেশে একটি পুরুষের মৃত্যুতে পুড়ে মরেছে তাদের ৫০/৬০টি জীবন্ত কুলীন বধূ। সর্বপ্রথম এই বর্বর প্রথার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ হয় উইলিয়াম কেরির। ১৭৯৯-এর এপ্রিল মাসে কলকাতা থেকে শ্রীরামপুর যাওয়ার পথে তিনি একটি 'সহমরণ' দেখেন। এক হিন্দু রমণী তার মৃত স্বামীর চিতায় পুড়ে মরছিল। এই নিষ্ঠুর দৃশ্য দেখে তিনি দারুণ মর্মাহত হন। ১৮০৩-০৪ সালে এক বছর ধরে কলকাতা ও তার আশপাশের অঞ্চলে একটি সমীক্ষা করে তিনি ৪৩৮টি সতীদাহের প্রকৃত ঘটনা সংগ্রহ করলেন। তাতে তিনি দেখালেন যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'সতী'রা বালিকা। তাদের সম্পত্তি আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যেই সহমরণে তাদের বাধ্য করা হয়েছে। এই নিষ্ঠুর প্রথা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যেই প্রচলিত

ছিল। কারণ নিম্নবর্গের মধ্যে নারীর কোনও সম্পত্তি ছিল না। সংগৃহীত পরিসংখ্যানসহ সমীক্ষার প্রতিবেদন তদানীন্তন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলির কাছে পেশ করে কেরি এই বর্বর প্রথা বন্ধের দাবি জানালেন। রক্ষণশীল হিন্দুরা এর প্রতিবাদ করল। তাদের মতে, মিশনারিরা হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসে অযথা হস্তক্ষেপ করছে। এর কিছু পরেই ওয়েলেসলি ইংল্যান্ডে ফিরে গেলেন। তবে তাঁর উপদেশমতো কেরি আন্দোলন চালিয়ে যেতে লাগলেন।

১৮১৪-তে রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৮৩) সতীদাহ নিবারণ আন্দোলনের নেতৃত্বগ্রহণ করেন এবং ৫ বছর ধরে একাকী এই আন্দোলন পরিচালনা করে কৃতকার্য হন। ১৮১৯-এ তৎকালীন ভারতের বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের সহায়তায় সতীদাহ নামক বীভৎস প্রথাকে মানবিক ও সামাজিক অপরাধ ঘোষণা করে আইন প্রণয়ন হয়। রামমোহন নারীর সম্পত্তির অধিকার নিয়েও প্রস্তাব করেন। তাঁর এই প্রস্তাবের ১৩৪ বছর পর ১৯৫৬ সালে ভারতে সম্পত্তিতে হিন্দু নারীর অধিকার স্বীকৃত হয়। রামমোহন কৌলিন্যপ্রথা ও বহুবিবাহেরও বিরোধিতা করেন। রামমোহন তাঁর 'ব্রিফ হিস্ট্রি রিগার্ডিং মডার্ন এনক্রোচমেন্টস অন্য দ্য অ্যানসিয়েন্ট রাইট অব ফিমেলস, অ্যাকরডিং টু দ্য হিন্দু ল অফ ইনহেরিটেন্স, ১৯২২' বইটিতে লেখেন : 'স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোনও কালে লইয়াছেন, যে অনায়াসেই তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞানশিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়। আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয়, ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন?'

বিধবা-বিবাহের উদ্যোক্তা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) এক হাতে শাস্ত্রবাক্য, অন্য হাতে ব্রিটিশ সরকারের আইন, দুই ধনুকে গুণ চড়িয়ে সমাজসংস্কারে আগুয়ান হলেন। বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধবাদীদের তিনি তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে 'বিধবা-বিবাহ' বইতে লিখলেন : 'যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিতবোধ নাই, বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগ্য অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে। হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর বলিতে পারি না।' বিদ্যাসাগর ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৫ পর্যন্ত বিধবা-বিবাহ আইন প্রণয়নের জন্য আন্দোলন চালিয়ে যান। ১৮৫৬-তে 'বিধবা-বিবাহ আইন' পাশ হয়। তিনি ১৮৮১ থেকে ১৮৮৭ পর্যন্ত বহুবিবাহ প্রথার বিলোপের জন্য আন্দোলন করেন। বিদ্যাসাগর নারীশিক্ষার প্রসারেও বহু কাজ করেছেন। ১৮৪৯

সালে নর্মান বেথুন ও বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় 'হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়' (বর্তমানে বেথুন স্কুল) স্থাপিত হয়। ১৮৫৬ ও ১৮৫৭-তে বিভিন্ন জেলায় স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। উপযুক্ত সরকারি সাহায্যের অভাবে তিনি নিজে ওই বিদ্যালয়গুলির আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সেই সময় নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আরও একজন গর্জে উঠলেন। তিনি সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)। তিনি লিখলেন : 'যত প্রকার বন্ধন আছে, সকল প্রকার বন্ধনে স্ত্রীগণের হস্তপদ বাঁধিয়া পুরুষপদমূলে স্থাপিত কর— পুরুষগণ স্বেচ্ছাক্রমে পদাঘাত করুক অধম নারীগণ বাঙ্ নিষ্পত্তি করিতে না পারে। জিজ্ঞাসা করি, স্ত্রীগণ পুরুষের বশবর্ত্তিনী হয়, ইহা বড় বাঞ্ছনীয়, পুরুষগণ স্ত্রীজাতির বশবর্ত্তী হয়, ইহা বাঞ্ছনীয় নয় কেন? যত বন্ধন আছে, সকল বন্ধনে স্ত্রীগণকে বাঁধিয়াছে, পুরুষ জাতির জন্য একটি বন্ধনও নাই কেন? স্ত্রীগণ কি পুরুষাপেক্ষা অধিকতর স্বভাবে দুশ্চরিত্র? না রজ্জুটি পুরুষের হাতে বলিয়া স্ত্রীজাতির এত দৃঢ় বন্ধন? ইহা যদি অধর্ম না হয়, তবে অধর্ম কাহাকে বলে বলিতে পারি না।'

১৮৬৯-এ অবিভক্ত বাংলাদেশের বিক্রমপুরবাসী শিক্ষক দ্বারকানাথ ঠাকুর 'অবলাবান্ধব' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। নারীর অধিকার প্রতিপন্ন করে তিনি প্রতিসংখ্যা 'অবলাবান্ধব'-এ অগ্নিবর্ষণ করতে থাকলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎদগারের [illegible]ঙ্গে এগুলিকে তুলনা করেছেন। 'অবলাবান্ধব' সেই সময় ঢাকা ও কলকাতার ছাত্রদের মধ্যে তুমুল আন্দোলন জাগিয়ে তোলে। ওই সময় বিক্রমপুরের যুবকদলের অন্যতম নেতা নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ঢাকা থেকে 'মহাপাপ বাল্যবিবাহ' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করে আন্দোলন চালাতে থাকেন।

সেই সময় স্ত্রীশিক্ষা চালু করার মূলে ভগিনী নিবেদিতা, তরু দত্ত, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রমুখ মেয়েরাও এগিয়ে এসেছিলেন। শেষের দু'জন ডাক্তারি পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হন।

॥ ৪ ॥

বিশ শতকের সত্তরের দশকে নারীবাদী আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরুষের মতো নারীদের সমানাধিকার অর্জন করাই এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। এই মতবাদের প্রচারকরা দাবি করলেন, নারীকে দিতে হবে পুরুষের সমমানের আর্থিক সুবিধা, অগাধ স্বাধীনতা এবং যৌনতার দাসত্বমুক্ত জীবন। এই দশক থেকেই নারীরা হয়ে

উঠলেন অনেক বেশি স্বাধীনচেতা। এই সময়েই পাশ্চাত্যে ও আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত মেয়েরা পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এলেন বাইরের কাজের জগতে। তাঁরা পেলেন অর্থনৈতিক স্বাধীনতার স্বাদ। জীবন তাঁদের কাছে নতুন অর্থে, নতুন রূপে ধরা দিল। ব্যক্তি-মানুষ হিসেবে নিজের কাছে নিজের মর্যাদা তাঁদের বাড়তে থাকল। বহু সামাজিক নিয়ম ও আইনের মধ্যে নারীর প্রতি অপমান খুঁজে পেলেন তাঁরা। গার্হস্থ্য জীবনের ঘেরাটোপে নারীর বেঁচে থাকা যে সুন্দর নয়, সম্পূর্ণ নয়, মানুষের মতো নয়— এই উপলব্ধি জাগ্রত হল। তাঁরা দেখলেন, সামাজিক নিয়মগুলি পুরুষদের সুবিধা ও আনন্দের নিমিত্ত তৈরি হয়েছে। দাস প্রথার মতো নারীকে করে রাখা হয়েছে দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ। এর অনিবার্য ফল হিসেবে নারীর মধ্যে জেগে উঠল মানুষ হিসেবে মর্যাদা অর্জন করার লড়াই। নতুনতর ব্যক্তিত্বে স্বাধীন নারীরা সুবিধাভোগী পুরুষকেই প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং তার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে 'লিভ উইদাউট ম্যান' উচ্চারণে। এমনকি তাঁরা বলতে থাকেন, 'মাই উম্ব ইজ মাইন'।

বিশ শতকের শেষের দিকে ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় নারীমুক্তি আন্দোলন এক নতুন দিকে মোড় নিল। ১৯৮২-তে প্রকাশিত 'দ্য সেকেন্ড স্টেজ' বইতে বেটি ফ্রেইডেন বললেন, 'নারী-আন্দোলনের প্রথম স্তরে অত্যাধিক পরিমাণে 'সেক্সুয়াল পলিটিক্স'-এর ওপরই শুধু জোর দেওয়া হয়েছে। তাতে ফল ভালো হয়নি। নারী-আন্দোলন অন্যমুখী হয়ে গেছে।' ফ্রেইডেন নারী আন্দোলনের দ্বিতীয় স্তরের প্রস্তাব করলেন। তিনি বললেন, 'নারীকে যেমন একাধারে সমাজ, পরিবার, সন্তান ও গৃহের মতো নিজের জগতের ওপর কর্তৃক প্রতিষ্ঠা করতে হবে, অন্যদিকে পুরুষের সঙ্গো একজোট হয়ে চাকরি, ইউনিয়ন, কোম্পানি বা জীবিকার ওপর মানবিক অধিকাব বিস্তার করতে হবে। তাঁর মতে, পুরুষের বিরুদ্ধে নয়, বরং তাদের সঙ্গো নিয়েই নামতে হবে এই মহান সংগ্রামে।

১৯৯২-তে প্রকাশিত আমেরিকান লেখিকা ট্যোনি মরিসন তাঁর 'রেভোলিউশন ফ্রম উইদিন' বইতে নারীর আত্মিক উত্তরণের ধ্বনি তুলে বললেন, 'পুরুষের সঙ্গো আর সংঘর্ষ নয়। এখন নারী সমাজের সময় হয়েছে নিজেদের অন্তরের দিকে তাকাতে, নিজেদের জীবনকে সমৃদ্ধশালী করে তুলতে।' তিনি চাইলেন শিক্ষা ছাড়াও ব্যায়াম, সংগীতচর্চা, ছবি আঁকা বা সাহিত্যচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে নারীরা ব্যক্তিগত জীবনের পরিবর্তন আনুক। আমেরিকার নারী সমাজের জীবনের উন্নতি করতে হলে আগে নিজেদের জীবনকে উচ্চস্তরে তুলতে হবে, আত্মিক উন্নতিসাধন করতে হবে।

১৯৯২-এ প্রকাশিত 'ব্যাকলাশ' বইতে সাংবাদিক সুশান ফেলুদি বললেন,

বিশ শতকের সাতের দশকের ফেমিনিস্ট আন্দোলন আজ এক প্রতিরোধের দেওয়ালের মুখোমুখি হয়েছে। জনগণের শতকরা ৬৫ ভাগ নারীই ফেমিনিস্ট আন্দোলনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছে।' তাঁর মতে, এর মূলে আছে হোয়াইট হাউস, হলিউড ও গণমাধ্যম। তারাই নারীমুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে এমন এক ইমেজ সৃষ্টি করেছে যে, এর প্রকৃত লক্ষ্য যদি হয় নারী সমাজের চেতনা জাগানো, তাহলে আজকের লক্ষ্য হবে প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তন সাধন। রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে সেই অবস্থা সৃষ্টি করা, যার ফলে নারী জীবনের সর্বক্ষেত্রেই পুরুষের সমকক্ষ হবে, কারুর পক্ষেই বৈষম্যমূলক আচরণ করা সম্ভব হবে না।

অন্যদিকে, জাতিসংঘ ঘোষিত বিশ্ব নারীবর্ষ (১৯৭৫) ও নারীদশক (১৯৭৬) -১৯৮৫) প্রমাণ করল যে, বিশ্বের নারী সমাজ তাদের বিচিত্র ও বিভিন্ন মাত্রার বন্ধন ও অবদমন থেকে মুক্তি চায়। তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ চায়।

১৯৮৫-তে নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত 'ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অব উইমেন'-এ ১৩ হাজারের মতো বেসরকারি প্রতিনিধিদের সমাবেশ হয়। এই সম্মেলনে কিছু নারী-ব্যক্তিত্ব ও নারী সংগঠন নিয়ে গঠিত হয় 'ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভস উইথ উইমেন ফর আ নিউ এরা' (সংক্ষেপে 'ডন')। 'ডন' নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন পদ্ধতির স্পষ্ট সংজ্ঞায়ন করল।

'ডন' ঘোষণা করল, 'পার্সোনাল ইজ পলিটিক্যাল', ব্যক্তিগতই রাজনৈতিক। রাজনীতি মানে ওই দলগত আনুগত্য নয়, নয় শুধু সমাজ বদলের সক্রিয় পদ্ধতি। নারী-নিপীড়ন বা মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন তোলার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জীবন-জীবিকা, পরিবেশ, কর্মক্ষেত্রে যৌনহেনস্থা, শরীরের অধিকার, জন্মনিয়ন্ত্রণে গিনিপিগ না হওয়া, পাচারকারীদের আশ্রয় না দেওয়ার দাবি। এই সবই রাজনীতি। 'মেয়েদের বিষয়' বলে প্রথাগত রাজনীতি যা কিছুকে বাদ দিয়েছে, মেয়েরা দেখাচ্ছে সেই নীরবতাও একটা বৃহত্তর রাজনীতিরই অংশ।'

১৯৯১ সালে আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরের এক মহিলা সম্মেলনের প্রস্তাব অনুযায়ী প্রতি বছর সারা পৃথিবীব্যাপী নানা সংগঠন ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত একপক্ষব্যাপী 'নারী-নির্যাতন বিরোধী পক্ষ' হিসেবে উদ্‌যাপন করে। পশ্চিমবঙ্গে এই প্রতিবাদপক্ষ পালন প্রথম শুরু করে হাওড়া জেলার উদয়নারায়ণপুর থানার মানশ্রী গ্রামের 'পিরা' নাটক সংগঠন।

১৯৯৫-এর ১৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ বেজিংয়ে চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের আয়োজন করে। ভারত, পাকিস্তান, নরওয়ে, ব্রাজিল, কোরিয়া, নেদারল্যান্ডস, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, সুইডেন, ফ্রান্স, শ্রীলঙ্কা, মিশর প্রভৃতি ১৮৫টি

দেশের প্রায় ৩৫ হাজার নারী প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দেন। এই সম্মেলনের বিষয় ছিল . নারীর বিভিন্ন সমস্যা ও নারীর সমানাধিকার। স্লোগান ছিল : নারীর অধিকার, মানবিক অধিকার। এই সম্মেলন প্রমাণ করল, নাইরোবি সম্মেলনের দশ বছর পরেও নারী-আন্দোলন পৃথিবী জুড়ে সক্রিয় রয়েছে এবং শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। নিজ নিজ ক্ষেত্রে নারী আজ সংঘবদ্ধ। আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক স্তরে এক সূত্রে গ্রথিত। রাষ্ট্রসংঘের নীতি ও নিয়মাবলির সঙ্গো সঙ্গাতি রেখে কর্মচালনায় সক্ষম। এই সম্মেলনে ১২টি বিশেষ ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে যেখানে নারীর পশ্চাৎপদতা ও অনগ্রসরতা বিশেষভাবে বিদ্যমান।

২০০১-এর ২৩ থেকে ২৬ ডিসেম্বর অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরা শহরে 'এশিয়ার মহিলা সংগঠন'-এর ষষ্ঠ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার বিষয় ছিল : হিংসার মুখোমুখি মেয়েরা। জাপান, ভারত, শ্রীলঙ্কা, ফিলিপিন্স, অস্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য দেশের মহিলা গবেষক ও মহিলাদের মধ্যে কর্মরত সংগঠনের প্রতিনিধিরা ওই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধ বা দেশে হিংসাত্মক ঘটনার জন্য মেয়েদের এক দেশ থেকে অন্য দেশে পালিয়ে যাওয়ার পর সমস্যা, যৌন সমস্যা ও জনসংখ্যা, যুদ্ধে মেয়েদের অভিজ্ঞতা প্রভৃতি বিষয়ে যে আলোচনা হয় তাতে জানা যায়, অস্ট্রেলিয়ায় আগত ভিয়েতনামি ও ইংরাজ মহিলা উদ্বাস্তুরা হিংসাকে কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারে না, নতুন দেশে এসেও তারা নির্যাতিতা হয়েছে। নিরাপত্তার অভাবে সাইবেরিয়া, নিকারাগুয়া ও সালভাদরের মেয়েরা পুরুষেব সশস্ত্র সংগ্রামের সঙ্গী হয়েছে। শ্রীলঙ্কায় কুড়ি বছর যাবৎ হিংসাত্মক ঘটনায় তামিল মেয়েদের মধ্যে অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে। নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য হারিয়ে অন্যকে খুন করার জন্য নিজেদের মানুষবোমায় রূপান্তরিত করেছে।

॥ ৫ ॥

ফেমিনিস্ট আন্দোলনের ঢেউয়ে সাহিত্য ও নাটকের পরিমণ্ডলও আন্দোলিত হয়। জেন অস্টেন, ফ্যানি বার্ন, লিও তলস্তয়, ভার্জিনিয়া উলফ প্রমুখ খ্যাতনামা লেখকরা তাঁদের উপন্যাসে নারীর স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিসত্তার কথা বললেন। ১৭৭৮ সালে ফ্যানি বার্ন তাঁর 'ইবলিনা' ও 'সেমিলিয়া' উপন্যাসে নারীর সম্মানের সঠিক রাস্তা দেখালেন। পথভ্রষ্ট হওয়ার ভয় না দেখিয়েও নারী পাঠকদের সত্যের সন্ধান দিলেন। ১৮৬৯-এ ব্রিটিশ লেখিকা জেন অস্টেন তাঁর 'প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস' বইয়ের নায়িকা এলিজাবেথকে চিত্রিত করলেন এক স্বাধীন বিচারসম্পন্না নারী হিসেবে। তার আত্মবিশ্বাস তাকে ভুল করায়। দুঃখ দেয়। কিন্তু সেই বিশ্বাসকে সে

আঁকড়ে থাকে। ১৮৭৬-এ তলস্তয় লিখলেন 'আনা কারেনিনা'। এই উপন্যাসের নায়িকা আনা ঘর ছেড়ে চলে গেছে। উত্তর-স্বাধীনতা যুগে বাঙালি লেখিকা মহাশ্বেতা দেবীর 'সতী' বইতে নায়িকা বিদ্রোহের মশালটি দিয়ে গেছে নাতনী অমা র কাছে। মহাভারতের দ্রৌপদীর মতোই বস্ত্রহরণ-পীড়িত, নগ্ন, পুলিসবাহিনী-ধর্ষিত তাঁর 'দোপদী' উপন্যাসের নায়িকা আদিবাসী বিপ্লবী দোপদী রাজি হয়নি কাপড় আর গায়ে তুলতে। কেননা, পুরুষ কে আছে, যে তাকে লজ্জা নিবারণের বস্ত্র দিতে পারে?

১৮৭৯-এ নারীমুক্তির সপক্ষে নরওয়ের নাট্যকার হেনরিক ইবসেন লিখলেন 'আ ডল'স হাউস' নামে একটি যুগান্তকারী নাটক। নাটকের শেষ দৃশ্যটি এইরকম। গভীর রাত। চারিদিক নিঝুম। দরজা খুলে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল নাটকের নায়িকা নোরা। শুধু শোনা গেল একটি শব্দ— দরজা খোলার শব্দ। সেই শব্দ সারা ইউরোপে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হল। বার্নাড শ বললেন, 'ওই শব্দ ওয়াটারলুর কামানের গর্জনের চেয়ে অনেক বেশি গভীর ও গম্ভীব।' নিজের ভিতরে ব্যক্তিত্বের যে উদ্দীপন হয়েছে, তারই তাড়নায় বের হয়ে গেল নোরা।

অবিস্মরণীয় সেই দৃশ্য। রাত দুপুরে নোরা তাঁর স্বামী হেলমারকে বলছে, 'তোমার সঙ্গো আমার কিছু কথা আছে। আট বছর একসঙ্গো আছি আমরা, কিন্তু একদিনও গভীর কোনও কথা হয়নি, আজ হবে।' নোরা বলে, এই ঘর-সংসার, স্বামী-সন্তান নিয়ে পুতুল খেলায় তার সুখ নেই। পিতা তাকে পুতুল করে রেখেছিলেন ছেলেবেলায়। এখন স্বামী তাকে পুতুল করে রেখেছে। স্বামীরা এইরকমই হয়। নিজেদের কর্তা মনে করে। শাসন করে। স্বেচ্ছাচার চালায়। সন্তানের জন্ম দিয়ে স্ত্রীকে হাজার পাকে বাঁধে। নোরা এই কর্তৃত্ব মানল না। সে এই হাজার পাকের বাঁধন ছিঁড়ল। লক্ষণীয়, সংসারে তখন স্বচ্ছলতা দেখা দিয়েছে। সন্তানদের দেখবার জন্য আয়া আছে। কাজ করবার মানুষও আছে ঘরে। নোরার যে ঋণ ছিল বাজারে, তা শোধ হয়ে এসেছে। স্বামী ম্যানেজারের চাকরি পেয়েছে। অভাব বলতে আর কিছুই নেই। সোনার দিন বলতে যা বোঝায় তাই। তবু কেন ঘর ছাড়ল নোরা? ছাড়ল, কোনও মানসিক রোগে নয়। ভিন্ন কোনও পুরুষের আকর্ষণে নয়। দারিদ্র্যের দুঃসহ আঘাতে নয়। নোরা ঘর ছাড়ল স্বাধীনতার খোঁজে। আত্ম-আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষায়। ব্যাগ হাতে দরজা খুলে অন্ধকারের মধ্যে বের হয়ে গেল সে মুক্তির খোঁজে। সে আত্মহত্যা করল না, যেমন লক্ষ লক্ষ মেয়ে করে। সে আত্মবিক্রয় করল না, যেমন অনেকে করে। সে উন্মাদ হয়ে গেল না, যেমন আর পাঁচটা মেয়ে করে। সে কোনও ধর্ম প্রতিষ্ঠানে গেল না, যেমন প্রায় সবাই যায়। নোরা যাতে নিবৃত্ত হয়, ঘর না ছাড়ে, তার জন্য

আর দশজন স্বামী যা বলে হেলমারও তাই বলল। ধর্মের নীতিকথা শোনাল। সমাজের দোহাই দিল। বইয়ের জ্ঞানগর্ভ বাণী শোনাল। কিন্তু কোনওটাতেই কাজ হল না। শেষ অস্ত্র হিসেবে হেলমার বলল, 'নারী হিসেবে তোমার কর্তব্য রয়েছে স্বামী ও সন্তানের প্রতি।' নোরা জবাব দিল, 'প্রায় সমান পবিত্র আর একটি কর্তব্য আছে আমার।' স্বামীর প্রশ্ন : 'সেটা কী? কার প্রতি?' নোরার উত্তর, 'আমার নিজের প্রতি।'

জার্মানিতে যখন এই নাটকের অভিনয়ের আয়োজন হল, তখন পুরুষ-প্রধান, পুরোনো জার্মান সমাজ নোরার ঘর ছাড়া মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। যে অভিনেত্রী নাম ভূমিকায় নামবেন, তিনি কিছুতেই রাজি হলেন না এভাবে ঘর ছেড়ে যেতে। তিনি বললেন, নাটকের শেষটা বদলাতে হবে। জার্মান মঞ্চের জন্য ইবসেন শেষে নিজেই বদলে দিয়েছিলেন তাঁর নাটকের পরিণতি। ওই জার্মান রূপান্তরে দেখা যাচ্ছে, হেলমার জোর করে নোরাকে তাদের ঘুমন্ত সন্তান তিনটির কাছে নিয়ে যাচ্ছে, আর তাদের দেখে নোরার সুপ্ত মাতৃত্ব জেগে ওঠে। সে হাতের ব্যাগটা ফেলে দিয়ে ধপ করে মাটিতে বসে পড়ে।

অথচ ১৮৮৯ এ ইংল্যান্ডে নাটকটি যখন এক নাগাড়ে চার সপ্তাহ ধরে চলছিল তখন নোরার ভূমিকাভিনেত্রী প্রখ্যাত জেনেট এচার্চ বললেন, 'নোরার ঘর ছাড়াটি অপরিহার্য। সে কী করে হেলমারের মতো অসম্পূর্ণ এক পুরুষের সঙ্গে সহবাস করে?' তিনি আরও বলেছিলেন, 'এই নাটক থেকে শিক্ষনীয় বিষয় আছে দুটি। একটি পুরুষের জন্য, অন্যটি মেয়েদের। পুরুষরা পেতে পারে সেই জ্ঞান, স্ত্রী কী ভাবছে, কী অনুভব করছে তা উপেক্ষা করা মোটেই সমীচীন নয়। আর মেয়েরা? মেয়েরা শিখবে বিয়ের ব্যাপারে ঝটপট কিছু করতে নেই। ঝাঁপ দিতে নেই আগুপিছু না ভেবে।' নোরা যেমন আগুপিছু না ভেবে তাৎক্ষণিক মোহে বিয়ে করেছিল হেলমারকে। ইবসেনের 'আ ডল'স হাউস' নাটকটির গুরুত্ব এখানেই যে, নোরা নাটকের একটি চরিত্র হয়ে থাকেনি। বিশেষকে ছাড়িয়ে সে নির্বিশেষ হয়ে উঠেছে। সে তার সমাজের প্রতিবাদী নারীকণ্ঠে পরিণত হয়েছে।

জর্জ বার্নাড শ-ও নারীমুক্তি আন্দোলনের পক্ষে কলম ধরেছেন বারবার। তাঁর 'ক্যানডিডা', 'মেজর বারবারা' বা 'ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান' নাটকে তিনি দেখিয়েছেন যে, নারী শুধু ভিক্টোরিয়ান আমলের আদর্শ ধরে নম্র ও বিনীত হয়েই থাকতে চায় না, তারও নিজের সত্তা আছে, যেমন আছে ভালো-লাগা না-লাগার অধিকার। তাই 'ক্যানডিডা' নাটকের নায়িকাকে যখন দুই প্রণয়ীর মধ্যে একজনকে বেছে নেওয়ার জন্য তাকে চেপে ধরা হল, সে বলে উঠল, 'আশ্চর্য! আমাকে একজনকে বেছে নিতে হবে? আমাকে? আমি ভেবেছিলাম এটা ঠিকই

হয়ে আছে যে, আমি একজন বা অন্যজনের সম্পত্তি।'

নারীমুক্তি আন্দোলন থেকে উত্থিত হল 'ফেমিনিস্ট থিয়েটার'। ফেমিনিস্ট থিয়েটারগুলি প্রধানত দুটি দলে বিভক্ত। একটি দল প্রথানুগ। এরা নারীদের ওপর অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। অন্যটি বিপ্লবী দল। এরা নাটকের বিষয় ও আঙ্গিকের সর্বাত্মক বিপ্লব চায়। এই শেষোক্ত দলটি সমাজের পুরোহিততান্ত্রিক কাঠামোকে অগ্রাহ্য ও অমান্য করে। এরা ইম্প্রোভাইজেশন ও পরীক্ষামূলক পদ্ধতির সাহায্যে নাট্যনির্মাণ করে। এরা পুরুষদের বাদ দেয়। শুধু মহিলা-দর্শক পছন্দ করে। অভিনয়ের পর উপস্থাপিত সমস্যাগুলি নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসে।

১৯৭০-এর দশকে আমেরিকান থিয়েটারে নারীদের অসন্তোষ, ক্ষোভ ও ক্রোধ ফেটে পড়ে। ১৯৬৯-এ অ্যালসেলমা ডেল ওলিও প্রথম ফেমিনিস্ট থিয়েটার স্থাপন করেন। তারপর আমেরিকায় অনেক ফেমিনিস্ট থিয়েটার তৈরি হয়েছে। কিছু ফেমিনিস্ট থিয়েটার গর্ভপাত, ধর্ষণ, পারিবারিক সন্ত্রাস, মাতৃত্ব এবং অনু-পরিবারের প্রতারণা ইত্যাদি বিভিন্ন ও বিচিত্র সমস্যা নিয়ে নাটক করেছে। কিছু ফেমিনিস্ট থিয়েটার পুরুষদের শত্রু হিসেবে গণ্য করে নারীদের ক্রোধকে প্রতিফলিত করেছে। এইসব থিয়েটারে নারীরা পুরুষ চরিত্রে অভিনয় করে অত্যাচারী পুরুষদের শোষণের ছবি তুলে ধরেছেন। মিরনা ল্যাম্বের 'বাট হোয়াট হ্যাভ ইউ ডান ফর মি লেটলি?' নাটকটি তার বড় উদাহরণ। অন্যান্য ফেমিনিস্ট নাটক পুরুষতন্ত্রের ইতিহাসকে বর্জন করে নারীশাসিত সমাজের দর্শনের কথা বলেছে। এই নাটকগুলি সময় সময় নারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে ধ্রুপদি মিথগুলিকে পুনর্নির্মাণ করেছে। নারীদের রিচুয়াল তৈরি করেছে। মা ও মেয়ে, বোন ও বন্ধুর মধ্যে স্পষ্ট সম্পর্কের কথা বলেছে। নারীদের ইতিহাস পুনরাবিষ্কার করেছে।

বিশৃঙ্খলা, অর্থের অভাব, সাংগঠনিক দুর্বলতা ও মিডিয়ার অবহেলার কারণে অনেক আমেরিকান ফেমিনিস্ট থিয়েটার স্বল্পায়ু হয়েছে। তবুও তার মধ্যে সফল ফেমিনিস্ট থিয়েটার হিসেবে রোহডে আয়ল্যান্ড ফেমিনিস্ট থিয়েটার, অ্যাট দ্য ফুট অব দ্য মাউন্টেইন, উইমেন'স এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার, থিয়েটার অব লাইট অ্যান্ড শ্যাডো, দ্য ইনটার-আর্ট থিয়েটার, ওমাহা ম্যাজিক থিয়েটার, ল্যাভেন্ডার সেলার থিয়েটার, স্পাইডারউওম্যান থিয়েটার ওয়ার্কশপ ইত্যাদি দলগুলি নিজেদেরকে স্থিতিস্থাপক ও প্ররোচক হিসেবে প্রমাণ করেছে। এদের মধ্যে অনেক দলই 'অ্যাজিট-প্রপ' রীতি থেকে সরে এসে 'বিশ্বজনীন শান্তিবাদ'-এর মতো সূক্ষ্ম মানবিক সমস্যার দিকে ঝুঁকেছে।

'ফেমিনিস্ট থিয়েটা'র' আমেরিকান থিয়েটারে এক নতুন উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে এবং নারীমুক্তি বিষয়ের প্রতি দায়বদ্ধ থেকেই নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। 'অ্যাট দ্য ফুট অব দ্য মাউন্টেইন' যেমন ঘোষণা করেছে : 'সমাজের (যে সমাজ নিজের কাছ থেকেই বিচ্ছিন্ন) ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়ার সাক্ষী হিসেবে আমরা এক প্রতিবাদী থিয়েটার। এক নতুন পৃথিবীর (যা নারী সচেতনতার পুনর্জীবনের ভিতর দিয়ে উত্থিত হচ্ছে) ভবিষ্যদ্বাণীর অংশগ্রহণকারী হিসেবে আমরা এক সম্মান প্রদর্শনকারী থিয়েটার।'

১৯৭০-এ গ্রেট ব্রিটেনে রাজনৈতিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে ফেমিনিস্ট থিয়েটারের আবির্ভাব হয়। এই বামপন্থী মহিলা থিয়েটারের আন্দোলনের প্রথম দল দ্য উইমেন'স থিয়েটার গ্রুপ (১৯৭৩) ও দ্বিতীয় দল 'মন্ট্রাস রেজিমেন্ট' (১৯৭৫)।

১৯৭০-এর শেষের দিকে ও ১৯৮০-র দশকে গ্রেট ব্রিটেনে ফেমিনিস্ট থিয়েটার দ্রুতগতিতে বেড়ে চলে। নারীদের রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে ক্লিন ব্রেক, মাদার হেন, সাইরেন, স্পেয়ার টায়ার ও থিয়েটার অব ব্ল্যাক উইমেন-এর মতো অনেক নারীবাদী নাট্যদলের আবির্ভাব হয়। বেরিং আ্যান্ড দ্য পেবিলস, ব্লুমার্স, ক্ল্যাপারক্ল, ক্যানিং স্ট্যানটস এবং লেস ওয়েউফস ম্যালাডেস-এর মতো কয়েকটি দল ফেমিনিস্ট কমেডি তৈরি করে। বার্নট ব্রিজেস, হেসিটেট অ্যান্ড ডেমনস্ট্রেট এবং আন্তর্জাতিক ম্যাগড্যানিলা প্রজেক্ট-এর মতো নাট্যদলের ফেমিনিস্ট অভিনয়ের নান্দনিকতা নিয়েও অনেক ফেমিনিস্ট থিয়েটারের দল তৈরি করেছে। স্যাডিস্টা সিস্টার বলে একটি দল একাধারে ব্যান্ড ও অন্যদিকে থিয়েটার নিয়ে কাজ করেছে। মিসেস ওয়রথিংটন'স ডটারস বিংশ শতকের গোড়ার দিককার ফেমিনিস্ট নাটক উদ্ধার করায় বিশেষজ্ঞ ছিল। কিছু ফেমিনিস্ট নাট্যদল শুধুমাত্র মহিলা শ্রমিকদের নিয়ে সংগঠিত হয়েছিল। তাদের সমস্ত সদস্যই ছিল মহিলা। এই দলগুলির প্রত্যেকটি ভ্রাম্যমান ছিল। লন্ডনে এদের অভিনয়ের জায়গা ছিল দুটি : ওভাল হাউস ও অ্যাকশন স্পেস (দ্য ড্রিল হল)। এই আন্দোলনের গুরুত্ব বুঝে অনুদানের সংস্থাগুলি নাট্যদল ও হলগুলিকে অনুদান দিত।

ফেমিনিস্ট নাট্যকারের সংখ্যাও ক্রমশই বেড়ে যেতে থাকে। ফেমিনিস্ট থিয়েটারের দলগুলি ও লন্ডনের রয়াল কোর্ট থিয়েটারের মতো ফেমিনিস্ট নীতিবাদীরাও তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকে। লেখার ধারা থেকে ফেমিনিস্ট নাট্যকারদের বর্গিকরণ করাও শুরু হয়। যেমন, সোস্যালিস্ট ফেমিনিস্ট, রেভোলিউশনারি ফেমিনিস্ট, ব্ল্যাক ফেমিনিস্ট ইত্যাদি। এই সময়ের ফেমিনিস্ট লেখকরা হলেন ক্যারিল চার্চিল, সারা ড্যানিয়েলস, অ্যানড্রিয়া ডানবার, মার্সেলা

এভারিস্টি, পাম জেমস, ব্রাইওনি ল্যাভেরি, ডেবরা লেভি, জ্যাকি কে, লিজ লোচিভ, ক্লেয়ার ম্যাকিনটায়ার, রোনা মনরো, লুই পেজ, উইনসাম পিনক, ক্রিশ্চিনা রেইড, সু টাউনসেন্ড, মিচেলির্ন ওয়ান্ডর এবং টাইমবারলেক ওয়ারটানবেকার।

সম্প্রতি জুনি ডার নামে নরওয়ের এক বিখ্যাত অভিনেত্রী হেনরিক ইবসেনের ৬টি বিখ্যাত নারী-চরিত্র নিয়ে 'পুট অ্যান ঈগল ইন আ কেস' নামে একটি একক মঞ্চাভিনয় নিবেদন করেছেন। জুনি ডার হলেন বার্গেন ন্যাশনাল থিয়েটারের সদস্যা। তিনি অসলোর স্টেট আকাদেমি অব পারফর্মিং আর্টস থেকে অভিনয় সম্পর্কে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৮০-তে স্টেটস স্কলারশিপ পেয়ে পোলান্ডের গ্রতোস্কি থিয়েটার ল্যাবরেটরিতে শিক্ষালাভ করেন। ১৯৮৬-তে তিনি নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং নিউ ইয়র্কের অ্যাকটর'স স্টুডিওতে শেলি উইনটারসের সঙ্গো শিক্ষালাভ করেন। ১৯৮৯-তে ফুলব্রাইট ফেলোশিপ নিয়ে ফিমেল লেভেন্টস-এর পরিচালনায় গবেষণা করেন। তিনি শেক্সপীয়র থেকে ইবসেন পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের বিভিন্ন নারী-চরিত্রে অভিনয় করেন। ১৯৮৮ সালে তিনি প্রথম 'জোয়ান অব আর্ক' নাটকে একক নারী-চরিত্রে অভিনয় করেন।

জুনি নারীমুক্তি আন্দোলনকে শরিক করে নারী-চরিত্র চিত্রণে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। হেনরিক ইবসেন সম্পর্কে তিনি বলেন, 'হেনরিক ইবসেনই একমাত্র নাট্যকার যিনি প্রকৃতই নারীর মননশীলতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।' ১৯৮৯-তে ইবসেনের নারী-চরিত্রগুলি সম্বন্ধে তিনি ভাবনা-চিন্তা আরম্ভ করেন এবং 'ইয়েল'-এ প্রথম অভিনয় করেন। তারপর পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তিনি অভিনয় করেন। ইবসেনের নারীর চরিত্রগুলি স্বাভাবিক বলেই চরিত্র-চিত্রণে এবং দর্শকমনে প্রবেশ করানোর ব্যাপারে তিনি এতটা সার্থক। ইবসেনকেই তিনি কেন বাছলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে জুনি বলেন, 'ইবসেনের জটিল ও মুক্তিকামী নারী-চরিত্রগুলি গতানুগতিক সামাজিক কুসংস্কার, সামাজিক অত্যাচার মানতে রাজি নয়। তাদের এই অনমনীয় ব্যক্তিত্ব এবং বিশেষ করে নারী-আন্দোলন বা নারীজাগরণের চেতনার প্রকাশ ঘটানো আমার অভিনয়ের বিশেষ লক্ষ্য। তা ইবসেন ছাড়া সম্ভব নয়।'

জুনি ইবসেনের 'দ্য মাস্টার বিল্ডার'-এ হিলডে, 'হেড্ডা গ্যাবলার'-এ হিজ, 'আ ডল'স হাউস'-এ নোরা, 'দ্য লেডি ফ্রম দ্য সী'-তে এলিডার, 'দ্য গোস্টস' নাটকে 'মিসেস এলভিন এবং 'দ্য ভাইকিংস অব হেলজ ল্যান্ড'-এ জোর্ডিসের ভূমিকায় অভিনয় করেন।

জুনির অভিনয়ের বৈশিষ্ট্য হল, তিনি অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে দর্শকের সঙ্গো কথা বলেন। তাঁদের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দেন কিছু কিছু চিন্তা-ভাবনার প্রশ্ন। তাঁর অভিনয়ের আর একটি বিশেষত্ব হল, তিনি অভিনয় শুরু করেন উনিশ শতকের নরওয়ের পোশাকে। একসঙ্গো তিনটি পোশাক পরে অভিনয় করেন। একটার পর একটা পোশাক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলির পরিবর্তনও সাধিত করতে চেষ্টা করেন। চরিত্র পরিবর্তনের এই সংক্ষিপ্ত সময়টুকু উনি দর্শকদের সঙ্গো কথা বলেন বা তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন।

ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানেও অনেক নাট্যসংগঠন 'ফেমিনিস্ট থিয়েটার'-এ ব্রতী। উত্তর চব্বিশ পরগনার বাদু-তে 'জনসংস্কৃতি' নাট্য সংগঠনের তিরিশটি মহিলা নাট্যদল পশ্চিমবঙ্গা, ত্রিপুরা ও ঝাড়খণ্ডের গ্রাম ও মফস্বলে নারীমুক্তির সপক্ষে নাটক করে। তাঁদের একটি নাটকের নাম 'সোনার মেয়ে'। পণপ্রথা ও গার্হস্থ্য উৎপীড়নের বিরুদ্ধে রচিত এই নাটকটি অভিনয়ের সময় দর্শকদেবও নাট্যপ্রবাহের সঙ্গো সংযুক্ত করে নেয়। দর্শকরা নাট্য-কাহিনির এক অংশ হয়ে যান। নিজেদের খুঁজে পান। অভিনয় চলাকালীন আবেগের প্রাবল্যে হঠাৎ হঠাৎ প্রশ্ন করেন। বিতর্ক তোলেন। সমাধান বাতলান। পাথরপ্রতিমার একটি ঘটনার কথা বলি।

পাথরপ্রতিমায় এটি খুবই পরিচিত দৃশ্য : একটি রিক্সাভ্যানে করে গৃহবধূর মৃতদেহ শব-ব্যবচ্ছেদের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। 'জনসংস্কৃতি'র পাথরপ্রতিমার নাট্যদলটি পাঁচশ মহিলার সামনে নাটকটি অভিনয় করছে। মহিলা দর্শকরা নাটকে সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছেন, যেন নাটকের উপস্থাপিত সমস্যার সমাধানের সঙ্গো জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন জড়িত। নাটকের একটি দৃশ্যে পাত্রীকে দেখতে এসেছে পাত্রপক্ষ। চেহারা, শিক্ষা ও ঘরকন্যার কাজ দেখে পাত্রী বিবাহযোগ্যা কি না, তা পরীক্ষা করে দেখছে। কুড়ি বছরের এক গৃহবধূ দর্শকদের ভিতর থেকে উঠে এসে পাত্রপক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে নির্দিষ্ট অভিনেত্রীকে সরিয়ে দিয়ে পাত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তিনি পাত্রের পিতাকে বলেন, এটা গরুর হাট নয় যে, তারা পাত্রীর দাঁত ও চুল দেখতে চাইছে। এতে তারা পাত্রীকে অপমান করছে। পাত্রের পিতামাতা পাত্রীর পিতার সঙ্গো একদিকে সরে এসে শুরু করল দেনা-পাওনা নিয়ে দর কষাকষি। এইবার মেয়েটি প্রতিবাদ করল। বলল, সে পণ্য নয়। তাকে কেনা যাবে না। বয়স্করা বলল, 'এটা একটা সামাজিক প্রথা। পরিবারের সম্মানের প্রশ্ন এর সঙ্গো জড়িত। এটা ঐতিহ্যও বটে।' পাত্রীর চটজলদি উত্তর এল, 'সেক্ষেত্রে আমি এই পরিবারের কাউকে বিয়ে করতে পারব না।' এই কথা বলে সে প্রস্থান করল। এই নাটক যেখানেই মঞ্চস্থ হয়েছে, সেখানেই এই কুপ্রথার

বিরুদ্ধে মানুষ সরব হয়েছে। পণপ্রথাকে বর্জন করেছে।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে দিগম্বরপুরে। 'জনসংস্কৃতি'র একটি দল মদ্যপানের বিরুদ্ধে নাটক করছিল। অভিনয় চলাকালীন অভিনেতা ও দর্শক দুইপক্ষ এতটাই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে, নাটক শেষে তারা দলবদ্ধভাবে স্থানীয় সমস্ত ভাটিখানা সম্পূর্ণভাবে ভেঙে দেয়। এইভাবে কিছু কিছু নাটক আর নাটক থাকে না, সমাজের অনিষ্ট বেড়াজাল ভাঙার মাইলফলক হয়ে যায়। দিগম্বরপুরে নাটক এখন স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্বপ্ন এবং ইচ্ছা প্রকাশের মাধ্যম। নাটক এখানে সমাজের হাওয়াটাই পালটে দিয়েছে।

বাঙ্গালোরের মহিলা নাট্য-পরিচালক ও নাট্যশিক্ষক কিরতনা কুমার বহুদিন ধরে মঞ্চে শিশুদের যৌন-নির্যাতন নিয়ে কাজ করছেন। এই বিষয় নিয়ে তিনি 'মাই চিলড্রেন হু শুড বি রানিং থ্রু ভাস্ট ওপেন স্পেসেস' নামে একটি নাটকও মঞ্চস্থ করেছেন। কানাড়া ও ইংরাজি ভাষায় নাটকটির আটটি অভিনয় বাঙ্গালোরের মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়েছে। নাট্য-সমালোচক আরসিয়া সাত্তার এই নাট্য প্রযোজনার অভিঘাত সম্পর্কে লিখেছেন, 'যে দর্শকরা বেডরুম কমেডি ও সাংগীতিক নাটক দেখতে অভ্যস্ত, তাঁরা চোখের সামনে শিশুদের এই যৌন-নিপীড়ন দেখে প্রচণ্ড ধাক্কায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফেলেছেন। অস্বস্তিতে ছটফট করেছেন। ফিসফিস করে ক্রোধ প্রকাশ করেছেন।' নাটকটি কয়েকটি বিদ্রূপাত্মক স্লোগান দিয়ে শুরু হয় যেমন, 'সাইলেন্স ইজ গোল্ডেন', 'ইগনোরেন্স ইজ ব্লিস', 'সামথিংস আর বেটার লেফট আনসেইড', 'লেট ইট গো', 'প্রিটেন্ড ইট নেভার হ্যাপেনড'। কিরতনা কুমার এই নাটকটি নিয়ে একটি তথ্যচিত্র তৈরি করেছেন। এই চলচ্চিত্রের প্রযোজক এনজিও সংস্থা 'মাধ্যম' নারী ও শিশুদের নিয়ে কাজ করে। 'মাধ্যম'-এর পরিচালক মুনিরা সেন জানিয়েছেন, 'আমরা বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলিতে এই চলচ্চিত্রটি দেখাব।' স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'সংহিতা'-ও সংগঠিত ক্ষেত্রে যৌননিগ্রহের ওপর 'দ্য পলিটিক্স অব সাইলেন্স' নামে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছে।

১৯৭৯ সালে পাকিস্তানের জেনারেল জিয়া-উল হকের সামরিক একনায়কতন্ত্রের শাসনে বিভিন্ন ফতোয়া জারি হয়। কোপ পড়ে মেয়েদের নাচ ও নাটকের অনুষ্ঠানের ওপরেও। সেই অন্ধকার সময়ে দাঁড়িয়ে করাচিতে সীমা কিরমানি তৈরি করেন এক নাট্যদল 'তেহরিক-এ-নিসওয়ান'। 'তেহরিক' মানে আন্দোলন, আর 'নিসওয়ান' হল নারী। তেহরিক নাটক করে গ্রাম আর শহরতলিতে গিয়ে। শিল্পের আবরণে সামাজিক বার্তা পৌঁছে দেয় সাধারণ মানুষের কাছে। তাদের কাজ মূলত মেয়েদের ঘিরেই। যেমন মেয়েদের ওপর

শারীরিক অত্যাচার, উপযুক্ত বয়সের আগে বিবাহ না হওয়া, রোজগার করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর প্রয়োজনীয়তা।

২০০৪-এর ৭ মার্চ ইসলামাবাদের লাহোরে অনুষ্ঠিত হয় এক ভারত-পাক নাট্যোৎসব। বিষয় ভাবনার মূল কেন্দ্রবিন্দু 'নারী'। তাঁর যন্ত্রণা, তাঁর মুক্তি, নারীর বিরুদ্ধে তৈরি অন্যায় আইন, ঘরে-বাইরে তাঁর ওপর হওয়া অত্যাচার— এই সবকিছু নিয়ে এক মঞ্চে হাজির ভারত ও পাকিস্তানের নাট্যশিল্পীরা। 'নারী' যেহেতু এই উৎসবের মূল ভাবনা, সেহেতু নাটোৎসবের নামকরণ হয়েছিল 'জননী'। কলকাতার 'রঙ্গাকর্মী', অমৃতসরের 'রঙ্গোলি' ও 'মঞ্চ-রঙ্গামঞ্চ', চণ্ডিগড়ের 'কিচেন কথা'— ভারতের এই নাট্যদলগুলির মোট ছেষট্টি জন অভিনেতা-অভিনেত্রী এতে অংশ নেন। উৎসবে মোট আঠারোটি নাটক অভিনীত হয়। সবই নারীকেন্দ্রিক। নিজেদের বিশতম বার্ষিকী উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল পাকিস্তানের অজোকা থিয়েটার নাট্যগোষ্ঠী। সংস্থার প্রধান নাদিমের বক্তব্য, এই নাট্যোৎসব দু'দেশের নাট্যদল ও নাট্যকর্মীদের মধ্যে শুধু সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান ঘটিয়েছে তাই নয়, দু'দেশের নারী সংক্রান্ত বিষয় ও সমস্যাগুলিও একটি মঞ্চে সর্বসমক্ষে প্রকাশের সুযোগ পেয়েছে। এক সপ্তাহব্যাপী এই নাট্যোৎসবের অন্যতম আকর্ষণবিন্দু ছিলেন দুই বৃদ্ধা সহোদরা। তিরানব্বই বছরের স্বনামধন্যা অভিনেত্রী জহরা সেহগল ও তাঁর সাতাশি বছরের বোন উজরা বাট। ১৯৩০ সালে দুই বোন অভিনয় শুরু করেন। দেশভাগ তাঁদের আলাদা করে দেয়। জহরা রয়ে যান ভারতে, আর উজরা পাকিস্তানে। উৎসবে 'এক থি নানি' নাটকে তাঁরা একসঙ্গে অভিনয় করেন। ভারত-পাক নাট্যোৎসব, যেখানে বিষয়-ভাবনা জুড়ে রয়েছে নারী, এমন একটা মুহূর্তে দেশভাগে আলাদা হওয়া দুই নারীর একত্রে মঞ্চে অবতারণা, এর থেকে ভালো আর কী হতে পারে?

॥ ৬॥

নয়া তৃতীয় সহস্রাব্দে তিন শতকব্যাপী ফেমিনিস্ট আন্দোলন কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে? ১৯১০-এর ৮ মার্চকে 'বিশ্ব নারীদিবস' বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। এদিন আমেরিকার কাপড়ের কলগুলির নারী মজুরেরা কাজের নির্দিষ্ট সময়সীমা, ন্যূনতম মজুরি, নারীদের ও কালো মানুষদের জন্য ভোটাধিকার ইত্যাদি দাবি নিয়ে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তাঁদের সম্মান জানাবার জন্য সমাজতন্ত্রী নেত্রী ক্লারা জেটকিন ৮ মার্চকে 'বিশ্ব নারীদিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাব করেন এবং সে প্রস্তাব মেনে নেওয়া হয়। ১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জ 'নারীবর্ষ' ঘোষণা করেছিল। ১৯৮০, ১৯৮৫, ১৯৯০, ১৯৯৫ সালে কোপেনহেগেন, মেক্সিকো,

নাইরোবি ও বেজিংয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের 'বিশ্ব নারীসম্মেলন' হয়েছিল। ২০০৫-এ নিউইয়র্কে চলেছে 'বেজিং-১০'-এর মূল্যায়ন। এত সব উদ্যোগের পর মেয়েদের অবস্থা কি কিছুটা বদলেছে? তিন দশকে নারী-আন্দোলন সংখ্যাগরিষ্ঠ মেয়েদের কাছে পৌঁছতে পেরেছে কি? কতটা কাছে?

একথা অনস্বীকার্য যে, এই সুদীর্ঘ পথ চলতে চলতে নারী-আন্দোলন বহু বাধা পেরিয়ে এঁসেছে। অনেক সাফল্যও তার সংগ্রহে। শিক্ষা, ভোটাধিকার, আর্থিক স্বয়ম্ভরতা, আইনের চোখে পুরুষের সমমর্যাদা, আপন জীবনসঙ্গী নির্বাচনের স্বাধীনতা— এসবই নারী প্রগতির সূচক, নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সমাজের উচ্চতম স্তরে মেয়েরা এখন যথেষ্ট স্বাধীন, আত্মনির্ভর। শিক্ষায়, মর্যাদায় তারা পুরুষের সমকক্ষ। ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং, বিজনেস অ্যাডনিমিস্ট্রেশন, অধ্যাপনা ইত্যাদি পেশায় নারীর সংখ্যা অনেক গুণ বেড়েছে। সৈন্যবাহিনী, বিমানচালনা, ফায়ার ব্রিগেডের কাজেও নারী যোগদান করেছে প্রবল উৎসাহে। সব দেশেই অর্থনীতি আরও বেশি 'পরিবেষা শিল্প' ও 'উচ্চ প্রযুক্তি শিল্প'-নির্ভর হতে চলেছে। ভবিষ্যতে আরও বেশি মহিলাকর্মীকে দেখা যাবে এইসব কাজে। কারণ এইসব কাজে নারী-পুরুষের শারীরিক পার্থক্যের কোনও প্রশ্ন ওঠে না।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার নারীদের উন্নতির জন্য অজস্র পরিকল্পনা নিয়েছে। না॰॰রকম সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে মেয়েরা। গৃহীত হয়েছে 'সম কা॰॰ সম বেতন' নীতি। ভোটাধিকার তো আগাগোড়াই ছিল, সবেতন মাতৃত্বের ছুটি এখন মেয়েদের হকের পাওনা। অসহায় মেয়েদের জন্য তৈরি হচ্ছে হোম, হাতেকলমে কাজ শিখিয়ে মেয়েদের স্বনির্ভর করে তুলছে নানা সংস্থা। সন্তানের অভিভাবক হিসেবে বাবার বদলে মায়ের নাম ব্যবহারেও এখন আর আইনি বাধা নেই। সহবাস করলে বিয়ে করতে বাধ্য করা হচ্ছে ছেলেদের। ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯৪ ধারা এবং ৫০৯ ধারা অনুযায়ী যৌননিগ্রহের শাস্তি হয়। এর সঙ্গে 'বিশাখা নির্দেশাবলি' যোগ হয়ে এই আইনকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছে। ঘরোয়া অত্যাচার সংক্রান্ত সমস্যা, কর্মক্ষেত্রে যৌনহেনস্থা প্রতিরোধ সংক্রান্ত পরামর্শ ও সাহায্য দেওয়ার জন্য তৈরি হয়েছে অজস্র নারী সংগঠন। যেমন— নারী-নির্যাতন প্রতিরোধ মঞ্চ, স্বয়ম, লহরী, সচেতনা, সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, সংহিতা, সংলাপ, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন, লিগাল এড সার্ভিসেস, শ্রমজীবী মহিলা সমিতি, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, উইমেন্স গ্রিভান্স সেল, স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী, প্রগতিশীল মহিলা সমিতি, উইমেন্স সহযোগ, প্রতিবিধান, মহিলা পাঠচক্র, মহিলা গবেষণা কেন্দ্র, ল্যাম্প ইত্যাদি।

কেন্দ্রীয় সরকার ২০০১ সালকে মহিলাদের 'ক্ষমতায়ন বর্ষ' বলে ঘোষণা করেছে। কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ পর্ষদ ২০০১ সালের মহিলাদের জন্য সর্বোচ্চ জাতীয় পুরস্কার 'ড. দুর্গাবাই দেশমুখ পুরস্কার' দিয়েছে দিল্লির বেসরকারি সংস্থা 'সেবা ভারতী'কে। পুরস্কারের আর্থিক মূল্য পাঁচ লক্ষ টাকা। কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ বিভাগ দেশের গৌরব পাঁচজন দেশকন্যাকে দিয়েছে 'স্ত্রীশক্তি পুরস্কার'। প্রত্যেকে পেয়েছেন এক লক্ষ টাকা। 'স্ত্রীশক্তি' বলে একটি সংগঠনও আছে। এটি তৃণমূলের মহিলাদের শিক্ষিত করার, স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি করতে উদ্যোগী। চলছে স্ব-রোজগার যোজনা, কাঁথা সেলাই, আর হাতের কাজ। 'স্ত্রীশক্তি' তিনটি পুরস্কারও দেয়।

২০০৪-এর ২০ ডিসেম্বর মহিলাদের কল্যাণের লক্ষ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিল সংসদে পেশ করে কেন্দ্রীয় সরকার। এক, হিন্দু পরিবারের মেয়েরা পৈতৃক সম্পত্তিতে ছেলেদের সমান অধিকার পাবে। দুই, বাল্যবিবাহ রুখতে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যারা এই ধরনের বিয়ে দেবে অর্থাৎ পুরোহিত, আত্মীয়স্বজন প্রমুখের দু'বছর পর্যন্ত জেল এবং এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

১৯৯২ সালে তিয়াত্তরতম ও চুয়াত্তরতম সংবিধান সংশোধনী বিল পাসের ফলে ভারতে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিতে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত হয়েছে। বেশ কয়েকটি রাজ্যে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতে এক-তৃতীয়াংশের বেশি মেয়েরা নির্বাচিত হয়েছে। বর্তমানে ভারতবর্ষে দশ লক্ষ মহিলা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছেন। পশ্চিমবাংলায় এখন পুরোপুরি মহিলা পরিচালিত দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত আছে। পঞ্চায়েতে নির্বাচিত হওয়ার পর মেয়েদের সামাজিক অবস্থান বদলেছে। সমাজে তাদের গুরুত্ব বেড়েছে। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় পঁচিশটি দেশে মহিলাদের আসন সংরক্ষণের পদ্ধতি চালু হয়েছে। সবচেয়ে বেশিসংখ্যক নির্বাচিত মহিলা জনপ্রতিনিধি রয়েছে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলিতে। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং মোজাম্বিকেও এক-তৃতীয়াংশ মহিলা সংরক্ষণের আসন বিষয়টি চালু হয়েছে।

১৯৭০ সালে মহারাষ্ট্রের মুম্বই শহর থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরে 'আইনে' নামে একটি গ্রামে (এই অঞ্চলে তিনটি জনজাতির বাস) সর্বভারতীয় র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভানেত্রী ডক্টর ইন্দুমতি পারিখ বস্তিবাসিনীদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির উদ্দেশ্যে 'স্ত্রীহিতকারিণী' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। এই বস্তি অঞ্চলে ১,৩৫,০০০ স্ত্রী-পুরুষ বাস করে। সমাজের সব থেকে নিচুস্তরের অধিবাসী এখানকার মেয়েদের আত্মনির্ভর করে তোলাই এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ। পরিবার পরিকল্পনা, উপার্জনের জন্য নানারকমের কাজে নিপুণতা

অর্জনের ব্যবস্থা, ব্যাধি প্রতিরোধের শিক্ষা, শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের উপযোগী কর্মসূচি, মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার— এসবই এই প্রতিষ্ঠানের কাজ। বস্তিবাসিনীদের ভিতর থেকেও অনেকে এইসব কাজের দায়িত্ব নিয়েছেন।

সম্প্রতি বর্ষা কালে নামে এক মারাঠি মেয়ে 'উওম্যানিস্ট পার্টি' নামে একটি দল গড়ে তুলেছেন। এই দলটি পুরোপুরি রাজনৈতিক। বর্ষা কালে চান মহিলাদের জন্য, মহিলাদের দ্বারা সংগঠিত একটি পৃথক রাজনীতি। তিনি চান মেয়েদের জন্য একটি দল হোক। তারা নিজেদের সংগঠিত করুক, ভালো মতো বুঝুক, এবং নির্বাচনে নামুক। এই দলটি ভিক্ষুকের মতো সংসদ, বিধানসভা বা পঞ্চায়েতে ত্রিশ শতাংশ প্রমীলা আসন সংরক্ষণের দাবি ও আন্দোলনের আত্মাবমাননা বরদাস্ত করতে নারাজ। তাঁদের সোজাসাপটা কথা হল, 'আমরা সংসদ থেকে পঞ্চায়েত অবধি সর্বত্রই ভোটে নামব এবং আমাদের প্রার্থীদের জেতানোর চেষ্টা করব।' ১০,০০০ সদস্যা ইতিমধ্যেই উওম্যানিস্ট পার্টির নথিভুক্ত হয়েছে। আরও পাঁচলক্ষ নারী পা বাড়িয়ে আছেন।

বাঁকুড়া ও লাগোয়া বর্ধমানের ৮৫টি গ্রামের লোককে নিয়ে পণপ্রথার বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছে 'উত্তর বাঁকুড়া রায় সমিতি'। উত্তর বাঁকুড়ার রায় সম্প্রদায়ভুক্ত তফসিলি জাতিদের নিয়ে এই সমিতি গঠিত হয়েছে। এরা উত্তর বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড়, বড়জোড়া, শালতোড়া, সোনামুখী বা বর্ধমানের কাঁকসা, পোক্তানগরের গ্রামে গ্রামে পণপ্রথা মুছে দিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। বধূ-নির্যাতনের ঘটনা ঘটলেও সেক্ষেত্রে সমিতি সঙ্গে সঙ্গে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে।

মণিপুরে মনোরমার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যে ধরনের মহিলা আন্দোলন চলছে, যেভাবে মণিপুরের মেয়েরা প্রতিবাদ করছে, সেটি নারীবাদী ইতিহাসে একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। নারীবাদের অন্যতম স্তম্ভ 'বডি পলিটিক্স'-এর যথার্থ বাস্তব প্রয়োগ।

২০০৪-এ স্পেনের বার্সিলোনায় এক ধর্মীয় মুসলিম নেতা 'উইমেন ইন ইসলাম' নামে একটি পুস্তকে স্ত্রী-নির্যাতনের সপক্ষে সওয়াল করেন। তাতে স্বামীকে তিনি স্ত্রী-শাসনের ঢালাও অধিকার দেন। স্পেনের আদালত তাঁকে পনেরো মাসের জন্য কারাগারে পাঠিয়েছে। আদালতের রায়, 'আধুনিক যুগে গণতন্ত্র, সমানাধিকার এবং মানবাধিকার যখন সভ্যতার আদর্শ, আমরা তখন মধ্যযুগের বিধিবিধান মেনে নিতে পারছি না। সুতরাং নারী-বিদ্বেষ এবং নারী-নিগ্রহের প্রচারক হিসেবে তোমার অপরাধ আইন মোতাবেক দণ্ডনীয়।

বাংলাদেশে ১৯৮৭-তে নারীপক্ষ, রূপান্তর, নারী প্রগতি সংঘ, নারী সংহতি ইত্যাদি সমমনা চৌদ্দটি সংগঠন নিয়ে নারীর সমানাধিকারের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজ গড়ে উঠেছে। এই সংগঠন তাদের সতেরো দফা কর্মসূচিতে উল্লেখ করেছে— নারী-নির্যাতন, শোষণ ও বৈষম্য দূর করার উপযোগী সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিবেশ ও শাসননীতি ছাড়া নারীর সম-অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তবে বাংলাদেশে বেগম রোকেয়াই প্রথম মহিলা যিনি মুসলমান পরিবারের পর্দাপ্রথা ও ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়েছিলেন। 'স্ত্রী-জাতির অবনতি' নামক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, 'আমাদের যথাসম্ভব অধঃপতন হওয়ার পর দাসত্বের বিরুদ্ধে কখনও মাথা তুলিতে পারি নাই। তাহার প্রধান কারণ এই বোধহয় যে, যখনই কোনও ভগ্নী মস্তক উত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছিল, তখনই ধর্মের দোহাই বা শাস্ত্রেব বচনরূপে অস্ত্রাঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে।'

বেগম রোকেয়া তাঁর 'পদ্মরাগ' নাটকে সিদ্দিকার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, 'বিবাহ ও সংসারধর্মই জীবনের সারমর্ম নহে।' তিনি আরও বলেন, 'যে পর্যন্ত পুরুষগণ শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদের প্রাপ্য অধিকার দিতে স্বীকৃত না হয়, সে পর্যন্ত তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষাও দিবে না। যাহারা নিজের সমাজকে উদ্ধার করিতে পারিতেছে না, তাহারা আর দেশোদ্ধার কিরূপে করিবে? অর্ধাঙ্গিনীকে বন্দি রাখিয়া নিজে স্বাধীনতা চাহে, এরূপ আকাঙ্ক্ষা পাগলেরই শোভা পায়।' বাংলাদেশের আর এক নারীবাদী নেত্রী বলেছেন, 'আমাদের দেশের নারীরা শুধু বঞ্চিত ও লাঞ্ছিতই নয়, তারা প্রতারিত।'

॥ ৭॥

অন্যদিকে কিন্তু এখনও বহাল তবিয়তে চলছে নারীদের ওপর সীমাহীন উৎপীড়ন, অবিচার, অনাচার। ফেমিনিস্ট আন্দোলন তার কোনও পরিবর্তনই ঘটাতে পারেনি। বিষধর সাপের বিষ সদা সর্বদা ধাবমান নারীসমাজের দিকে।

ফ্রান্সে, বেলজিয়ামে, ব্রিটেনে ও ইতালিতে মহিলা সাংসদ মাত্র যথাক্রমে ১.৭ শতাংশ, ২.৮ শতাংশ, ২.৯ শতাংশ ও ২.৯ শতাংশ। নারীরা বিশ্বের মোট কাজের দুই-তৃতীয়াংশ কাজ করে, তবু তারা মোট আয়ের মাত্র ৫ শতাংশ উপার্জন করে এবং বিশ্বে মোট সম্পত্তির ১ শতাংশেরও কম মালিকানা ভোগ করে। প্রতিটি অর্থনীতিতেই মেয়েরা বিশেষ ভূমিকা পালন করে, কিন্তু তাদের শ্রমের সঠিক মূল্যায়ন করা হয় না। তাদের শ্রম অদৃশ্যই থেকে যায়।

আমেরিকায় এখন ৬৫ শতাংশ বিবাহিত স্ত্রীলোক কাজ করে। কিন্তু সেখানে

পুরুষকর্মী ও মহিলাকর্মীর মধ্যে বেতনের হারে ৩৫ শতাংশ বৈষম্য রয়েছে। পুরুষ গড়ে পায় ১০০ ডলার, মহিলা পায় ৬৫ ডলার। ১৯৮২ সালে আমেরিকায় শাসনতন্ত্রের 'ইকুয়াল রাইটস অ্যামেন্ডমেন্ট'-এর পরাজয়ে সেখানে নারীমুক্তি আন্দোলন থমকে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকায় এখন গরিবদের মধ্যে নারীর সংখ্যা বেশি। আজকের বুশ দেশে কর্মসংস্কৃতিহীন নারীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এরই মধ্যে যারা কাজ পাচ্ছে, পুরুষদের তুলনায় তাদের মজুরি এক-তৃতীয়াংশ বা তারও কম।

'ওয়াইফ ব্যাটারিং' আজ আমেরিকা ও সভ্য দুনিয়ার অন্যত্র স্বীকৃত ও ধিক্কৃত এক ঘটনা। কয়েক বছর আগে আমেরিকার 'টাইম' ম্যাগাজিন এসব নিয়ে একটি 'কভার স্টোরি' প্রকাশ করেছিল। পুরুষ যে নারীর ওপর কতভাবে শারীরিক অত্যাচার চালাতে সক্ষম, তা না পড়লে কল্পনা করা শক্ত। 'ম্যারিটাল রেপ' থেকে শুরু করে জলন্ত সিগারেটের ছেঁকা, কোমরের বেল্টকে চাবুক হিসেবে ব্যবহার করা— শিক্ষা, আর্থিক সঙ্গতি, বাহ্যিক সভ্যতা— অত্যাচারের পক্ষে কিছুই প্রতিবন্ধক নয়। একজন নারীবাদী পশ্চিমি মেয়েদের বিবাহ-পরবর্তী জীবনকে আখ্যা দিয়েছেন, 'আ হারেম অব ওয়ান'।

এটিও খুব আশ্চর্য বিষয় যে, কমিউনিস্ট আন্দোলন নারী-পুরুষের সমতার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও কমিউনিজমের একদা পীঠস্থান প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নেই নারী-স্বাধীনতার বাস্তব প্রয়োগ অনেক পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় কম ছিল। সোভিয়েত শাসনতন্ত্রে লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্যমূলক ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল বটে, কিন্তু সব জীবিকার ক্ষেত্রেই মহিলাকর্মীদের স্থান ছিল না। যে আহ্বান মহাভারতে ভীষ্ম করেছিলেন, 'যে সমাজে নারীরা সম্মান পায় না, যে সমাজে মেয়েরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, সে সমাজের শোভা নেই, বুদ্ধি নেই, সৌন্দর্য নেই'— সেই আহ্বানই শোনা গিয়েছিল লেনিনের মুখে, 'কোনও দেশের মুক্তিআন্দোলনই সফল হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ হিসেবে নারীসমাজও তার অংশীদার হয়ে উঠছে এবং তাদের মুক্তিসংগ্রামও বৃহত্তর মুক্তিসংগ্রামের অংশ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে।' তিনি আরও বলেছিলেন, 'অর্ধেক জনসংখ্যা যদি রান্নাঘরে কারারুদ্ধ থাকে, আমরা স্বাধীন বলি কী করে?' অথচ লেনিনের অনুগামীদের পার্টির পলিটব্যুরোর আশি বছরের ইতিহাসে কোনও মহিলাকে সভ্যপদের যোগ্য বলে মনে করা হয়নি। ঘটনা হল, সোভিয়েত পলিটব্যুরোতে কোনও দিন কোনও মহিলা প্রতিনিধি ছিলেন না। ক্রুশ্চেভের সময় সোভিয়েত সরকারে একমাত্র নারী প্রতিনিধি ছিলেন মাদাম ফুৎসভা।

যে মাও জে দং বলেছিলেন, 'আকাশের অর্ধেক তুলে ধরে আছে নারী', সেই

চীনে 'গ্যাং অব ফোর'-এর চিয়াং চিং বিদায় নেওয়ার পর কোনও নারীই কমিউনিস্ট পার্টির উঁচু মহলে নেই। মাওয়ের অনুগামীদের পার্টি কংগ্রেসের নব নির্বাচিতদের ছবি যখন দূরদর্শনের পর্দায় প্রচারিত হয়, তখন দেখা যায়— পুরুষ, একদল পুরুষ— নারী নেই।

উত্তর কোরিয়া বা ভিয়েতনামেও পলিটব্যুরোয় মেয়ে নেই। কিউবায় অবশ্য আছেন সনিয়া ভাস্কেজ। ভারতে আট লক্ষ পার্টি সদস্যের সর্বোচ্চ কমিটির একমাত্র মহিলা প্রতিনিধি এক লক্ষ মহিলা সদস্যের চোখের মণি বৃন্দা কারাত।

আফগানিস্তানে সোভিয়েত রাশিয়া পরিচালিত নাজিবুল্লার শাসনকালে মেয়েরা কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিল। শিক্ষা, কারিগরী প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে অগ্রগতি দেখা দিয়েছিল। ৭০ শতাংশ শিক্ষকতার চাকরি মেয়েদের দখলে ছিল। এমনকি সোভিয়েত সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মোজাহিদিনদের আন্দোলনে মেয়েরা যোগ দিচ্ছিল। সোভিয়েত রাশিয়া ১৯৮৯ সালে আফগানিস্তান থেকে তার সেনাবাহিনী দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার পরই শুরু হয় বিভিন্ন ইসলামি দলগুলির মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। সেই সময় রাজধানী কাবুল শহরকে বলা হত 'সিটি অব উইডো' অথবা বিধবাদের শহর। ১৯৯৬-এ তালিবানেরা রাজধানী কাবুল দখলের পর মেয়েদের চলাফেরা, লেখাপড়া, জোরে হাসা বা কথাবার্তা বলার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। অসুস্থতার জন্য পুরুষ ডাক্তার দেখানো নিষিদ্ধ হয়। সহায়-সম্বলহীন বিধবারা সন্তানদের মুখে খাদ্য তুলে দিতেও অক্ষম হয়। সরকারি নির্দেশে মেয়েদের কাজ নেই, স্কুল-কলেজে যাওয়া বন্ধ। মেয়েদের সামনে ভিক্ষাবৃত্তি ও পতিতাবৃত্তি ছাড়া আয়ের কোনও পথ নেই। তালিবানের ফতোয়া জারি হওয়ার পর অনেক মেয়ে আত্মহত্যা করে। অনেকে পাকিস্তান, ইরান ও অন্য প্রতিবেশী দেশে উদ্বাস্তু হিসেবে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। পাকিস্তানের পেশোয়ার শহরে আফগান উদ্বাস্তুদের নিয়ে একটি তথ্যচিত্র তুলেছেন লস এঞ্জেলেসের সিনা নানজি। গবেষণার প্রয়োজনে অনেক নারীর সাক্ষাৎককার নিতে গিয়ে জানতে পারেন তালিবান শাসনে কাবুল শহরে নারীদের দুঃসহ জীবনের কথা। কাবুলের পথে বোরখাপরা নারীদের দেখে সিনা নানজির অভিমত, 'বোরখা যেন কোনও পোশাক নয়, রক্ত-মাংস আবেগ অনুভূতিসম্পন্ন একজন নারীকে বস্তুতে পরিণত করে রাখার প্রচেষ্টায় এ যেন এক আবরণ।'

১৯৯৩-এ পূর্বতন যুগোস্লাভিয়া গৃহযুদ্ধের সময় বসনিয়া ও হার্জেগোভনিয়া রাজ্যে যুদ্ধের পরিকল্পিত কায়দা হিসেবে ২০ থেকে ৭০ হাজার মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়েছিল। আমেরিকার সর্বোন্নত সভ্য ও উন্নত দেশে প্রতি বছর ৫ লক্ষ মেয়ে ধর্ষিত হয়। ইউ. এন. রিপোর্ট অন দ্য কমিশন অন দ্য স্ট্যাটাস অব

উইমেন'-এর তথ্য অনুযায়ী, পৃথিবীতে ৩ জনের মধ্যে একজন মেয়ে তাঁদের জীবনকালে কোনও না কোনও সময় যৌনভাবে অবমানিত হয়েছেন। ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত রেড ক্রশের ইন্টারন্যাশনাল কমিটি প্রকাশিত রিপোর্টে জানা যায়, যুদ্ধের সময় ইন্দোনেশিয়া, কাম্বোডিয়া, হাইতি, লাইবেরিয়া, পেরু, সোমালিয়া, উগান্ডা, বসনিয়া, হারজেগোভনিয়ার ৩০ হাজার মহিলা ধর্ষিতা হয়েছে। ওয়ার্ল্ড হেলথ অরগানাইজেশন-এর ১৯৯৭-এর রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, সারা পৃথিবীতে ১ কোটি ৩০ লক্ষ মেয়ের ভগাঙ্কুর কেটে দেওয়া হয়েছে। 'দ্য ফ্যাক্ট বুক অন গ্লোবাল সেক্সুয়াল এক্সপ্লয়টেশন'-এর ২০০০ সালের তথ্য অনুযায়ী, প্রতি বছর ১০ লক্ষ স্ত্রীলোক ও মেয়ে-শিশুদের নিয়ে অবৈধ ব্যবসার কাজে আদান-প্রদান করা হয়। এইসব স্ত্রীলোক ও মেয়েদের ব্যবহার করা হয় কম মজুরিতে কারখানায় খাটানোর জন্য, বাড়িতে দাসীবৃত্তি করার জন্য এবং গণিকালয়ে দেহ-ব্যবসার জন্য।

ভারতে নারীদের অবস্থাও খুবই শোচনীয়। সহমরণের কথাই ধরা যাক। 'সতীদাহ' আইন বলবৎ থাকা সত্ত্বেও এই বীভৎস অমানবিক প্রথার আবার পুনরুজ্জীবন হল। ১৯৫৭-তে রাজস্থানে সতী হল রূপ কানোয়ার। লক্ষ লোকের সামনে সে পুড়ে মরল। একটি লোকেরও শাস্তি হল না। ১৯৯৯-এ উত্তরপ্রদেশে চরণ শাহ সহমরণে গেল। ২০০২-এ গুট্টুবাই ভারতের তৃতীয় সতী হল। সতীস্থল ঘিরে মেলা ও জনসমাগম হল, উৎসব হল। ১৯৮৩-তে সতীদাহ প্রথার সমর্থনে দিল্লি শহরে 'রানি সতী সর্ব সংঘ' পরিচালিত নারী-পুরুষের বিরাট মিছিল হল। কলকাতায় বড়বাজারে 'সতী' রূপ কানোয়ারের নামে জয়ধ্বনি করে মিছিল পথপরিক্রমা করল। কেউ প্রতিবাদ করল না।

শাহবানু মামলায় আমরা কত আশা করে তাকিয়েছিলাম, যদি মুসলমান মেয়েদের দুর্বিসহ অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়। কিছুই হল না। ধর্মীয় অস্তিত্বের নামে 'মুসলিম পার্সোনাল ল' প্রাচীর হয়ে দাঁড়াল। সংগঠিত ধর্মতন্ত্রের হাতে নারীর অধিকার বিপন্নই হয়ে রইল। সত্যি, ভারতীয় মুসলিম নারী সমাজের মতো হতভাগ্য বোধহয় খুব কম দেশেই আছে। এরা সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাগরিক হয়েও আত্মসমর্পণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রণীত আইনের বাইরে। সেখানে মধ্যযুগীয় অনুশাসনই শেষ কথা বলে। অথচ সবাই জানে, 'অভিন্ন দেওয়ানিবিধি' প্রবর্তনই মুক্তির উপায়।

ভারতের মোট জনসংখ্যার ১৬.৩ শতাংশই দলিত। দলিত মহিলাদের ক্ষেত্রে সমস্যা আরও তীব্র। তারা ত্রিমুখী আক্রমণের শিকার। লিঙ্গ-বৈষম্য, জাত-বৈষম্য এবং শ্রেণী-বৈষম্য। বাস্তব সত্য হল, সমাজের নিম্নস্তরের অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত

বা আদিবাসী সমাজে অবস্থা একটুও পালটায়নি। এখনও সেখানে কন্যাভ্রূণ-হত্যা হচ্ছে। মেয়ে-সন্তান অবজ্ঞা পাচ্ছে। কুকুরের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হচ্ছে। বাম ও দক্ষিণ, উভয় রাজনৈতিক দলের নেতারা সেইসব বিয়েতে ভুরিভোজ করছেন ভোটারদের হাতে রাখতে। আদিবাসী এলাকা গ্রামে বা হাটে প্রায়ই দেখা যায় কাজ না পেয়ে আদিবাসী মেয়েরা চোলাই মদ বা হাড়িয়া বিক্রি করছে। পুরুষরা কাজ না পেয়ে সারাদিন মদ খাচ্ছে। মদের টাকার জন্য বউকে মারছে।

ভারতীয় সমাজে পণপ্রথার প্রকোপ বেড়েই চলেছে। অধুনা তার বহুমুখী প্রসার ঘটেছে। একদিকে যেসব অঞ্চলে আগে পণ আদায়ের প্রাদুর্ভাব কম ছিল, এখন সেইসব অঞ্চলেও পণপ্রথা ব্যাপক হয়েছে।

ভাবতে অবাক লাগে, ভোপালের কাছে বৈরাগড়ে 'মঞ্জু সংস্কার কেন্দ্র'-র মতো বিদ্যালয়ের জন্ম হয়েছে। ওই বিদ্যালয়ে অয়ল দাস হেমনামি নামে একজন শিক্ষক তরুণীদের শেখাচ্ছেন ভালো পুত্রবধূ হওয়ার মন্ত্র। তাঁর বচন : 'মেয়েরা একমাত্র তখনই স্বর্গে যেতে পারে যদি তাবা তাদের সত্তাকে মেরে ফেলে অন্যের জন্য বাঁচে এবং স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ির সেবাকে তার জীবনের ব্রত করে তোলে।' একই কণ্ঠস্বর শুনি দূরদর্শনের হিন্দি ধারাবাহিক 'কাহানি ঘর ঘর কি'র নায়িকা পার্বতীর মুখে, 'আমার নিজের কোনও পরিচয় নেই। আমার স্বামী-শাশুড়ি, ভাসুর-দেওর এরাই আমার অস্তিত্ব। একথা সত্যি যে, তারা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু কীভাবে আমি তাদের ভুলে যাব। তাদের প্রিয় .দ রান্না আর আমার শাশুড়ির চরণসেবা করাতেই আমার আনন্দ।'

যদিও আঠারো বছর আগে কন্যা-সন্তানকে বিবাহ দেওয়া আইনত দণ্ডনীয় বলে ঘোষণা করে ১৯২৯-এ 'শিশু-বিবাহ নিবারণী' আইন (৩৭৫ ধারা) প্রণীত হয়েছে এবং অনুর্দ্ধ পনেরো বছরের স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে তা ধর্ষণ বলে পরিগণিত হবে বলে আদালত ঘোষণা করেছে, তথাপি পশ্চিমবঙ্গে এই মুহূর্তে সরকারি একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, ৭০ ভাগ মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায় প্রাপ্তবয়স্ক আঠারো বছর হওয়ার অনেক আগেই। তার মধ্যে ৬০ ভাগ মেয়েই গর্ভবতী হয়ে পড়ে ১৫ বছর বয়সেই। নাবালিকা অবস্থায় মা হওয়ার কারণে প্রসবকালীন সময়ে মায়েদের দেদার মৃত্যু ঘটে। না হয় তারা রক্তাল্পতার শিকার হয়। সন্তান হলেও সে সুস্থতা পায় না। তার মৃত্যুও বেশ ঘটে।

পশ্চিমবাংলায় ও বাংলাদেশে নারীপাচারের ঘটনা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। প্রতি বছর এক লক্ষ নারী এই দুই দেশ থেকে বিদেশে পাচার ও বিক্রি হয়। গ্রামের নিম্ন শ্রেণীর মহিলাদের আর্থিক অভাবের সুযোগে এক শ্রেণীর অসামাজিক মানুষ গরিব ঘরের অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে ও অসহায় মহিলাদের টাকার লোভ দেখিয়ে

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ও মধ্যপ্রাচ্যে বিক্রি করে দিচ্ছে। নারীপাচারের সাথে সাথে শিশুকন্যা পাচারের হারও বাড়ছে। 'সেক্স ট্যুরিজম'-এর আগ্রাসনে বিদেশি পর্যটকদের কাছে বালিকাদের চাহিদা ক্রমবর্ধমান। এই চাহিদার যোগান দেওয়ার জন্য মূলত অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল পরিবারগুলি থেকে সংগৃহীত হচ্ছে ১০ থেকে ১৫ বছরের শিশুকন্যারা।

দিল্লির 'সাক্ষী' সংস্থা একটি সমীক্ষায় দেখেছে, ১৮ কোটি ভারতীয় নারী দু'বেলা খেতে পায় না। শতকরা ৫০ জন মেয়ে নানা বয়সের পুরুষ কর্তৃক যৌননিগ্রহের শিকার হয়। যে সমস্ত মহিলা কার্যোপদেশে রাস্তায় বের হন, তাদের মধ্যে শতকরা ৮৮ জন যৌন-নিগ্রহ বা অশালীনতার শিকার হন। শিশুকন্যারাও যৌন-নিগ্রহ থেকে রেহাই পায় না। যে যৌন-নিগ্রহ একজন পূর্ণবয়স্কা নারীর ওপর হয়, সেই নিগ্রহের শিকার হয় শিশুকন্যাও। ভারতে এখন বারবণিতার সংখ্যা ২০ লক্ষ। এদের সুস্থ জীবনে ফিরে যাওয়ার কোনও ব্যবস্থাই নেই। আকাশের নিচে ফুটপাতে বাস করে ৫০ লক্ষ নাবালিকা। গর্ভাবস্থায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেওয়ায় বা নির্যাতন করায় প্রতিদিন ৩০০ মহিলা মারা যায়। মেয়ে-শিশুহত্যা, মেয়ে-ভ্রূণহত্যা, অবহেলা এবং কন্যা ও মায়ের পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে প্রতি বছর ২ কোটি ৩০ লক্ষ মেয়ে মারা যায়। ১৯৯৭ সালে 'ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো'র প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে, নারীর ওপর—

প্রতি ৪ মিনিট অন্তর একটি করে বিচারযোগ্য অপরাধ ঘটে।
প্রতি ১৪ মিনিট অন্তর একটি করে বধূ-নির্যাতনের ঘটনা ঘটে।
প্রতি ১৭ মিনিট অন্তর একটি করে মহিলার ওপর শ্লীলতাহানি হয়।
প্রতি ৩৩ মিনিট অন্তর একটি করে নারী অপহৃত হয়।
প্রতি ৩৪ মিনিট অন্তর একটি করে নারী ধর্ষিত হয়।
প্রতি ৮৭ মিনিট অন্তর একটি করে পণের কারণে বধূহত্যা হয়।
প্রতি ৯০ মিনিট অন্তর একটি যৌন-নিপীড়ন হয়।

বাংলাদেশে মেয়েরা এত বেশি হিংসাত্মক ঘটনার শিকার হচ্ছে যে, সুরক্ষার খাতিরে কমবয়সী মেয়েদের মধ্যে বোরখা পরার চলন হঠাৎ বেড়ে গেছে। রাজধানী ঢাকাই হোক, বা অন্য কোনও জেলা, রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ, অফিস, বাজার, সর্বত্রই বোরখা-ঢাকা চেহারা চোখে পড়বে। অনেকের মুখও ওড়নায় ঢাকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতন্ত্র বিভাগের অধ্যাপক আল মাহবুবউদ্দিন আহমেদ ও শেখ শহিদুল্লাহের বিশ্লেষণ হল, সামাজিক বঞ্চনা আর অবিচার মেয়েদের আরও প্রাচীনপন্থী ও একগুঁয়ে করে তুলেছে। তারই প্রতিফলন ঘটেছে বোরখার এই আধিপত্যে।

॥ ৮ ॥

নারী, তুমি কেমন আছ? রাষ্ট্রসংঘ সেই ১৯৫২ সাল থেকে খোঁজার চেষ্টা করছে এই প্রশ্নের উত্তর। নারীদের ভালো থাকার জন্য বাতলাচ্ছে দাওয়াইয়ের পর দাওয়াই। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে নারীদের অবস্থা যেই তিমিরে সেই তিমিরেই। বেজিং সম্মেলনের স্লোগান ছিল, 'নারীর চোখ দিয়ে পৃথিবীকে দেখুন'। ১৮৩টি দেশের সঙ্গে ভারতও গলা মিলিয়েছিল সেই স্লোগানে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। নারীর চোখ দিয়ে পৃথিবীকে তার দেখা হল কই? এখনও ছেলেরা বিয়ে করে, আর মেয়েদের 'বিয়ে দেওয়া হয়'। নয় কি? এখনও আঁস্তাকুড় থেকে কুড়িয়ে পাওয়া সদ্যোজাত শিশুরা প্রায় সবাই মেয়ে হয়। নয় কি?

নারী, তুমি কেমন আছ? এর উত্তর কি তোমারই জানা আছে? জানি, পুরুষতন্ত্রের হাজারো চোখ। লক্ষ কারসাজি। কখনও সে প্রচারের ছলনায় ভোলায়। কখনও পেশী দেখায়। কখনও সে প্রতারক। কখনও সে হন্তারক। তবে নারী, তুমিই বা দায়িত্ব এড়িয়ে যাও কীভাবে? সমস্তরকম প্রচার-মাধ্যমের বিজ্ঞাপনে, চলচ্চিত্রে, দূরদর্শনে খোলামেলা নারী শরীরের অবাধ প্রদর্শন, শরীরী বিভঙ্গে মোহিনী সাজা, দেহ দেখিয়ে উপার্জন, দেহ ভাঙিয়ে সুবিধা আদায়— নারী, তুমি এসব বেমালুম মেনে নিচ্ছ! নিচ্ছ তো? নিজেকে পণ্য করে তুলছ। তুলছ তো? তন্ত্রমন্ত্র, শাস্ত্রের বিধান, গুরুদেব-দীক্ষা, শিবরাত্রি— অচলায়তন সমাজের এসব চিরাচরিত বিধান তুমি স্বেচ্ছায় পালন করো। করো তো? যেসব অনুশাসন একদিন পুরুষ নারীর ওপর জোর করে চাপিয়ে দিয়েছিল, তুমি নিজেই সেসব অনুশাসন মানতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছ। মানতে মানতে তুমি আজ এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছ, যখন এই সমস্ত অনুশাসন সংস্কারের মতো তোমার জীবনের অঙ্গ হয়ে পড়েছে। আজ তুমি নিজেই সেইসব অনুশাসনের বড় সমর্থক। তোমার ভিতরের এই পরাধীনতা না ঘোচাতে পারলে বাইরের মুক্তির কোনও সম্ভাবনা নেই। অসম্মান ও হীনম্মন্যতার বিরুদ্ধে বুখে না দাঁড়ালে পূর্ণ মানুষের মর্যাদা আদায় করা যায় না। প্রকৃত আত্মমর্যাদাবোধই প্রতিষ্ঠিত করে স্বাধিকারকে। শুধু আইনের রক্তচক্ষু দেখিয়ে সমাজ-মানসকে সংশোধন করা যায় না।

গ্রিক নাট্যকার অ্যারিস্তোফেনিসের 'লাইসিসত্রাতা' নাটকটির কথা মনে পড়ে? দেশে দেশে হানাহানি বন্ধ করার জন্য সেই প্রাচীন গ্রিসের মেয়েরা যৌন অসহযোগিতার নীতি অবলম্বন করে পুরুষদের নুইয়ে দেয়নি? মেয়েরা না পারে কী?

পিপলস থিয়েটার

- 'থিয়েটারকে বাঁচাতে হলে সমস্ত মানুষের কাছে থিয়েটারের দরজা খুলে দিতে হবে। থিয়েটারের সঙ্গো মানুষকে সংযুক্ত করতে হবে। সমস্ত শ্রেণীর মানুষের কণ্ঠস্বরকে থিয়েটারে ধ্বনিত করতে হবে।'
  —'পিপলস থিয়েটার'-এর বিশ্ব মহাসভার ঘোষণা
- থিয়েটারকে বিকশিত করার একটি পথই আছে। সেটি হল, এমন একটি থিয়েটার তৈরি করা, যেখানে জনগণকে নিয়ে যাওয়া যাবে এবং তাদের সুখ-দুঃখের কথা বলা যাবে।'
  —রঁম্যা রলাঁ
- 'থিয়েটারে সামাজিক ধর্ম শেখানো হোক। সংঘ ও নৈতিকতাবোধ জাগিয়ে তোলা হোক।'
  —ফারমিন জেমিয়ার
- 'আমাদের কাজ হল সামাজিক ক্ষতগুলিকে সকলের সামনে উন্মোচন করা।'
  —রজার প্ল্যানচট
- 'ফুটলাইট, প্রসেনিয়াম আর্চ, বক্স এবং ব্যালকনি-সহ যে থিয়েটার, তা দর্শককে পুনঃসংযুক্ত করে না, বরং বিভক্ত করে। তাই পিপলস থিয়েটারের আশু লক্ষ্য হল, মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহকে একত্রিত করে দর্শককে পুনঃসংযুক্ত করা।'
  —জাঁ ভিলার
- 'থিয়েটার হল জনগণের পরিষেবা। অন্যান্য পরিষেবার মতোই জনগণের অর্থ এর জন্য ব্যয় করা উচিত। মধ্যযুগে যেমন গির্জার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ত, তেমনই থিয়েটারের মাধ্যমে ফ্রান্সে সংস্কৃতির বাড়-বাড়ন্ত ঘটুক।'
  —আঁদ্রে ম্যালরোউস

॥ ১॥

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে 'সোস্যালিজম' মতাদর্শের আবির্ভাব হয়। এটি একটি বিশেষ অর্থনৈতিক দর্শন ও রাজনৈতিক আন্দোলন। এই মতবাদের লক্ষ্য, ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলুপ্তিকরণ ও সম্পদের সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার

মাধ্যমে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

প্লেটোর 'রিপাবলিক' ও টমাস মোরের (১৪৭৮-১৫৩৫) 'ইউটোপিয়া' গ্রন্থে সমাজবাদী চিন্তার প্রকাশ ছিল। সতেরো শতকে ইংল্যান্ডে গেরার্ড উইনস্ট্যানলি সমাজতন্ত্রের প্রচার করেছিলেন। ফরাসি বিপ্লবের সময় ও তার পরে ব্যাবুফ (১৭৬০-১৭৭৯), লুই ব্লাঁকি (১৮০৫-১৮৮১), সাঁ সিমো (১৭৬০-১৮২৫) ও শার্ল ফুরিয়ে-র (১৭৭২-১৮৩৭) চিন্তা ও কর্মকাণ্ডে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছিল। এঁরা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যৌথ উৎপাদন ব্যবস্থার কথা বলেন। ১৮৪৮-এ কার্ল মার্ক্স ও ফ্রিডরিশ এঙ্গেলসের 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'-তে বৈজ্ঞানিক ও বৈপ্লবিক 'সোস্যালিজম'-এর প্রতিষ্ঠা ঘটে।

'সোস্যালিজম' বা সমাজবাদের নানারূপ ও ব্যাখ্যা আছে। যেমন, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে 'কাল্পনিক সমাজবাদ', মধ্যভাগে 'বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ' বা 'মার্ক্সবাদ', শেষার্ধে ইংল্যান্ডের 'ফেবিয়ান সমাজবাদ', ইউরোপের নানা অঞ্চলে 'গিল্ড সমাজবাদ', বিশ শতকের শুরু থেকে 'বিবর্তনমূলক সমাজবাদ', 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ'।

তবে নানারূপের সমাজতন্ত্রের মধ্যে সাধারণ কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। যেমন :

এক. ধনতান্ত্রিক সমাজে পুঁজিপতি শ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিক-কৃষকের মুক্তির দর্শন ও সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে সমাজতন্ত্রের জন্ম হয়েছে। সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক নৈরাজ্য-অন্যায়ের অবসান ঘটিয়ে নতুন সমাজ গঠনের স্বপ্নে সে ব্রতী হতে ডাক দিয়েছে।

দুই. সব সমাজতান্ত্রিকই কৃষি, কলকারখানা, খনি ও অন্যান্য শিল্প ব্যবস্থাগুলিতে অর্থনৈতিক শোষণের অবসান ঘটিয়ে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের আর্থিক-বৈষম্য কমাতে চান। এর জন্য মার্ক্স-এঙ্গেলস-লেনিন-মাও ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলুপ্তি ও সম্পদের সামাজিক মালিকানার কথা বলেছেন। তাঁদের অভিমত, ব্যক্তিগত সম্পত্তিই হল শোষণের মূল উৎস। পরবর্তীকালে 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ'-এ ব্যক্তিগত সম্পত্তির পূর্ণ অবলুপ্তির তত্ত্ব মান্যতা পায়নি। এই সমাজবাদে শুধু ভারী ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাদির রাষ্ট্রীয়করণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

তিন. সমাজতন্ত্রবাদীরা সকলেই সমাজকে শোষণমুক্ত করার জন্য প্রতিযোগিতামূলক বাজারের পরিবর্তে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমবায়মূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা চান।

চার. সমাজতন্ত্রীরা জাতি-ধর্ম-স্ত্রী-পুরুষ-বর্ণ-জাতপাত নির্বিশেষে এক পরস্পর

বিরোধহীন সমাজবাদী সমাজ-নির্মাণ করতে চান।

'সোস্যালিজম'-এর এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার অবতারণা এই জন্যই যে, বিভিন্ন দেশে শতকব্যাপী 'পিপলস থিয়েটার' আন্দোলন গড়ে ওঠার পিছনে এই মতাদর্শ চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে।

'পিপলস থিয়েটার'-এর অভ্যুত্থান ও প্রবহমানতার আরও একটি কারণ আছে। উনিশ শতকের শুরু থেকেই এমন একটি অভিযোগ ধূমায়িত হয়েছিল যে, থিয়েটার জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে ফেলেছে। সে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর স্বার্থ দেখছে না। সে শুধুই এক শ্রেণীর শহুরে সংস্কৃতির ধারকদের তুষ্ট করছে। এই অভিযোগ কয়েক দশক ধরে ক্রমশ পুঞ্জিভূত হতে হতে এক ব্যাপক আন্দোলনের রূপ নেয়। অবশেষে, উনিশ শতকের প্রায় শেষের দিকে, জনগণের সঙ্গে থিয়েটারের সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে আবির্ভূত হয় 'পিপলস থিয়েটার'। 'পিপলস থিয়েটার' নামকরণটির কারণ, এই থিয়েটারের যত কর্মকাণ্ড হয়েছে তার কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল 'জনগণ'। এই থিয়েটারে 'জনগণ' শব্দটি এক সময় এক সংগঠিত ও সংযুক্ত জাতিকে বুঝিয়েছে। আবার অন্য সময় শোষিত ও অত্যাচারিত প্রলেতারিয়েত শ্রেণীকে চিহ্নিত করেছে।

তবে 'পিপলস থিয়েটার'-এর প্রকৃতি একটু জটিল। এটি পরম্পরাগত থিয়েটারের একেবারেই অনুরূপ নয়। আবার হুবহু রাজনৈতিক থিয়েটারের মতোও নয়। কারণ যাঁরা 'পিপলস থিয়েটার'-এর সপক্ষে কাজ করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের একই লক্ষ্য ছিল না। কারও লক্ষ্য ছিল সামাজিক, কারও রাজনৈতিক, কারও আদর্শগত, কারও নান্দনিক। কেউ ধনী-দরিদ্র মিলিয়ে সমস্ত শ্রেণীকে দর্শক হিসেবে পেতে চেয়েছেন। কেউ কম সুবিধাপ্রাপ্ত অথবা শোষিত শ্রেণীর কাছে নাটককে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। কেউ রাজনৈতিকভাবে জনগণকে শিক্ষিত করতে চেয়েছেন। কেউ ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে যে সংস্কৃতি লভ্য, সেই মূলস্রোতে সাধারণ মানুষকে টেনে আনতে চেয়েছেন। কেউ একে সমাজের অধিকাংশ মানুষকে নিয়ে গঠিত যে শ্রেণী বা সম্প্রদায়, তাদের জয়-পরাজয়ের মুখপাত্র হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। কেউ আবার থিয়েটারকে শুধুই বিনোদন হিসেবে জনগণের কাছে নিয়ে যেতে চাননি। থিয়েটারের মধ্য দিয়ে জনগণের সামাজিক অবস্থাকেও বর্ণনা করতে বা ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন।

তবে একটি বিষয়ে সকলেই সহমত ছিলেন। এঁরা সবাই 'বুর্জোয়া থিয়েটার'-এর বিরুদ্ধে তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। কেউ তাকে 'ড্রইংরুম কমেডি'র অগভীরতা হিসেবে অবজ্ঞা করেছেন। কেউ তাকে 'আর্ট থিয়েটার'-এর বৌদ্ধিক উন্নাসিকতা বলে ঘৃণা করেছেন। কেউ তাকে এলিট সমাজের ভোগ্যবস্তু বলে মনে

করেছেন। কেউ শুধুই শহর-রাজধানীতে থিয়েটারের স্থিতু হওয়াটি ভালো চোখে দেখেননি। কেউ দর্শককে অন্ধকারে ঢেকে রেখে বা দূরে বসিয়ে রেখে অভিনেতাকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য প্রসেনিয়াম থিয়েটারকে দোষারোপ করেছেন। আবার অনেকে এই থিয়েটারের অভিনয়ের কৃত্রিমতা ও গতানুগতিকতাকে মেনে নিতে পারেননি।

'পিপলস থিয়েটার' আন্দোলনের ঢেউয়ে উদ্ভূত হয়েছিল দুইদল সংস্কারক : এসথেটিক্স রিফরমার ও সোস্যাল রিফরমার। প্রথমোক্ত দলটি নাট্যগোষ্ঠী ও জনগণের মধ্যে ব্যবধান লোপ করতে ও তাঁদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ করে দিতে পরম্পরাগত মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহের সংস্কার করেছেন। নাট্যক্রিয়ায় জনগণকে অংশভাগী করেছেন। দ্বিতীয় দলটি অভিজাত গোষ্ঠীদের ঘর থেকে থিয়েটারকে বের করে এনে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। সাধারণ মানুষের কাছে থিয়েটারের দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। পরম্পরাগত দর্শকের চালচিত্রটি সম্পূর্ণ পালটে সাবেক মরচে-পড়া ধারণাকে তছনছ করে দিয়েছেন।

'পিপলস থিয়েটার' সম্পর্কে তত্ত্বগত ও ব্যবহারিকভাবে যে সমস্ত উপলব্ধি ও অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে সেগুলিকে চারটি বর্গে ভাগ করা যেতে পারে :

এক. 'থিয়েটার ফর সিভিল রিলিজিয়ান'। ফ্রান্সের জেমিয়ার, ভিলার ও প্ল্যানচট এর প্রচারক।

দুই. '[illegible]লিটিক্যাল থিয়েটার'। রাশিয়ার 'অ্যাজিট-প্রপ'-এ তার সূচনা।

তিন. 'ডিসেন্ট্রালাইজড থিয়েটার'। থিয়েটারকে শহরকেন্দ্রিক না করে জেলায় জেলায় ছড়িয়ে দেওয়া। ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেনে এই আন্দোলন দানা বেঁধেছিল।

চার. 'কমিউনিটি থিয়েটার'। গ্রেট ব্রিটেনে যার অধিষ্ঠান।

প্রথমোক্ত দলটি ধর্মের পরিবর্ত হিসেবে থিয়েটারকে সমাজবদ্ধ করার চেষ্টা করেছে। দ্বিতীয় দলটি থিয়েটারকে রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচারের এক শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছে (এবং অবশ্যই সেটি মার্ক্সবাদী রাজনীতি)। তৃতীয় দলটি থিয়েটারকে বিকেন্দ্রিত করে পরোক্ষভাবে থিয়েটারের গণতন্ত্রীকরণ করেছে। চতুর্থ দলটি পেশাদার অভিনেতাদের পরিবর্তে স্থানীয় জনগণকে দিয়ে অভিনয় করিয়েছে।

॥ ২॥

'পিপলস থিয়েটার'-এর সূচনা হয়েছিল জার্মানিতে। ১৮৭৬ সালে প্রখ্যাত সুরশিল্পী রিচার্ড ভাগনার (১৮১৩-১৮৮৩) তাঁর অপেরার বার্ষিক উৎসবের জন্য জার্মানির বেরিউথে 'ফেস্টপিয়েহাস' (ফেস্টিভাল) নামে একটি নতুন ধরনের

প্রেক্ষাগৃহ তৈরি করলেন। এই প্রেক্ষাগৃহে তিনি প্রথাগত ব্যালকনি ও বক্স তুলে দিলেন। ভালো ও মন্দ আসনের সামাজিক বিভাগের বিলোপ করলেন। পাখার মতো আকৃতির প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের সবাইকে একমুখী করে বসার বন্দোবস্ত করলেন, যাতে সমস্ত দর্শকই মঞ্চের নাট্য-ঘটনা ভালোভাবে দেখতে পান।

১৮৮০-তে বার্লিনে 'ফোকসব্যুহনে' নামে এক দর্শক-সংগঠন তৈরি হয়। এই জার্মান শব্দটির অর্থ 'পিপলস থিয়েটার'। 'ফোকসব্যুহনে' শব্দটি এক বিশাল সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনের সঙ্গে যে সমস্ত নাট্যদল যুক্ত ছিল, তাদেরকে বোঝাত। জনগণের চাঁদায় প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠন থিয়েটারকে প্রথম গণ-দর্শকের কাছে নিয়ে আসে। নবীন নাট্যকারদের নাটক সস্তায় শ্রমিক ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীদের দেখানোই ছিল এর উদ্দেশ্য। নাটকে রাজনৈতিক বিষয় আনার ব্যাপারে এই সংগঠন যে ইতিহাস তৈরি করেছিল আজকের 'পলিটিক্যাল থিয়েটার'-এর ভিত্তি গড়ার মূলে তা অনেকটাই কাজ করেছে।

'ফোকসব্যুহনে' প্রতিষ্ঠার পর থেকে ওইরকম অসংখ্য সংস্থা নাট্য-দর্শকদের সামাজিক পরিধি বিস্তৃত করতে লেগে গিয়েছিল। এইসব সংস্থা নতুন জনগোষ্ঠীকে নাট্যদর্শনে উৎসাহী করার জন্য এবং নতুন দর্শকমণ্ডলী খুঁজে পাওয়ার জন্য সময় সময় থিয়েটারকে রাস্তায় নিয়ে যেত। নতুন দর্শকদের সঙ্গে সংযোগ সাধনের কাজে সফল হওয়ার জন্য অভিনেতারা বিভিন্ন টেকনিক আবিষ্কার করতেন। সার্কাস, ফেয়ার-গ্রাউন্ড, ভ্রাম্যমান থিয়েটার ইত্যাদি জনপ্রিয় বিনোদনের পরম্পরাগত ফর্ম থেকেও তাঁরা অনেক টেকনিক ব্যবহার করেছেন।

১৮৯২ সালে, থিয়েটার জনগণের সাংস্কৃতিক চাহিদা মেটাবে, না জনগণকে বিপ্লবে দীক্ষিত করবে— এই প্রশ্নে সংগঠনটি দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ১৯১৪ সালে সংগঠনটি আবার জোড়া লাগে এবং ব্যক্তিগত চাঁদায় দুটি বড় প্রেক্ষাগৃহ তৈরি হয়। এর মধ্যে বুলোপ্লাৎজ-এ ২০০০ আসনবিশিষ্ট এক ঘূর্ণায়মান মঞ্চ এমনভাবে তৈরি হয়, যাতে যে কোনও নাট্যদল সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ নাটক করতে পারে। ১৯৩০-এর মধ্যে ৩০০-র ওপর স্থানীয় সংগঠন এখানে এসে জড়ো হয়। রেইনহার্ড, ফেলিং, পিসকাটরের মতো বিশ্ববিখ্যাত পরিচালকরা এখান থেকেই তাঁদের নাট্যজীবন শুরু করেন। নাৎজি সরকার ১৯৩৭-এ এই থিয়েটার বন্ধ করে দেয়।

॥ ৩॥

পরবর্তী 'পিপলস থিয়েটার' দানা বাঁধল ফ্রান্সে। ১৮৯৯-এ ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত 'পিপলস থিয়েটার'-এর বিশ্ব মহাসভায় ঘোষণা করা হল, 'থিয়েটারকে বাঁচাতে

হলে সমস্ত মানুষের কাছে থিয়েটারের দরজা খুলে দিতে হবে। থিয়েটারের সঙ্গো সমস্ত মানুষকে সংযুক্ত করতে হবে। সমস্ত শ্রেণীর মানুষের কণ্ঠস্বরকে থিয়েটারে ধ্বনিত করতে হবে।'

নোবেল পুরস্কারে ভূষিত রঁম্যা রলাঁ (১৮৬৬-১৯৪৪) ফরাসি বিপ্লবের পটভূমিকায় আটটি নাটক লিখলেন, তার মধ্যে চারটি হল : 'মোরিতুরি' (১৮৯৮), 'তেয়াত্‌র দ্য ল্যভর' (১৮৯৮), 'ল্য ত্রিয়ঁফ দ্য লা রেঁজ' (১৮৯৯) ও 'রবেসপিয়ের' (১৯৩৭)। ১৯০২ সালে তিনি লিখলেন 'লা ১৪ জুইলেট' (১৪ জুলাই)। এই নাটকের কাহিনি ফরাসি বিপ্লবের প্রথম দিন। জনতার আক্রমণে প্যারিস শহরে বাস্তিল দুর্গের পতন। ১৯৩৯-এ রঁল্যা তাঁর 'ল্য থিয়েটার দু পুপল' গ্রন্থে 'পিপলস থিয়েটার'-এর সপক্ষে প্রচার চালালেন। এই গ্রন্থটি পরবর্তী 'পিপলস থিয়েটার' আন্দোলনের প্রবক্তাদের পথনির্দেশের কাজ করল। রঁল্যা তাঁর এই বইটিতে লিখলেন : 'থিয়েটারকে বিকশিত করার একটি মাত্র পথই আছে। সেটি হল এমন একটি থিয়েটার তৈরি করা যেখানে জনগণকে নিয়ে যাওয়া যাবে এবং তাঁদের সুখ-দুঃখের কথা বলা যাবে।'

থিয়েটারের মঞ্চ হবে সেই অঞ্চলে, যেখানে জনগণের দৈনন্দিন বেঁচে থাকার সংগ্রাম চিত্রিত হবে। থিয়েটার হবে 'জনগণের থিয়েটার'। থিয়েটার হবে জনচেতনার মাধ্যম। থিয়েটার হবে আনন্দ ও শক্তির উৎস। আলোর দীপ্তি।

রঁল্যা তাঁর স্বপ্নের 'জনগণের থিয়েটার'-এর পথের দিশাও দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, প্রত্যেকটি অঞ্চলের জনগণের চেতনার স্তর বুঝে তদনুযায়ী নাটক করতে হবে। স্তর অনুযায়ী নাটক করার অর্থ কিন্তু মান নামানো নয়, জনগণের চেতনার স্তরকে উন্নত করা। আর তা করতে হলে জনগণের চেতনা কোন স্তরে আছে জানতে হবে। বুঝতে হবে। এর জন্য জনগণের সঙ্গো থিয়েটারের মানুষদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকতে হবে। তাদের সঙ্গো আগ্রহী করতে, উদ্দীপিত ও বিনোদিত করতে লোকসংস্কৃতিকে ব্যবহার করতে হবে। তবেই গড়ে উঠবে 'জনগণের থিয়েটার'। তবেই থিয়েটার বাঁচবে। তার বাড়বাড়ন্ত হবে।

ফরাসি বিপ্লব ও মার্ক্সের সমাজবাদে প্রভাবিত রঁল্যা শুধু গভীরভাবে 'জনগণের থিয়েটার' সম্বন্ধে ভাবনা-চিন্তাই করেননি, বা সেই আন্দোলনের রূপরেখা এঁকে দেননি; রোবসপিয়ের, কুঁথ, বেনিত, বিল্যো, লিন্ডেট, প্রিয়ুর প্রমুখ প্রখ্যাত ফরাসি কবিদের কাছে এই থিয়েটারের উপযুক্ত নাটক লিখতে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন, 'আমি আপনাদের কাছে ভিক্ষা চাওয়ার মতো করে বলছি— আপনারা আসুন। 'জনগণের থিয়েটার'-এর জন্য নাটক লিখুন। থিয়েটারকে বাঁচান।'

১৯২০ সালে ফ্রান্সে ফারমিন জেমিয়ার (১৮৬৯-১৯৩৩) থিয়েটার ন্যাশনাল পপুলেয়ার প্রতিষ্ঠা করলেন। জেমিয়ার এমন এক 'জনগণের থিয়েটার'-এর স্বপ্ন দেখলেন, যা হবে জনগণের কাছে অপরিহার্য। জনগণই যার পৃষ্ঠপোষকতা করবে। তিনি থিয়েটারকে 'সোস্যাল রিলিজিয়ান' হিসেবে বিকশিত করতে চাইলেন। তিনি চাইলেন, 'থিয়েটারে সামাজিক ধর্ম শেখানো হোক। সংঘ ও নৈতিকতাবোধ জাগিয়ে তোলা হোক।' জেমিয়ার 'ধর্ম' শব্দটির ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন, 'ধর্ম হচ্ছে এমন জিনিস যা সবাইকে বন্ধনে জড়ায়।'

১৯৫১-তে জাঁ ভিলার (১৯১২-১৯৭১) এই থিয়েটারের দায়িত্ব নিলেন ও একে 'জনসেবা' হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন। ভিলার লিখলেন, 'ফুটলাইট, প্রসেনিয়াম আর্চ, বক্স এবং ব্যালকনি-সহ যে থিয়েটার, তা দর্শককে পুনঃসংযুক্ত করে না, বরং বিভক্ত করে। তাই এখন 'পিপলস থিয়েটার'-এর আশু লক্ষ্য হল, মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহকে একত্র করে দর্শককে পুনঃসংযুক্ত করা।' তিনি থিয়েটারের অনেক বৈপ্লবিক পরিবর্তন করলেন। যবনিকা, পাদপ্রদীপ ও আঁকা দৃশ্যপট বাতিল করে দিলেন। সান্ধ্যপোশাক পরা ও বখশিস দেওয়া বন্ধ করে দিলেন। মঞ্চের সামনের অংশটি দর্শকের দিকে এগিযে নিয়ে এলেন, যা পরীক্ষামূলক প্রযোজনায় বিশেষ সাহায্য করল। ভিলারের অধীনে থিয়েটার ন্যাশনাল প[illegible]ুলেয়ার যেমন ফরাসি ক্লাসিক ও শেক্সপীয়রের নাটক মঞ্চস্থ [illegible]রল, তেমনই ব্রেশটের 'মাদার কারেজ', এলিয়টের 'মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল' ইত্যাদি আধুনিক নাটকও মঞ্চস্থ করল।

১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে ভিলার মফঃস্বলে 'উইকএন্ড ডি সিওরনেস' নামে একটি ধারাবাহিক নাট্যাভিনয়ের উদ্বোধন করলেন। নাটকগুলি বড় বড় প্রেক্ষাগৃহে অভিনীত হল। কিন্তু টিকিটের দাম থাকল খুব কম। একটি টিকিটেই দর্শক দুটি নাটক দেখতে পেলেন। অভিনেতাদের সঙ্গো আলোচনার সুযোগ পেলেন। একটি কনসার্ট শুনতে পেলেন। নাচতে পারলেন। দু'বেলা খাবার পেলেন।

ভিলার তাঁর দল নিয়ে সমগ্র ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশ ভ্রমণ করলেন। ১৯৫৩ সালে এই দলটি এডিনবার্গে ও ১৯৫৬-তে লন্ডনে অভিনয় করল। এই দল সরকারি আর্থিক সাহায্যে চলত। শর্ত হিসেবে তাকে বাধ্যতামূলকভাবে প্যারিস ও তার আশপাশে ১৫০ রজনী অভিনয় করতে হত। টিকিটের দম কম রাখতে হত। তবে পরিচালক স্বাধীনভাবে নাটক নির্বাচন করতে পারতেন। বার্ষিক চুক্তিতে দলে থাকতেন ১৮ থেকে ২০ জন অভিনেতা। ১৯৬৩-তে ফরাসি

সরকারের অপর্যাপ্ত আর্থিক সাহায্যের প্রতিবাদে ভিলার থিয়েটার ন্যাশনাল পপুলেয়ার ছেড়ে দিলেন। ১৯৬৯-এ জেনারেল দ্য'গলের সমালোচনা করায় সরকার এদের একটি প্রযোজনাকে নিষিদ্ধ করে দিল। কার্যত দল বন্ধ হয়ে রইল।

১৯৭২-এ দলের স্বত্ব হাত-বদল হয়ে গেল রজার প্ল্যানচটের কাছে। তারপর থেকে দলটি জাতীয়ভাবে সফর করছে। এদের সঙ্গো আছে রাজনৈতিক নাটকের প্রযোজনা। আধুনিক ফ্রান্সের সামাজিক বিভাজনকে উদঘাটন করাই এই নাটকগুলির উদ্দেশ্য। প্ল্যানচটের কথায় 'আমাদের কাজ হল সামাজিক ক্ষতগুলিকে সকলের সামনে উন্মোচন করা।'

॥ ৫ ॥

১৯২০-তে রাশিয়ায় 'অ্যাজিট-প্রপ' নাট্য-আন্দোলনের সঙ্গো সঙ্গো 'পিপল্স থিয়েটার'-এর তৃতীয় পদক্ষেপ শুরু হল। 'অ্যাজিট-প্রপ' শব্দটি সোভিয়েত ইউনিয়নের 'ডিপারটমেন্ট অব অ্যাজিটেশন অ্যান্ড প্রপাগাণ্ডা' থেকে এসেছে। ১৯২০-তে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এই ভ্রাম্যমান নাট্যদল গঠন করে। এই আন্দোলনের প্রবক্তারা থিয়েটারকে রাজনৈতিক প্রচারের এক বিশেষ ফলপ্রদ মাধ্যম বলে বিশ্বাস করতেন। তাঁরা থিয়েটারের মাধ্যমে শ্রেণী-বৈষম্য লোপে ও শ্রেণী-সংগ্রামকে ক্ষুরধার করে তুলে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীকে উদ্দীপিত করতে চাইলেন। ১৯২৬-এ ওয়ার্কার্স থিয়েটার লিগ গঠনের মাধ্যমে এই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ল। ধীরে ধীরে এই আন্দোলন বিশ্বের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ল।

১৯২০-তে আমেরিকার ডেট্রয়েট ও শিকাগোতে শিল্পক্ষেত্রে অস্থিরতার সময় 'অ্যাজিট-প্রপ' বিশেষ ভূমিকা নিল। ১৯২৬-এ সাধারণ ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে ব্রিটেনে ইনডিপেনডেন্ট লেবার পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যদের নিয়ে যে ওয়ার্কার্স থিয়েটার গঠিত হল, সেই দলটি 'অ্যাজিট-প্রপ' পদ্ধতি ব্যবহার করতে শুরু করল।

১৯৩২-এ ব্রিটেনে 'রেড মেগাফোন' নামে একটি দল স্যালফোর্ডের সূতাকলের ধর্মঘটরত শ্রমিকদের মধ্যে নাটক অভিনয় করল। ১৯৩৩-এ আমেরিকায় 'থিয়েটার ইউনিয়ন' নামে প্রথম মার্ক্সবাদী নাট্যদল গঠিত হল। নিউ জার্সির সূতাকল শ্রমিকদের নিয়ে এই দলটি 'স্ট্রাইক' নামে একটি নাটক প্রযোজনা করল। ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে চীনের শ্রমিক থিয়েটার 'অ্যাজিট-প্রপ'-এর নিজস্ব সংস্করণ তৈরি করে নিল।

'অ্যাজিট-প্রপ' থিয়েটারের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল, এই দলের নাট্যকর্মীরা

হালকা জিনিসপত্র নিয়ে ভ্রমণ করেন। 'ফেয়ার গ্রাউন্ড' ও 'পাপেট'-এর অনেক শিল্পকৌশল ব্যবহার করেন। প্রত্যক্ষ জনসংযোগের চেষ্টা করেন। জনগণকে মার্ক্সীয় মতাদর্শে দীক্ষিত করেন।

'অ্যাজিট-প্রপ' দলগুলি 'লিভিং নিউজপেপার' ফর্মের ওপরেও বেশি জোর দেয়। ১৯৩০-এ অর্থনৈতিক মন্দার সময় রুজভেল্ট প্রশাসন আমেরিকার নিউ ইয়র্কে চাকরির সুযোগ তৈরি করার জন্য নাট্যকর্মী ও সংবাদপত্রকর্মীদের নিয়ে 'ফেডারেল থিয়েটার প্রজেক্ট' চালু করে। এই ইউনিটই 'লিভিং নিউজপেপার' ফর্মের উদ্‌গাতা। এটি মূলত একটি নীতিগর্ভ তথ্যমূলক ফর্ম। দারিদ্র্য, গৃহসমস্যা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পৌর অধিকার, প্রাকৃতিক সম্পদ, জাতি সমস্যা, শ্রমিক ইউনিয়ন, কে-অপারেটিভ, গণপরিষেবা, চলচ্চিত্র ও অন্যান্য জাতীয় সমস্যা নিয়ে এরা নাটক করে।

এদের নাটকে সাধারণত একটি সামাজিক সমস্যাকে প্রথমে চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যের মতো ছোট ছোট দৃশ্যে ব্যাখ্যা করা হয়। তারপর সেই সমস্যার সমাধান চাওয়া হয় বা করা হয়। এলমার রাইস, জোসেফ লোসেই প্রমুখ প্রখ্যাত পরিচালক এই কর্মধারার সঙ্গো যুক্ত ছিলেন। এই দলটি সর্বসমেত ছ'টি প্রযোজনা করেছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে সফল প্রযোজনা আর্থার অ্যারেন্ট-এর 'ট্রিপল—আ প্লাইউড আন্ডার' (১৯৩৬)। কৃষক ও ক্রেতাদের উন্নত আয় ও সস্তা খাবারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে এই নাটক। 'ইনজাংশন গ্র্যান্টেড'-এর (১৯৩৬) বিষয় আদালতে শ্রমিকদের বিচার। 'পাওয়ার' (১৯৩৭) নাটকটি বিদ্যুৎ শক্তির জাতীয়করণের সপক্ষে সওয়াল করল। কম মূল্যে শহরে গৃহের দাবি জানাল 'ওয়ান থার্ড অব আ নেশন' (১৯৩৮)। কিন্তু প্রযোজনাগুলি ক্রমশই বিতর্কিত ও সরকার-বিরোধী হয়ে যাওয়ায় বেগতিক দেখে সরকার ১৯৩৯-এ 'ফেডারেল থিয়েটার প্রজেক্ট' বন্ধ করে দিল।

'ফেডারেল থিয়েটার প্রজেক্ট' বন্ধ হয়ে গেলেও এদের আবিষ্কৃত 'লিভিং নিউজপেপার' ফর্মটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নাট্যদলগুলিকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল। এমনকি ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক সমস্যা ও অবস্থা সম্বন্ধে মানুষকে অবহিত করার জন্য এই টেকনিকের ব্যবহার করেছিল। ১৯৫০-এ 'থিয়েটার অব ফ্যাক্ট'-এর মতো নীতিগর্ভ থিয়েটারেও এই টেকনিকের প্রয়োগ হয়েছিল।

॥ ৬॥

'পিপলস থিয়েটার'-এর পরবর্তী ঠিকানা পাওয়া যায় রাশিয়ায়, 'ব্লু ব্লাউজেস'

আন্দোলনে। ১৯২৩-এ রাশিয়ার মস্কো ইনস্টিটিউট ফর জার্নালিজমে সোভিয়েত রাশিয়ার শ্রমিকদের নিয়ে বরিস যুঝানিন 'ব্লু ব্লাউজেস' নামে একটি নাট্যগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করলেন। 'ব্লু ব্লাউজেস' নামটি এসেছে কারখানা শ্রমিকদের ঢিলা নীল পোশাক থেকে। প্রলেতারীয় মতাদর্শে দীক্ষিত এই দলটি সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে মনতাজ উপস্থিত করল। হালকা জিনিসপত্র নিয়ে নাটক করত বলে এই দল দূর-দূরান্তে সফর করতে পারত। এরা কারখানায়, ক্লাবে এবং খোলা জায়গায় অভিনয় করত। এক সময় রাশিয়ায় এক লক্ষ সভ্যসহ পেশাদার ও অপেশাদার মিলিয়ে এই ধরনের ৫০০০ নাট্যদল তৈরি হয়েছিল।

১৯৫০-এ চীনের শ্রমিক নাট্যদল রাশিয়ার অনুকরণে 'ব্লু ব্লাউজেস' নামেই একাধিক নাট্যদল তৈরি করল। আমেরিকাতেও শ্রমিক নাট্যদল ওই নামে একটি সংগঠন তৈরি করল। 'ব্লু ব্লাউজেস' গোষ্ঠীর বিশেষত্ব হল, তারা পোস্টার ব্যবহার করে। প্রত্যেকটি পোস্টারের মাথায় একটি গর্ত থাকে। অভিনেতা তাঁর মাথা সেই গর্তের মধ্যে ঢোকাতে পারেন। এই দলে অভিনেতাদের মুভমেন্ট, নাচ ও জিমনাস্টিকের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কারণ এঁরা অভিনয়ে দেহের ভাষার ওপর বেশি নির্ভরশীল।

॥ ৭॥

'পিপলস থিয়েটার'-এর পরের আন্দোলনের কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে দাঁড়াল অভিনেতা-দর্শক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করে তোলার জন্য মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে সেতুবন্ধন। রাশিয়ার নাট্য-পরিচালক ভ্সেভোলদ মেয়ারহোলদ (১৮৭৪-১৯৪১) মঞ্চের সামনের পাদপ্রদীপ অপসারিত করালেন। অর্ধচন্দ্রাকৃতি প্রসেনিয়ামকে অনেকখানি মঞ্চ-গভীরে প্রবিষ্ট করালেন। অভিনয় চলাকালীন মঞ্চ ও দর্শক-স্থানের সব আলোই জ্বালিয়ে রাখলেন। কোনও কোনও নাট্য উপস্থাপনায় তিনি যবনিকা অপসারিত করে অ্যাপ্রন-মঞ্চ বর্ধিত করলেন। মঞ্চ থেকে দর্শক-স্থানে যাতায়াতের জন্য সিঁড়ি যুক্ত করে দিলেন।

মেয়ারহোলদের পর মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে সেতুবন্ধন করলে অস্ট্রেলিয়ান নাট্য-পরিচালক মাক্স রেইনহার্ড (১৮৭৩-১৯৪৩)। তিনি এমন সব বাড়িতে বা অট্টালিকায় নাটক করলেন, যেগুলি থিয়েটারের জন্য ব্যবহৃত হত না। তিনি বার্লিনের একটি সার্কাসকে অধিগ্রহণ করে 'ইদিপাস রেক্স' ও লন্ডনের 'অলিম্পিয়া হল'কে একটি গোথিক চার্চে রূপান্তরিত করে 'দ্য মিরাক্‌ল' নাটক মঞ্চস্থ করলেন। শেষোক্ত নাটকে তিনি দর্শকাসনকে এমনভাবে সাজালেন যেখানে দর্শকরা মনে করলেন যেন তাঁরা আসল চার্চে প্রার্থনাসভায় যোগদান

করছেন।

মেয়ারহোলদ ও রেইনহার্ড যেখানে বিশুদ্ধ নান্দনিক কারণে মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে সংযোগ চাইছিলেন, সোভিয়েত নাট্য-পরিচালক নিকোলাই ওখলোপকভ (১৯০০-১৯৬৭) সেখানে চাইলেন নাট্যক্রিয়ার মধ্যে দর্শকের প্রবেশ। ১৯৩০ সালে তিনি মস্কোর সবচেয়ে ছোট থিয়েটার রিয়ালিস্টিকের দায়িত্ব নিয়ে প্রথমেই প্রসেনিয়াম মঞ্চকে ভেঙে দিয়ে এক চলমান পাটাতনের ওপর দৃশ্যপট নির্মাণ করলেন। দর্শকদের বসার জায়গা বিভিন্ন জায়গায় স্থাপন করে অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যেকার সম্পর্কটিতে অসংখ্য বৈচিত্র্য এনে দিলেন। অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যে স্থানের যে ব্যবধান বা দূরত্ব ছিল, তাও সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়ে গেল। সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে নাটকীয় অ্যাকশনের পরিবেশ সৃষ্টি হল। 'স্টার্ট বাই স্ট্যাভস্কি' (১৯৩১) প্রযোজনায় তিনি প্রেক্ষাগৃহের ঠিক মাঝখানে একটি ছোট মঞ্চ এবং দর্শকের মাথার ওপর দিয়ে চক্রাকারে একটি সেতু তৈরি করলেন। দর্শকের চারপাশ ঘিরে ছোট ছোট চৌকো পাটাতন তৈরি করে সেগুলিতে আলো স্থানান্তরিত করে ম্যাক্সিম গোর্কির 'মাদার' (১৯৩২) নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন। এতে দর্শকরা নাট্যক্রিয়ার দ্বারা বেষ্টিত হয়ে গেলেন। 'দ্য আয়রন ফ্লাড' (১৯৩৪) নাটকে তিনি দর্শককে নাট্যক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করালেন। তাঁর পোগোদিনের 'দ্য অ্যারিস্টোক্র্যাট' (১৯৩৫) প্রযোজনাটি প্রাচ্যের মঞ্চশৈলীকে মনে করিয়ে দিল। রসট্যান্ডের 'সাইরানো ডি বারজেরাক' (১৯৪৩) প্রযোজনায় তিনি দৈত্য, পুতুল ও দর্শকদের একাকার করে দিলেন।

॥ ৮॥

১৯৬০-এর দশকে ফ্রান্সে ও গ্রেট ব্রিটেনে 'পিপলস থিয়েটার'-এর আবার পুনরাবির্ভাব ঘটল। ১৯৬০-এ ফ্রান্সে 'থিয়েটার পপুলেয়ার দ্য লোরেইন' নামে একটি নাট্যদল তৈরি হল। এই দল আদামভ ও উনিশ শতকের ধ্রুপদি নাটকের অভিনয় দিয়ে শুরু করে ১৯৬৯ সালে 'সমবেত সৃষ্টি'র সাহায্যে স্থানীয় ইস্পাত খনি নিয়ে একটি নাটক অভিনয় করল।

১৯৬০-এ গ্রেট ব্রিটেনে শ্রমিক আন্দোলনের ভিতর দিয়ে জন্ম নিল আর্নল্ড ওয়েস্কারের 'সেন্টার ফরটি টু'। ওয়েস্কার 'দ্য মডার্ন প্লেরাইট' শিরোনামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে গ্রেট ব্রিটেনের প্রত্যেকটি ট্রেড ইউনিয়নে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি পুস্তিকায় লিখলেন, 'যদিও ব্রিটেনের শ্রমিকরা তুলনামূলকভাবে আর্থিক দিক দিয়ে অন্যান্য দেশের তুলনায় শক্তিশালী, কিন্তু সংস্কৃতিমনস্কতায় তারা এখনও পিছিয়ে। বাণিজ্যিক পৃথিবী তাঁদের সংস্কৃতিকে দূষিত করছে।' 'রুটস'

নাটকে এই বক্তব্যই তুলে ধরলেন তিনি। শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নই ওয়েস্কারের লক্ষ্য ছিল।

অন্যদিকে গ্রেট ব্রিটেনে ওই ১৯৬০ সালেই জাঁকিয়ে বসল 'কমিউনিটি থিয়েটার'। 'কমিউনিটি থিয়েটার' এমন এক নাট্য সংগঠন বা এক ধরনের নাটক যা সেইসব দর্শককে দেখানোর জন্য তৈরি হয়, যাঁরা প্রথাগত এবং বাণিজ্যিক থিয়েটার থেকে বিচ্ছিন্ন। ভোটাধিকার থেকেও বঞ্চিত। এই থিয়েটারের লক্ষ্য হল, এক বৃহৎ সংখ্যক দর্শককে নাটমঞ্চে নিয়ে আসা এবং এমন একটি ফোরাম তৈরি করা যাতে মূলস্রোতের নাটকে যে বিষয়গুলি অবহেলিত, সেগুলি নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। বারম্যানের মতে, 'স্থানীয় থিয়েটার হলেই তা কমিউনিটি থিয়েটার হয় না। হয় এই থিয়েটারকে স্থানীয় কমিউনিটির সমস্যাগুলি দেখাতে হবে, অথবা সৃজনে ও উপস্থাপনায় তাকে এই কমিউনিটির মানুষদের অংশ নেওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে।

ক্লাইভ বার্কারের মতে, 'কমিউনিটি থিয়েটার' সত্যিকারের শুরু হয়েছিল লন্ডনে, ১৯৬৮-তে আমেরিকান পরিচালক এড বারম্যানের 'ইন্টার-অ্যাকশন' প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে। এই নাট্যদল বিশ্বাস করে, 'যে কোনও জায়গাতেই থিয়েটার করা যেতে পারে।' তাই এরা লন্ডনের বিভিন্ন জায়গায়, এমনকি যেসব জায়গায় বিনোদন বলে কিছুই নেই, সেখানেও অভিনয় করতে যায়। তারা গন্তব্যস্থলে একটি দোতলা বাস নিয়ে যায়, যার মধ্যে থাকে একটি ছোট থিয়েটারের মঞ্চ এবং চলচ্চিত্র দেখাবার পর্দা ও সরঞ্জাম। থিয়েটার যে শুধুই মধ্যবিত্ত ও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের জন্য নয়, এ ধারণাও তারা ভেঙে দিতে চায়। 'ইন্টার-অ্যাকশন'-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, এরা যেমন সরলতম পদ্ধতি ব্যবহার করে, তেমনই আধুনিক গণমাধ্যমের অত্যাধিক টেকনিকও ব্যবহার করে। এদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, এরা শিশুদের নিয়ে নাটক করে।

১৯৭০-এর শেষের দিকে আর এক ধরনের কমিউনিটি থিয়েটারের আবির্ভাব ঘটে। কলওয়ে থিয়েটার ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা অ্যান জেলিকোর নেতৃত্বে কমিউনিটির স্থানীয় ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে নাটক লেখা ও প্রযোজনা হয়। এই নাটকগুলিতে স্থানীয় অধিবাসীরা অভিনেতা ও কলাকুশলীর ভূমিকায় থাকেন। জেলিকোর প্রযোজনার মধ্যে আছে হাওয়ার্ড বার্কারের 'দ্য পুওর ম্যান'স ফ্রেন্ড' (১৯৮১) এবং ডেভিড এডগারের 'এনটারটেইনিং ফ্রেন্ডস' (১৯৮৫)।

১৯৬২-তে স্টুডিও থিয়েটার ইংল্যান্ডের ভিক্টোরিয়া সিনেমা হলকে এরিনা থিয়েটারে পরিণত করে ঘাঁটি গেড়ে বসে। ১৯৬৪-তে এখানে আঞ্চলিক বিষয় নিয়ে এরা প্রথম 'দ্য জলি পটারস' নামে একটি তথ্য-নাটক অভিনয় করে।

নাটকটির বিষয়— উনিশ শতকের ধাতুপাত্র নির্মাতাদের দারিদ্র্য ও শোচনীয় কর্মপরিস্থিতি। ঐতিহাসিক নথি গবেষণা করে এই নাটকটি রচিত হয়েছিল। সতেরো শতকের স্ট্যাফোর্ডশায়ারের সিভিল ওয়ার নিয়ে এরা ১৯৬৫-তে 'দ্য স্ট্যাফোর্ডশায়ার রেবেল' নামে এবং স্থানীয় রেলওয়ের জন্ম এবং মৃত্যু নিয়ে 'দ্য ট্রেন' নামে একটি নাটক সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করে।

১৯৬৩ থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত ভিয়েতনাম যুদ্ধ নিয়ে সবচেয়ে বড় কাজ করেছে পিটার শুম্যানের 'দ্য ব্রেড অ্যান্ড পাপেট থিয়েটার'। এরা 'র‍্যাডিকাল থিয়েটার' ও 'কমিউনিটি থিয়েটার'-এর মধ্যে সংযোগ সাধন করেছে। ১৫ ফুট উঁচু পাপেট, ভিয়েতনাম মহিলাদের ট্রাজিক মুখোশ, মৃত সন্তান কোলে ভার্জিন মেরি এবং প্ল্যাকার্ড (তাতে লেখা 'আমি মেরি, আমার সন্তানকে ন্যাপাম বোমায় মারা হয়েছে) নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় অভিনয় করেছে। 'দ্য ক্রাই অব দ্য পিপল ফর মিট', 'আ ম্যান সেজ গুড বাই টু হিজ মাদার অ্যান্ড ফাদার' ও 'ফায়ার'— শুম্যানের এই তিনটি প্রযোজনাই ভিয়েতনামের মানুষদের নিয়ে।

॥ ৯॥

'পিপলস থিয়েটার'-এর এই শতাব্দীব্যাপী আবর্তনে পরম্পরাগত থিয়েটারের অনেক প্রয়োজনীয় সংস্কার হয়েছে। নাটক, আঙ্গিক, দর্শক ও থিয়েটারের গণ-সংযোগ নিয়ে অনেক যুগোপযোগী নিরীক্ষা হয়েছে। মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে অনেক নতুন তত্ত্বের জন্ম হয়েছে। অভিনেতা-দর্শক বিযুক্তির প্রক্রিয়াটি পরিত্যক্ত হয়েছে। অনেক কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে সফলতা এসেছে। বিশেষ করে ফ্রান্সে বিকেন্দ্রীকরণ আন্দোলন সত্যি সত্যি থিয়েটারের গণতন্ত্রীকরণকে সম্ভব করেছে। জনগণ থিয়েটারে অংশগ্রহণ করেছে, শ'য়ে শ'য়ে নয়— হাজারে হাজারে। জনগণকে উন্নতমানের থিয়েটার দেখানো হয়েছে। শ্রমিক শ্রেণী তাদের নিজস্ব থিয়েটারকে বিকশিত করেছে। প্ল্যানচটের থিয়েটার আন্দোলন এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে যে, মানুষের কাছে থিয়েটার এক 'সাংস্কৃতিক পরিষেবা'। ১৯৬৯-এ ফ্রান্সের দ্য'গল সরকারের মন্ত্রী আন্দ্রেঁ মালরোউসের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে, 'থিয়েটার হল জনগণের পরিষেবা। অন্যান্য পরিষেবার মতোই জনগণের অর্থ এর জন্য ব্যয় করা উচিত। মধ্যযুগে যেমন গির্জার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ত, তেমনই থিয়েটারের মাধ্যমে ফ্রান্সে সংস্কৃতির বাড়বাড়ন্ত ঘটুক।' ভিলারের 'থিয়েটার অব কমিউনিয়ন'-এর পরিকল্পনা পরবর্তী সময়ে অভিনয় ও প্রযোজনাশৈলীর ওপর শক্তিশালী প্রভাব ফেলেছে। 'প্রলেতারিয়ান থিয়েটার' নির্মাণের কাজটি ত্বরান্বিত হয়েছে। বিপ্লবের পর রাশিয়ায় অসাধারণ সব সাহসী পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে।

মেয়ারহোলদ, পিসকাটর ও ব্রেশটের পরিণত রাজনৈতিক থিয়েটারের কাজ আমরা পেয়েছি। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে, 'অ্যাজিট- প্রপ' নাটকের ঢল নেমেছে।

॥ ১০ ॥

অন্যদিকে, যে রাজনৈতিক মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে 'পিপলস থিয়েটার'-এর একটি বর্গের জন্ম হয়েছিল, আমরা বিশ শতকে যুগপৎ সেই সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি ও পতনের ইতিহাস প্রত্যক্ষ করেছি। আমরা দেখেছি, বিশ শতকের সূচনায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর লেনিনের নেতৃত্বে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে সোভিয়েত রাশিয়া প্রতিষ্ঠা পেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মাও জে-দংয়ের নেতৃত্বে চীনে গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র স্থাপিত হল। পোল্যান্ড, রোমানিয়া, আলবেনিয়া, পূর্ব জার্মানি প্রভৃতি পূর্ব ইউরোপ এবং পৃথিবীর পশ্চিম গোলার্ধের কিউবাতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপিত হল। কিন্তু বিশ শতকের মধ্য-আশির দশক থেকে মার্ক্সীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সংকট প্রকট হতে থাকল। নব্বই-এর দশকে পূর্ব ইউরোপ সমেত সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন ঘটল। সমাজতন্ত্রের ভিত ধসে পড়ল। সমাজতান্ত্রিকতার ভূমিক্ষয় ঘটছিল তলায় তলায়। কিন্তু তাঁর ভেঙে পড়া এত আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত দ্রুততায় ঘটল যে, তার ভাঙচুরের তরঙ্গাভিঘাতে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

সমস্ত বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্টরা মনে করত, উৎপাদন-ব্যবস্থা হবে ব্যক্তি-মালিকানা মুক্ত। উৎপাদনের উপকরণ থাকবে সামাজিক মালিকানায়, সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির অনুপ্রবেশ আটকাতে হবে যে কোনও মূল্যে— এই ছিল ক্ষমতায় থাকা এবং না থাকা সমস্ত কমিউনিস্টদের রণধ্বনি। আর আজ? চীন তার মূল ভূখণ্ডকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে মার্কিনসহ বহুজাতিক পুঁজির ঢালাও বাণিজ্যের জন্য। আজ দুনিয়া জুড়ে শুধু মুক্ত-অর্থনীতি। কোথায় সমাজতন্ত্র? কোথায় উৎপাদনের উপকরণের সামাজিক মালিকানা? কোথায় উৎপাদনের উপকরণের ব্যক্তিমালিকানা উচ্ছেদ? উলটে চীনে এখন ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার পুঁজিপতিদের পুঁজি বিনিয়োগের জন্য ভারতের কমিউনিস্টরা লাল কার্পেট বিছিয়ে দিচ্ছে। আমেরিকা ও ব্রিটেনে গিয়ে দরবার করছে।

গোড়ায় যে আদর্শবাদ ছিল, সেটুকু ধুয়ে-মুছে গিয়ে কমিউনিজম এখন নিছক শক্তিসাধনায় পরিণত হয়েছে। সমাজতন্ত্রের বিঘোষিত নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন রুশ-চীন এবং চীন-ভিয়েতনাম সংঘর্ষ সেকথাই বলে। আগের সময়কাল থেকে আজকের সমাজতন্ত্রের অবস্থানটিও সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেই সময় লড়াইটা ছিল

ফ্যাসিবাদের সঙ্গো সাম্যবাদের। আজ লড়াই ধনবাদের সঙ্গো সাম্যবাদের। আজ পূর্বতন উপনিবেশ ও মুক্তিকামী সংগ্রামরত সমাজতন্ত্রের সঙ্গো অধুনা প্রযুক্তিতে অতি-উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজের বড়রকমের পার্থক্য হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে কিউবা, ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া ও ভেনিজুয়েলায় সমাজতন্ত্র একটা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগোচ্ছে।

ভেনিজুয়েলার কথাই ধরা যাক। এই দেশটিকে দক্ষিণ আমেরিকার 'প্রবেশপথ' বলা হয়। সরকারি কাঠামো : বহুদলবিশিষ্ট প্রজাতন্ত্র। ১৯৯৮-তে ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হন উগো শাভেজ। শপথ নেন 'একুশ শতকের সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার। তিনি লাতিন আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক নায়ক সাইমন বলিভারের সমবায় আদর্শ ও মার্ক্সের উৎপাদন ও সম্পদের সমবণ্টন নীতির মেলবন্ধন ঘটাবার চেষ্টা করছেন। সমবায়ের আদর্শের ওপর ভিত্তি করে সমাজের সর্বস্তরে গড়ে তুলেছেন 'সমবায়িকা'। এই সমবায়িকার সংখ্যা এখন ১০,০০০। সদস্য সংখ্যা প্রায় ৭ লক্ষ। প্রতিদিন শত শত সমবায়িকা তৈরি হচ্ছে। এই সমবায়িকা গঠন ও পরিচালনায় রাষ্ট্র কোনও অংশ নিচ্ছে না। নিয়ন্ত্রণও করছে না। শুধু তাদের উৎসাহ দিচ্ছে। ঋণ জোগাচ্ছে। তাদের সুবিধার্থে নিয়মকানুন তৈরি করছে। পরিকাঠামো যোগান দিচ্ছে।

শিল্প-বাণিজ্য, কৃষি ও জন-পরিষেবার সমবায়গুলির পরিচালনায় শ্রমিক-কর্মীদের খুব বড় ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। তাঁরা ম্যানেজমেন্টের সর্বোচ্চ স্তর অবধি অংশগ্রহণ করছেন। বোর্ড অব ডিরেক্টরস ও ম্যানেজাররা তাঁদের ভোটে নির্বাচিত হচ্ছেন। তাঁরাই যৌথভাবে উৎপাদনের ফসল আহরণ ও বণ্টনের প্রক্রিয়া পরিচালনা করছেন। বাজেট তৈরি থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। এর ফলে তাঁরা বেশি পরিশ্রম ও আর্থিক দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছেন। রাষ্ট্র ও পার্টির নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি পেয়ে দেশ জুড়ে নানা ধরনের সমবায়িকা গড়ে উঠছে। কৃষক, শ্রমিক, বস্তিবাসী ও আদিবাসীদের নেতৃত্বে দেশের সমস্ত অঞ্চলে সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠছে।

ভেনিজুয়েলা এখন যে পথে চলছে, সেটা বিশ শতকের সোভিয়েত বা চীনা মডেলের সমাজতন্ত্র থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র। পুরোনো সোভিয়েত মডেল সংস্থার পরিচালনায় ভার ছিল সরকারি পরিকল্পক ও আমলাদের হাতে। শ্রমিক-কর্মীদের কাজ ছিল শুধু হুকুম তামিল করা।

সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির এই পরিবর্তিত রঙ্গামঞ্চে 'পিপলস থিয়েটার' আন্দোলন কীভাবে ও কোন দিকে তার পথের দিশা ঠিক করে নেবে, ভবিষ্যৎই তা বলতে পারবে।

ন্যাচারিলিস্টিক থিয়েটার

- 'নাটক হবে প্রত্যক্ষ প্রকৃতির অনুকরণ। জীবনের এক খণ্ড প্রতিবিম্ব। নাটমঞ্চ মানেই জীবনের ফোটোগ্রাফি। 'আ ব্লিডিং স্লাইস অব লাইফ'।
  —এমিল জোলা
- 'সবচেয়ে বড় কথা, থিয়েটারিপনা চলবে না। সব কিছু সহজে হবে। একেবারে সহজ।'
  —আন্তন চেকভ
- 'দর্শককে আনন্দ দেওয়াটাই থিয়েটারের প্রধান উদ্দেশ্য নয়। তাঁকে শিক্ষিত করে তোলা, জীবনের নানা আদর্শের বিষয়ে তাঁর চোখ খুলে দেওয়া— এই হল থিয়েটারের আসল কাজ।'
  —কনস্তানতিন স্তানিলস্লাভস্কি
- 'শুধুমাত্র প্রশংসা বা পুরস্কারের লোভে অভিনয়কে ভালোবাসলে চলবে না। অভিনয়কে ভালোবাসবে এই জন্যে যে, এর সাহায্যে তুমি দর্শকের কাছে এমন সব কথা বলতে পারবে, যার দ্বারা তাঁরা নিজেদের জীবনকে গড়ে তুলতে পারে। মহত্তর, উন্নততর জীবনের কথা ভাবতে পারে।'
  —কনস্তানতিন স্তানিস্লাভস্কি
- 'অভিনেতার চরিত্রের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি কীভাবে হওয়া সম্ভব, স্তানিস্লাভস্কির 'দ্য সিস্টেম' সেই রাস্তার একটি পথ-প্রদর্শক মানচিত্র।'
  —জোসেফ চাইকিন
- 'যাঁরা মহৎ নাট্যশিল্প তৈরি করতে চান, এই বইটি তাঁদের সাহায্য করবে।'
  —চার্লি চ্যাপলিন
- 'জিনিয়াস কী? আমি জানি না। এর কোনও স্পষ্ট তাত্ত্বিক উত্তর আছে কি না, তাও আমি জানি না। কিন্তু বাস্তবে একজন জিনিয়াস আছেন। তিনি স্তানিস্লাভস্কি।'
  —আলেকজান্দার তেইরভ
- 'স্তানিস্লাভস্কি পদ্ধতিকে সর্বরোগহর কোনও দাওয়াই ভাববার কোনও

কারণ নাই। অনেক নাটকে স্তানিস্লাভস্কির অভিনয়ধারা ব্যর্থ হতে বাধ্য।'

—*উৎপল দত্ত*

- 'আমরা 'থিয়েটার'-এ নেই এটা ভুলতে আমরা থিয়েটারে যাই না। আমরা থিয়েটারে যাই কারণ সে আমাদের জীবনের থেকে অন্য কোনও জায়গায় নিয়ে যায়।' —*পাভলোভিচ ওখলোপকভ*
- 'বিশুদ্ধ অনুকরণের নাট্যরীতি জীবনের প্রয়োজনাতিরিক্ত এবং শিল্পের সংকীর্ণতার উদ্বেগজনক প্রদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়।'

— *ড. আলেকজান্ডার হেভেসি*

॥ ১ ॥

উনিশ শতকের মধ্যভাগে ও শেষ-অর্ধে বিস্ময়কর ও অকল্পনীয় সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে মানুষের জীবন-দর্শন ও সমাজ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পালটে গেছে। ১৮২৪ সালে অগাস্ট কমেটের সমাজ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা 'সিস্টেম ডি ফিলসফি পজিটিভ' প্রকাশিত হল। মনুষ্য আচরণের ওপর জন্ম ও পরিবেশের প্রভাব নিয়ে প্রচারে নামলেন চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২)। ১৮৫৯-এ প্রকাশিত তাঁর 'দ্য অরিজিন অব স্পিসিস' ও 'থিয়োরি অব ইভলিউশন' বই দুটি আচরণগত বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করল। ডারউইনের আগে সমাজে এই বিশ্বাস ছিল যে, মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্টি। ডারউইন যুক্তি দিয়ে দেখালেন, মানুষ বংশধারা ও পরিবেশের ফসল। ডারউইনের আগে ধারণা ছিল, জীবজগতের সমস্তরকম প্রজাতি সৃষ্টির শুরু থেকে একইরকম আছে। তাদের কোনও পরিবর্তন হয়নি। ডারউইন এই প্রচলিত ধারণা ও ধর্মের অনুশাসনের বিপরীতে উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণাদির সাহায্যে দেখিয়ে দিলেন, 'সমস্ত প্রজাতি ক্রমশ পরিবর্তিত হয়েছে এবং হচ্ছে। মানুষও তার ব্যতিক্রম নয়। আবার একই প্রজাতির মধ্যেও ভিন্নতা বর্তমান, আর এই ভিন্নতার মধ্য দিয়েই নিরন্তর এক জীবন-সংগ্রাম চলে, যেখানে অভিযোজনের ফলে কোনও প্রজাতি টিকে থাকে, কেউ হারিয়ে যায়।' এই টিকে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে তিনি বললেন, 'সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট'— যোগ্যতমের জয়।

ফরাসি সমালোচক ও ইতিহাসবিদ হিপোলাইট এডলফ তেইন (১৮২৮-১৮৯৩) মানুষের ওপর পরিবেশের প্রভাব নিয়ে গভীর গবেষণা করেন। ১৮৬৪ সালে প্রকাশিত তাঁর 'হিসটোরি ডি লা লিটারেচার অ্যাংগ্লেইস' গ্রন্থে তিনি

বললেন, 'যে স্থানে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, যে পরিবেশের মধ্যে সে বেড়ে ওঠে, যে সমাজে সে বাস করে, তার সবই তার জীবনকে নির্মাণ করে।'

১৮৬৫-তে প্রকাশিত মনোবিদ ক্লড বার্নাডের 'ইনট্রোডাকশন আ লেতুদ ডি লা মেদিসিন এক্সপেরিমেন্টাল' ও ১৮৬৭-তে প্রকাশিত কার্ল মার্ক্সের 'ডাস ক্যাপিটাল' জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে এক নতুন বার্তা বয়ে আনল। মার্ক্স বললেন, 'মানুষের কোনও শাশ্বত চরিত্র নেই, যা আছে তা ইতিহাসের সৃষ্টি।'

১৮৭৯-তে থমাস এডিসন (১৮৪৭-১৯৩১) বৈদ্যুতিক আলো আবিষ্কার করলেন।

১৮৮৪-তে আচরণবিদ গুসটেভ লেবন তাঁর 'সাইকোলজি ডেস ফাউলেস' গ্রন্থে নাট্যদর্শকের আচরণ নিয়ে গবেষণা করে বললেন, 'থিয়েটারের মধ্যে দর্শকের আচরণ থিয়েটারের বাইরের জনতার মতোই একরকম। যে দর্শকরা থিয়েটার দেখার জন্য একত্রিত হন, তাঁরা নিশ্চয়ই এক একজন খুব উঁচু ধরনের বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন। কিন্তু যে মুহূর্তে তাঁরা জনতায় পরিণত হন, তাঁরা জনতার মনোবৃত্তির কবলে পড়েন। জনতা কম বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন, বেশি ভাবোদ্দীপক। নাট্যদর্শকও তাই।

১৮৮৮ সালে জর্জ ইস্টম্যানের (১৮৫৪-১৯৩২) কোডাক ফোটোর আবিষ্কার শিল্পের পরিমণ্ডলকে প্রবলভাবে নাড়িয়ে দেয়।

এই শতকেই আবির্ভূত হলেন আর এক দিকপাল মনোবিদ— সিগমুণ্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯)। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ইন্টারপ্রিটেশন অব ড্রিমস' (১৯০০), 'সাইকোলজি অব এভরিডে লাইফ' (১৯০২), 'দ্য অরিজিন অব সাইকোলজি' (১৯৫৪)। তাঁর 'থিয়োরি অব রিপ্রেশন' তত্ত্বের বা 'মেটাসাইকোলজি'র সার কথা : অবদমিত চিন্তা বা ভাবের সঙ্গে সম্পর্কিত মানসিক শক্তি অবচেতন বা অচেতন মনে অবস্থিত হয়ে নানাভাবে ঘোরাপথে চেতনার রাজ্যে প্রবেশের চেষ্টা করে।

॥ ২॥

এই প্রেক্ষাপটে ফরাসি ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে 'ন্যাচারিলজম' নামে একটি আন্দোলন দানা বেঁধে উঠল। পল অ্যালেক্সিস 'ন্যাচারালিজম' শব্দটি একটি উপমার সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন : 'কোনও ঘরের একটি জানালা দিয়ে উঁকি মেরে রাস্তার অপরদিকের ঘটনাগুলি যদি আমরা দেখার সুযোগ পাই, তবে ঘটনাগুলি যেভাবে ঘটে, আমরা হুবহু তাই দেখি। 'ন্যাচারালিজম' হচ্ছে ঠিক ওইরকম খোলা জানালার মতো। 'ন্যাচারালিজম' শব্দের নানা বাংলা পরিভাষা

তৈরি হয়েছে, যেমন প্রকৃতিবাদ, স্বভাববাদ, যথাস্থিতবাদ।

ন্যাচারালিজমের স্থপতি হলেন ফরাসি ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার এমিল জোলা (১৮৪০-১৯০২)। ১৮৮০-তে প্রকাশিত তাঁর 'লে রোমা এক্সপেরিমঁতাল' নামে একটি প্রবন্ধমালায়, ১৮৮১-তে প্রকাশিত তাঁর 'লে ন্যাচারিলাসন আউ' নামের একটি নিবন্ধে ও তাঁর লেখা 'তেরেস রাকঁ' নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণের (১৮৬৭) ভূমিকায় জোলা কর্নেই ও রাসিনের 'নিও-ক্ল্যাসিজম', ভিক্তর উগোর 'রোমান্টিসিজম' এবং অগাস্ট ফ্রিয়েডারড ফারডিনান্ড ফন কোর্টজিবিউ ও ইউজিন স্ক্রাইবের 'মেলোড্রামা'গুলিকে 'কল্পনাপ্রবণতার বুর্জোয়া বংশধর' বলে তিরস্কার করলেন। জোলা বললেন, 'এইসব নাটক দর্শকদের আর কৌতূহলী করতে পারছে না, কারণ তারা অতীত যুগের ফসল। এইসব নাটকের চরিত্ররা কবিতায় কথা বলে, যা সাধারণ মানুষের ভাষা নয়। তাঁর মতে, ক্যামেরা যেভাবে অশোধিত ও নিদানিক পর্যবেক্ষকের পৃথকতার মতো জীবনের ঘটনা লিপিবদ্ধ করে, থিয়েটারেও ঠিক সেইভাবে বস্তুতন্ত্রতা লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত। জোলা লিখলেন, 'থিয়েটারের কাজ আনন্দদান নয়, মানুষ কী তাই দেখানো।' তাঁর মতে, 'প্রকৃতির সামনে আয়না ধরে দশর্ককে বিশুদ্ধ মানুষ তৈরি করা যায়, কারণ তাতে তাঁরা নিজেদের ত্রুটি ও পাপ-কাজ দেখার সুযোগ পান।'

জোলা চাইলেন, নাট্যকার রক্ত-মাংসের মানুষের জীবন থেকে নাটকীয় মুহূর্ত তুলে ধরুন। এ মানুষ ঈশ্বরও নয়, রাজাও নয়। এ মানুষ আমাদের প্রতিবেশী বা আগন্তুক, বন্ধু বা শত্রু। অতীত যুগের নাটকের 'মার্বেল পাথর' বা 'কার্ডবোর্ড'-এর মতো বীর ও বীরাঙ্গানা নয়। জোলা ঘোষণা করলেন, 'মানুষের কার্যকলাপ পূর্বনির্দিষ্ট নয়। তা চারপাশের মানুষ ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গো সংঘর্ষের ফল।' যেহেতু বাহ্যিক পরিবেষ্টনী মানুষের কার্যকলাপের কারণ, তাই জোলা পরিবেশকে মঞ্চে বিশেষভাবে চিত্রিত হতে দেখতে চাইলেন। তিনি বললেন, 'নাটক হবে প্রত্যক্ষ প্রকৃতির অনুকরণ। জীবনের একখণ্ড প্রতিবিম্ব। তাহলেই দর্শক আর নিষ্ক্রিয় থাকবেন না, তাঁরা মঞ্চের মানবিক ক্রিয়ার অংশীদার হবেন।' জোলার কাছে একখানি নাটক বা উপন্যাস লেখা মানেই হল জীবনকে দেখা এবং তার ঘটনাপঙ্ক্তির যথাযথ চিত্র অঙ্কিত করা। জোলার কাছে একখানি নাটক মানেই একখানি বৈজ্ঞানিক নথি বা প্রমাণপত্র— জীবনের এক নির্ভেজাল অংশ। জোলার কাছে মঞ্চ মানেই জীবনের পরীক্ষাগার। জীবনের বাস্তব সমীক্ষার স্থান। মানব প্রকৃতিকে রঙিন কাচের আড়াল থেকে সরিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে স্পষ্ট ও বিস্তৃতভাবে দর্শকের সম্মুখে তুলে ধরার ক্যানভাস। জোলার কাছে মঞ্চ মানেই জীবনের ফোটোগ্রাফি— তাঁর নিজের ভাষায়, 'আ ব্লিডিং স্লাইস অব

লাইফ'। জোলা চাইলেন, ডাক্তার যেমন রোগীর রোগ নির্ণয় করেন, নাট্যকারও তেমনই সমাজের রোগ নির্ণয় করুন। সমাজের সমস্তরকম নগ্নতাকে, কুৎসিত সংক্রামক রোগকে লোকের দৃষ্টিগোচর করুন। ডারউইনের তত্ত্ব অনুসরণ করে মানুষকে বংশ ও পরিবেশের ফসল হিসেবে দেখান। তিনি উপকথা ও কাল্পনিক জগতের সাজানো কাহিনি ছেড়ে সতেজ জীবনে ডুব দিন। তাঁর কোনও নিয়ম-ফর্মূলা-মানদণ্ড মানার দরকার নেই। তিনি কেবলমাত্র জীবনকে দেখান। দৈনন্দিন জীবনের, এমনকি তুচ্ছাতিতুচ্ছ দিকগুলিরও নিখুঁত বিবৃতি দিন। এতে বিগত দিনের অবক্ষয়ী চিন্তা নিজেই ধসে পড়বে। জোলা আরও বললেন, 'আমাদের পথ পরিষ্কার করার দায়িত্ব আমাদের কাঁধেই তুলে নিতে হবে। থিয়েটারে সমস্ত বস্তাপচা রীতিনীতি সমূলে ধ্বংস করতে হবে। বদলে আনতে হবে কী? বিজ্ঞান। কারণ একমাত্র বিজ্ঞানই থিয়েটারকে বাঁচাতে পারে।'

১৮৬৭-তে প্রকাশিত জোলার প্রথম উপন্যাস 'তেরেস রাকাঁ' বিশাল সাফল্য পায়। ১৯৭০-এ একই নামে তাঁর একটি নাটকও প্রকাশিত হল। ১৮৯১-তে লন্ডনে এই নাটকের ইংরাজি অনুবাদ হয়। ১৯৩৪-এ এই নাটকটি লন্ডনে 'দাউ শ্যাল্ট নট' নামে অভিনীত হয়। ১৯৪৫-এ এটি নিউ ইয়র্কে 'থেরেস' নামে মঞ্চস্থ হয়। ১৮৯৪-এ লন্ডনের গ্রেইনস ইনডিপেনডেন্ট থিয়েটার ক্লাব জোলার আর একটি কমেডি নাটক ইংরাজিতে 'দ্য হেয়ারস অব রবউরডিন' নামে মঞ্চস্থ করে। বুশনাখ ও গাসটিনিউ জোলার একটি উপন্যাসের ইংরাজিতে 'ড্রিঙ্ক' নামে নাট্যরূপ দেন এবং সেটি ১৮৭৯-তে লন্ডনে চার্লস রিড ও চার্লস ওয়ারনার অনেক দিন অভিনয় করেন। ওয়ারনার প্রধান চরিত্র 'কৌপউর' ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই নাটকটিও বহুবার পুনর্জীবিত হয়েছে।

১৮৭১ থেকে ১৮৯৩ সালের মধ্যে ২০ খণ্ডে সমাপ্ত হয়ে জোলার বিশাল উপন্যাস 'লা রুউগন-ম্যাককোরট' প্রকাশিত হয়। এক সমসাময়িক পরিবারের ভাগ্য ও কঠিন বাস্তব নিয়ে লেখা এই উপন্যাস। এরপর জোলা মাদক আসক্তির ওপর ১৮৭৭-এ লেখেন 'দ্য ড্রাম শপ', বেশ্যাবৃত্তি নিয়ে লেখেন 'নানা' (১৮৮০) এবং খনি-শ্রমিকদের নিয়ে নিয়ে লেখেন 'জার্মিনাল'।

॥ ৩ ॥

জোলার মতবাদ শিল্পে, সাহিত্যে ও নাটকে বিরাট প্রভাব ফেলল। পল সেজান বললেন, 'শিল্প হল ইন্দ্রিয়ানুভূতির এক রেকর্ডিং যন্ত্রমাত্র।' গোগোল বললেন, 'শিল্প হল বাস্তবের বিশ্বস্ত প্রতিরূপ।' গোঁকুর ভ্রাতৃদ্বয় বললেন, 'ইতিহাস যেমন কোনও ঘটনার প্রাপ্ত দলিল থেকে লেখা হয়, তেমনই উপন্যাসও লেখা উচিত

ঘটমান বস্তু অবলম্বনে অথবা প্রকৃতিকে অনুকরণ করে।' ফ্লোবেয়ার বললেন, 'বিজ্ঞানীর নিরপেক্ষতাই শিল্পীর কাছে কাম্য।' ফরাসি চিন্তাবিদ, 'প্রত্যক্ষবাদ' বা 'দৃষ্টবাদ'-এর প্রবক্তা ওগুস্ত কোঁৎ (১৭৯৮-১৮৫৭) বললেন, 'যা অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, এরূপ কিছুর অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করি না।' তাঁর ৬ খণ্ডে সমাপ্ত প্রথম গ্রন্থ 'দ্য কোর্স অব পজিটিভ ফিলসফি' (১৮৩০-১৮৪২) ও ৪ খণ্ডে রচিত দ্বিতীয় গ্রন্থ 'সিস্টেম অব পজিটিভ পলিটি : এ ট্রিটিজ ইন অ্যাপ্লায়েড সোসিওলজি'-তে লিখলেন, 'প্রত্যক্ষ প্রকৃতিই চরম সত্তা।'

ন্যাচারিলিস্ট ধারার কথাসাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ ফরাসি ঔপন্যাসিক দুই ভাই উত্ত দু আঁতোয়ান গঁকুর (১৯২২-১৮৯৬) ও উত্ত দু আলফ্রেড গঁকুর (১৮৩০-১৮৭০)। দুই ভাই একসঙ্গো লিখতেন বলে এঁরা 'গঁকুর ভ্রাতৃদ্বয়' নামে পরিচিত। এঁরা সংগৃহীত তথ্য, পর্যবেক্ষণ, সমীক্ষা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ফ্রান্সের সামাজিক ইতিহাস রচনা করতে করতেই তথ্যসমৃদ্ধ উপন্যাস লেখায় প্রণোদিত হন। তাঁদের 'জেরমিনি লাসের ত্যু' (১৮৬৪), 'পার্ল দেমাই' (১৮৬০), 'রেনে মোপেজা' (১৮৬৪), 'সিউয়র ফিলোমেনে', 'লা ফিল এলিজা' (১৮৭৭), 'লে ফ্লোরে জেঙ্গানা' (১৮৭৯) ও 'লা ফাউসঁত্যা' (১৮২২) উপন্যাসগুলির প্রত্যেকটি তথ্যানুসারী। ১৮৮৮-১৮৯৬ সালের মধ্যে ৯ খণ্ডে তাঁদের বিপুল তথ্যসংগ্রহ দিনলিপির আকারে প্রকাশিত হয়।

ফরাসি দার্শনিক, সমাজতন্ত্রবাদী মানবতাবোধে উজ্জ্বল, আনাতোল ফ্রাঁস (১৮৪৪-১৯২৪) ন্যাচারিলিজমের যুগে নিজেকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করেছিলেন। ফরাসি বিপ্লব নিয়ে লেখা 'লে দিয়্যাজোঁ সোয়াফ' (১৯১২) উপন্যাসটিকে তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। রুশ বিপ্লবকে তিনি স্বাগত জানান। ১৯২০-তে ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হলে তিনি কমিউনিস্টদের ও তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সমর্থক হন। ১৯২১-এ তিনি নোবেল পুরস্কার পান এবং পুরস্কারের সব অর্থই রাশিয়ার দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সাহায্যে দান করেন।

বিজ্ঞান ও যুক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত এই ন্যাচারালিস্ট সাহিত্যিকরা মানুষের জৈব দিকের ওপর বেশি জোর দিলেন। বংশধারা, প্রবৃত্তি ও পরিবেশের দ্বারাই যে জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়, তাই তারা দেখাতে চাইলেন। এঁরা বললেন, মানুষ পরিবেশের দাস। প্রবৃত্তিজাত শক্তির কাছে পুতুলমাত্র। এঁরা সাহিত্যকে প্রকৃতির খুব কাছাকাছি নিয়ে এলেন। গোগোল সম্পর্কে বেলিনস্কি বললেন, 'গোগোল শুধু প্রকৃতির বই পড়েন, বাস্তবতার পৃথিবী নিয়ে গবেষণা করেন।'

ন্যাচারালিস্টদের বক্তব্য, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু নেই। সে অন্ধ নিয়তির অসহায় ক্রীড়নকমাত্র। দুর্ভাগ্যের চক্রে তার জীবন নিয়ত আবর্তিত।

সমারসেট মম বললেন, 'জীবনের কোনও মানে নেই। বেঁচে থেকেও মানুষ কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে পারবে না। সে জন্মাক বা নাই জন্মাক, জীবিত থাক বা নাই থাক, কিছু এসে যায় না। মানব-জীবন বৈশিষ্ট্যহীন এবং মৃত্যুর পরেও কিছু অবশিষ্ট থাকে না। এইটাই তার সত্তার অনাবৃত সত্য।' অনেকে তাই এই মতবাদকে 'দুঃখবাদী, নিয়তিচেতনা' আখ্যা দিয়েছেন। জোলার 'জার্মিনাল', হোলৎসের 'পাচ্যা হ্যামলেট'; 'আর্নল্ড বেনেটের 'আন্না অব দ্য ফাইভ টাউনস', সমারসেট মমের 'অফ হিউম্যান বন্ডেজ' ও থিওডোর ড্রেইসারের 'অ্যান আমেরিকান ট্র্যাজেডি' ন্যাচারিলিস্টিক সাহিত্যের উদাহরণ। এছাড়া মঁপাসা, হাউসমানস, জর্জ মুর, জর্জ গিসিং, জি. এম. কনরাড, স্ন্যাফ, হার্ট ভ্রাতৃদ্বয়, ব্লেইবট এবং বলসির উপন্যাসেও ন্যাচারালিজমের প্রভাব পড়েছে।

॥ ৪ ॥

নাট্যসাহিত্যে 'তেরেসা রার্ক্যঁ' নাটকে প্রথম ন্যাচারিলিজমের ব্যবহার করলেন এমিল জোলা। পরে এই নাট্যরীতি ইংল্যান্ডে 'কিচেন সিঙ্ক ড্রামা', ফ্রান্সে 'তেয়াত্র দু কোতিদিক্র' ও জার্মানিতে 'নিও-রিয়ালিজম' নামে আখ্যাত হয়। ফ্রান্সে জোলা প্রবর্তিত নাট্যধারার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার আঁরি বেঁকিউ। তাঁর তিনটি নাটক : 'মাইকেল পউপার' (১৮৭০) 'লা করব্যু' (১৮৮২) ও 'লা প্যারিসিএনি' (১৮৮৫)। আর একজন নাট্যকার হ্যুজেন ইয়ঝিন ব্রিউই (১৮৫৮-১৯৩২)। তাঁর নাটক : 'লা ত্রই ফিলেস দ্য এম দুপঁ' (১৮৯৮), 'লা রোব রোগ' (১৯০০), 'লা অ্যাভারিস' (১৯০২) [এটি ইংরাজিতে 'ড্যামেজড গুডস' নামে অনূদিত হয়ে ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় অভিনীত হয়ে সাড়া জাগিয়েছিল], 'মেটারনাইট' (১৯০৩)— এই নাটকটি জন্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে লেখা।

জার্মান ন্যাচারালিজমের এক বড় নাট্যকার গেরহার্ট হাউপ্টম্যান (১৮৬২-১৯৪৬)। 'বিফোর ডন' নাটকটি লিখে তিনি রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যান। এই নাটকে কোনও নায়ক নেই এবং প্রথাগত ফর্মে নাটকটি লেখাও নয়। মদ্যপানের বিরুদ্ধে লেখা এই নাটকটি ১৮৮৯-তে অটো ব্রাহ্ম (১৮৫৬-১৯১২) ও তাঁর নাট্যদল 'ফ্রি ব্যুহনে' বার্লিনে প্রযোজনা করেন। হাউপ্টমানের 'দ্য উইভার্স'ও (১৮৯২) একটি ঐতিহাসিক নাটক। নাটকটি সাইলেশিয়ান আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত। ১৮৪৪-এ সাইলেশিয়ান তাঁতীদের বিপ্লবের অসাফল্যের কারণ নিয়ে লিখিত এই নাটক শিল্পায়নের খারাপ প্রভাবটি দেখিয়েছে। এই নাটকও প্রথাগত ফর্মে লেখা নয়। এই নাটকই প্রথম প্রলেতারিয়ান ট্র্যাজেডি। এখানে জনতাই নায়ক। তাই এটি পরবর্তী সময়ের নাট্যকারদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে।

নাটকটি প্রথম ১৯১৫-তে ও পরে ১৯৬০-এর দশকে আরও বিস্তার নিয়ে নিউ ইয়র্কে অভিনীত হয়। বার্লিনের একটি বস্তির করুণ কাহিনি নিয়ে লেখা হাউপ্টমানের আর একটি নাটক 'দ্য র‍্যাটস' (১৯১১)। 'বিভার কোট' (১৮৯৩) তাঁর প্রহসনধর্মী একটি কমেডি নাটক। নাৎজি সরকারের বিরুদ্ধে লেখা তাঁর 'ডি অ্যাট্রিডেন' (১৯৪৫) নাটকটি জার্মান পরিচালক এরভিন পিসকাটর ১৯৬২-তে মঞ্চস্থ করেন।

ন্যাচারালিজমের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন রাশিয়ান নাট্যকার আন্তভ চেকভ (১৮৬০-১৯০৪)। কমেডির আবরণে ট্রাজেডি রচনায় সিদ্ধহস্ত এই নাট্যকার তাঁর নিবিড় সৌন্দর্যবোধের সাক্ষ্য রেখে গেছেন তাঁর চারটি নাটকে : 'দ্য সীগাল' (১৮৯৬), 'আংকল ভানিয়া' (১৮৯৯), 'থ্রি সিস্টারস' (১৯০১) ও 'চেরি অর্চার্ড' (১৯০৪)। এই চারটি নাটক ছাড়াও চেকভ আরও নাটক লিখেছেন। যেমন : ৩টি একাঙ্ক কমেডি নাটক : 'দ্য বিয়ার' (১৮৮৮), 'দ্য প্রপোজাল' (১৮৮৯) ও 'দ্য ওয়েডিং' (১৮৯০)। দুটি পূর্ণাঙ্গ নাটক : 'ইভানভ' (১৮৮৯) ও 'দ্য উড ডেমন' (১৮৮৯)। তবে এই নাটকগুলি মঞ্চসফল হয়নি।

১৮৯৬-তে চেকভের 'দ্য সীগাল' নাটকটি প্রথম লেনিনগ্রাদের পিটার্সবুর্গের আলেকজ্যান্দ্রিস্কি থিয়েটারে (এই থিয়েটারটি ১৯২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৭-এ পুশকিনের নামে নামাঙ্কিত হয়) মঞ্চস্থ হয়। মহড়ায় উপস্থিত হয়ে চেকভ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বলেন, 'সবচেয়ে বড় কথা, থিয়েটারিপনা চলবে না। সব কিছু সহজ হবে। একেবারে সহজ। আমার চরিত্ররা সকলেই সাধারণ সাধাসিধে মানুষ।' কিন্তু চেকভের সতর্কবাণী সত্ত্বেও পুরোনো ধাঁচের অভিনয় নিয়ে নাটকটি মঞ্চস্থ হয় ও জনপ্রিয়তা অর্জনে ব্যর্থ হয়। ১৯০৯-এ গ্লাসগো রেপারটরি থিয়েটার ও ১৯১২-তে লন্ডন লিটল থিয়েটার চেকভের 'দ্য সীগাল'-এর প্রথম ইংরেজি অনুবাদ অভিনয় করে। ১৯১১-তে স্টেজ সোসাইটি তাঁর 'দ্য চেরি অর্চার্ড' ও ১৯১৪-তে 'আংকল ভানিয়া' মঞ্চস্থ করে। ১৯২০ সালে লন্ডনে 'থ্রি সিস্টারস' অভিনীত হয়। ১৯২৫-এ অক্সফোর্ড প্লে হাউসের পরিচালক বার্নার্ড ফগন (১৮৭৩-১৯৩৩) লন্ডনে 'আংকল ভানিয়া' মঞ্চস্থ করেন। ১৯২৫ ও ১৯২৬-এ রাশিয়ান পরিচালক থিয়োদোর কোমিজারভস্কি (১৮৮২-১৯৫৪) ইংল্যান্ডের বার্নেস থিয়েটারে চেকভের ৪টি নাটকই মঞ্চস্থ করেন। ১৯২০ সালে রাশিয়া ও ১৯৬০ সালে লন্ডনে 'ইভানভ' মঞ্চস্থ হয়।

জীবনের পূজারি ছিলেন চেকভ। জীবনকে তিনি দেখেছিলেন গভীরভাবে। নানা দিক থেকে। তাঁর চোখে জীবন এক অদ্ভুত সত্য। অদ্ভুত আর মহীয়ান।

পলক-বেদনায় মিশ্রিত এক পরম সত্য। তাই তাঁর নাটকে ভিড় করে এসেছে মানবীয় বেদনায় অভিষিক্ত, প্রীতির সূত্রে জড়িত সব স্বাভাবিক মানুষেরা—ত্রোফিমোভ, আনিয়া, মাদাম রেনিভস্কি, ইয়ামা, ক্রিস।

ন্যাচারালিজম কোনও উত্তুঙ্গ শিখরে পৌঁছতে পারে, চেকভের 'দ্য চেরি অর্চার্ড' নাটক তার এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই নাটকে সোচ্চার হয়েছে আশাবাদের কথা। আনিয়া, লোপাহিন আর ত্রোফিমোভের সংলাপের মধ্যেই তা সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে :

আনিয়া — বিদায় পুরোনো বাড়ি, পুরোনো জীবন।

লোপাহিন — এখনও বসন্তকাল চলছে।

ত্রোফিমোভ — হ্যাঁ, চাঁদ উঠেছে... সে আসছে। সে ক্রমশ কাছে, আরও কাছে আসছে। আমি তার পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। যদি আমরা তাকে দেখতেও না পাই, যদি আমরা তাকে কখনও জানতেও না পারি, তাহলেই বা কী এসে যায়? আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম তাকে নিশ্চয়ই দেখতে পাবে। সে এক নতুন বাগান করবে। এর থেকে সেটা আরও সুন্দর হবে। তুমি তা দেখবে। অনুভব করবে। আনন্দ ও শান্তি বিকেলের সূর্যের মতো তোমার আত্মার গভীরে ডুব দেবে।

এই নাটকের শেষ দৃশ্যে চেকভ পুরাতনের প্রেক্ষাপটে নতুনের বোধন করেছেন·

[একে একে আলো নিভে যায়। সবাই চলে যায়। কেবল বৃদ্ধা, মুমূর্ষু ক্রিস প্রেতের মতো একা একা ঘুরে বেড়ায়। তার অন্তিম কণ্ঠস্বর শোনা যায়]

ক্রিস — জীবন চলে গেছে আমাকে ফেলে, যেন কোনও দিনই বাঁচিনি (শুয়ে পড়ে) কিছুক্ষণ পড়ে থাকব আমি... আর আমার শক্তি নেই... নেই, কিছু নেই... গেছে, সব গেছে। উঃ, আমি কোনও কাজেরই যোগ্য নই।

[বাইরে বাগিচায় গাছ কাটার শব্দ শোনা যায়। চেরি বাগিচাকে মনে হচ্ছে কতকগুলি কেন্দ্রপুঞ্জ। এক কেন্দ্রের অবলুপ্তি হচ্ছে। অন্য কেন্দ্রের পত্তন ঘটছে]

ন্যাচারালিস্টিক নাটক হলেও চেকভ এই নাটকের প্রতিটি অঙ্কের সূচনায় যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা কাব্যিক ভাষা। যেমন :

প্রথম অঙ্ক — যবনিকা উত্তোলনের সঙ্গো সঙ্গো প্রভাত-সূর্য উঠছে। মে মাস। চেরি গাছে ফুল ফুটেছে। কিন্তু বাগিচার ঠান্ডা প্রত্যুষের

শিশিরপাতের জন্য ঘরের জানালাগুলি বন্ধ।

দ্বিতীয় অঙ্ক মুক্ত দেশ। একটি পুরোনো মন্দির। অনেক দিনের পরিত্যক্ত। ভেঙে পড়েছে। কাছেই একটি কুয়ো। একদা যা সমাধিফলক ছিল, তেমন কতকগুলি বড় বড় পাথর পড়ে আছে। একটি বসবার আসন। গেভের বাড়ির পথ দেখা যাচ্ছে। একদিকে খাড়া হয়ে উঠেছে কালো কালো পপলার গাছ। এখান থেকেই চেরি বাগিচার শুরু। দূরে দেখা যাচ্ছে টেলিগ্রাফের পোস্ট। আরও দূরে বড় একটি শহরে ধূসর দিগন্তরেখা। দৃশ্যমান শুধু সুন্দর উজ্জ্বল আবহাওয়া। প্রায় গোধূলি।

তৃতীয় অঙ্ক একটি বড় বৈঠকখানার হলে এরা ঘুরে ঘুরে চক্রাকারে নাচছে।

চতুর্থ অঙ্ক প্রথম অঙ্কেরই অনুরূপ দৃশ্যপট। এগুলি তো বটেই, তাছাড়া আছে চরিত্রগুলির সংলাপ এবং তাদের অন্তরবাহী চেতনা।

সোভিয়েত নাট্যকার ম্যাক্সিম গোর্কির (১৮৬৬-১৯৩৬) 'দ্য লোয়ার ডেপথস' নাটকটি ন্যাচারিলিজমের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যে ক'টি নাটকে গোর্কি প্রাক-বিপ্লব রুশ জীবনের ভাষ্য তৈরি করেছেন, তার ভিতর এই নাটকটি বিখ্যাত। গোর্কি ১৮৯১-এর এপ্রিল মাস থেকে ১৮৯২-এর অক্টোবর মাস পর্যন্ত দীর্ঘ দেড় বছর পায়ে হেঁটে রুশ দেশের এক বিরাট অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। যাপন করেন বস্তুত এক ভবঘুরের জীবন। এই পরম অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি লেখেন 'দ্য লোয়ার ডেপথস'। সামাজিক দৃষ্টিতে যাদের কোনও মূল্য নেই, যারা সমাজের জঞ্জাল বলে মনে হয়, তাদেরও যে আত্মার সত্তা আছে, গ্লানির মধ্যেও জীবনবোধ আছে, এই নাটকে সেইদিকেই অঙ্গুলিসংকেত করেছেন গোর্কি। তাঁর এই নাটকে ব্যক্তিবিশেষ নায়ক নয়, সমস্ত চরিত্র মিলে নায়ক হয়ে উঠেছে। এই নাটকে প্রতিকূল চরিত্রের ভূমিকা নিয়েছে 'পরিবেশ'। চরিত্ররা যেন সমাজের বলি-প্রদত্ত। গোর্কি সম্পর্কে চেকভ বলেছেন, 'গোর্কির কাজ হল ধ্বংসাত্মক। যা কিছু ধ্বংস হওয়া উচিত, তাকে নিশ্চিতভাবে ধ্বংস করাই হল ওঁর কাজ। ১৯৩২-এ গোর্কি 'অর্ডার অফ লেনিন' পুরস্কারে সম্মানিত হন।

আর এক সোভিয়েত নাট্যকার ভেসিভোলদ আইভানভ (১৮৯৫-১৯৬৩) ১৫টি ন্যাচারালিস্টিক নাটক লিখেছেন। তাঁর নাটকগুলি প্রধানত রাশিয়ার গৃহযুদ্ধের ওপর লিখিত। এইসব নাটকে তিনি লালফৌজ, তাঁর নিজের জন্ম ও কর্মস্থান সাইবেরিয়া ও এশিয়াটিক রাশিয়ার কথা লেখেন। তাঁর 'আরমার্ড ট্রেন ১৪-৬৯' (১৯২২) বিপ্লবের ১০ম বার্ষিকী অনুষ্ঠানে মঞ্চস্থ হয়। গৃহযুদ্ধের ওপর লেখা তাঁর নাটক : 'ব্লকেড' (১৯২৯), 'দ্য কম্প্রোমাইজ অব নইক সান'

(১৯৩১), 'দ্য ডেভিস সি দ্য ডিপারটিং ক্রুসিয়ার্স' (১৯৩৭), 'আংকল কোষ্টিয়া' (১৯৪৪), 'টুয়েলভ ইয়ুথস ফ্রম আ স্ন্যাফবক্স' (১৯৩৬), 'ইনস্পিরেশন' (১৯৪০), 'লোমোনোসভ' (১৯৫৩)।

মার্কিন নাট্যকার ইউজিন ও'নিল তাঁর 'ডিজায়ার আন্ডার দ্য এলমস' (১৯২৪) নাটকে নায়ক করেছেন নিউ ইংল্যান্ডের আদিম শ্রেণীর মানুষকে। নাটকের পাত্রপাত্রীরা যে জীবনযাপন করে তা পশু স্তরের।

ন্যাচারালিস্ট নাট্যকাররা মানুষের জৈবরূপটি হুবহু তুলে ধরে তাকে প্রাকৃতিক জীব হিসেবে উপস্থিত করেছেন বলে মানুষের যৌনাকাঙ্ক্ষা, বিকৃতি ও অধঃপতন, ব্যাধি ও তদ্‌জনিত কষ্ট তাঁদের নাটকে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁরা নিম্নশ্রেণীর মানুষদের ভয়ঙ্কর ও কদর্য জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়কে উপস্থাপনের দিকে জোর দিয়েছেন। বেশিরভাগ ন্যাচারালিস্ট নাটকের ভাষা হয়েছে হয় কথ্য বা গদ্যময়, নয়তো আঞ্চলিক বা কদর্য।

সাহিত্যে যেমন ন্যাচারালিজমের উদ্‌গাতা হিসেবে ফ্রান্সের এমিল জোলার নাম উল্লিখিত হয়, থিয়েটারেও তেমনই ন্যাচারিলিজমের প্রবর্তক বলে ফরাসি পরিচালক ও অভিনেতা আঁদ্রে আঁতোয়ানকে (১৮৫৮-১৯৪৩) গণ্য করা হয়। ন্যাচারালিস্টিক নাটক প্রযোজনার জন্য তিনি ১৮৮০-র ৩০ মে প্যারিসে 'তেয়াত্র লিব্রতে' নামে ৩৪৩ আসনবিশিষ্ট একটি ছোট রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন। আঁতোয়ানেব তৈরি এই রঙ্গমঞ্চই ইউরোপের প্রথম আ্রুনিক 'ল্যাবরেটরি থিয়েটার'। এই রঙ্গমঞ্চেই ১৮৮৭-তে জেলার 'তেরেসা রাকাঁ' প্রযোজনা করে আঁতোয়ান থিয়েটার জগতে বিপ্লব করে ফেলেন। তিনি এই রঙ্গমঞ্চকে নতুন নাটক প্রযোজনায় উৎসাহীদের সদর বানিয়ে দিলেন। আঁতোয়ানই প্রথম ফ্রান্সে 'মিস-এন-সিন' চালু করেন। তিনিই প্রথম ফ্রান্সে অপেশাদার অভিনয়কে একটি সম্ভ্রান্ত কার্যকলাপ করে তোলেন। তিনিই প্রথম ফ্রান্সে 'তারকা-প্রথা' ভেঙে দেন। এই তারকা-প্রথাই যে নাটকের বিকাশের প্রধান অন্তরায়, তিনিই প্রথম সেটা ফ্রান্সে প্রমাণ করে দেখান।

আঁতোয়ান ফ্রান্সের নাগরিকদের কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে তাঁর থিয়েটার চালাতেন। প্রথমে তিনি ৩,৫০০ ফ্রাঁ সংগ্রহ করেন। তার মধ্য থেকে মহড়ার জন্য ১০০ ফ্রাঁ দিয়ে একটি জায়গা ভাড়া নেন। বুই লেপিকের একটি বার-এও কিছুদিন মহড়া দেন। তিনি তাঁর নাটকের আসবাবপত্র মায়ের বাড়ি থেকে নিয়ে আসতেন। ডাকখরচ বাঁচাবার জন্য বন্ধুরা নাট্যানুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিলি করে আসতেন। শীঘ্রই দর্শকসংখ্যা বাড়তে থাকে ও দ্বিতীয় বর্ষে ৪০,০০০ ফ্রাঁ চাঁদা ওঠে। ওই টাকা থেকে আঁতোয়ান দৃশ্যপট কেনেন ও অভিনেতাদের মাহিনা

দেন। আঁতোয়ানকে অনুসরণ করে জার্মানিতে অটো ব্রাহ্ম ফ্রেই ব্যুহনে বা নিউ ফ্রি পিপলস স্টেজ নামে একটি নাট্যদল প্রতিষ্ঠা করেন। এই নাট্যদলের সভ্যসংখ্যা ছিল ৫০,০০০। সভ্যরাই রঙ্গালয় তৈরি করেন।

আঁতোয়ান বিভিন্ন দেশের ৫৫ জন নাট্যকারের নাটক তাঁর তেয়াত্র লিব্রতে মঞ্চে উপহার দিয়েছেন। তার মধ্যে 'ককারডে', 'উন প্রিফেট', 'উনইসেলি পোমে' ও 'জাক দি এমার' নামে চারটি একাঙ্ক নাটকও আছে। তিনি ১৮৮৮ সালে তলস্তয়ের 'দ্য পাওয়ার অব ডার্কনেস', ১৮৯০-এ ইবসেনের 'গোস্টস', ১৮৯১-এ ইবসেনের 'দ্য ওয়াইল্ড ডাক', ১৮৯৩-এ স্ট্রিন্ডবার্গের 'মিস জুলি' এবং হাউপ্টমানের 'দ্য উইভারস' মঞ্চস্থ করেন। রাশিয়ায় যখন 'দ্য পাওয়ার অব ডার্কনেস'-এর অভিনয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে তখনই আঁতোয়ান এই নাটকটি তাঁর 'তেয়াত্র লিব্রতে' মঞ্চে প্রথম প্রযোজনা হিসেবে নামান। এই প্রযোজনা পত্রপত্রিকা ও দর্শকের সাধুবাদ ও উচ্চ প্রশংসা জয় করে নেয়। 'রেভ্যু দেস দিউ মনতেস' পত্রিকা লেখে, 'চার ঘণ্টা আমরা নিবিষ্ট হয়ে এই প্রযোজনাটি দেখলাম। আমরা ভুলে গেলাম আমরা থিয়েটার হলে বসে আছি।' আঁতোয়ানের 'গোস্টস' ফ্রান্সে ইবসেনের প্রথম নাটক প্রযোজনা। আঁতোয়ান নিজে অসওয়াল্ডের অভিনয় করেছিলেন। কয়েকটি ফরাসি সংবাদপত্র এই প্রযোজনাটিকে একটি চূড়ান্ত ব্যর্থতা বলে মন্তব্য করে। কিন্তু সব ফরাসি সমালোচক একমত হননি। জুলি লিমেয়া, পল দেসজারর্দি, জর্জ মুর প্রমুখ এই প্রযোজনাটিকে 'একটি সুন্দর ও বলিষ্ঠ ট্র্যাজেডি' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

আঁতোয়ান বুঝেছিলেন, ন্যাচারালিস্টিক নাটককে প্রাণবন্ত করে তুলতে হলে স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্বাভাবিক পরিবেশই চরিত্র ও ঘটনার স্বাভাবিকত্বকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। তাই মঞ্চসজ্জায় বাস্তবের নিখুঁত ছবি তৈরি করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তিনি চাইলেন, ঘরের এমন দৃশ্য তৈরি হবে যাতে মনে হয় ঘরের 'চতুর্থ দেওয়াল' দর্শকের দেখার জন্য সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ১৯০৩-এর ১ এপ্রিল 'লা রেভ্যু দি পারি'তে তিনি লিখলেন, 'একটি দৃশ্যপটকে প্রকৃত, আকর্ষণীয় ও প্রামাণিক করে তুলতে হলে প্রাকৃতিক দৃশ্য বা ঘরের অভ্যন্তর যাই হোক না, যেমন দেখা যায় ঠিক সেইরকম তৈরি করতে হবে। যদি সেটি ঘরের অভ্যন্তরীণ দৃশ্য হয়, তবে তার চারটি দিকই তৈরি করতে হবে। অভ্যন্তরের এমনভাবে নকশা করতে হবে যাতে মনে হয় একটি বাড়ির এই ঘরটি একটি অংশমাত্র। ওপরে থাকবে সিলিং অথবা কড়ি-বড়গা। তারপর ডিজাইনার অনেক ছোট ছোট আসবাবপত্র ও ছবি দিয়ে মঞ্চকে ভর্তি করে দেবেন, যাতে মনে হয় এই ঘর রোজ ব্যবহৃত হয়।

আঁতোয়ানের ভাষায়, 'মঞ্চসজ্জা হল মানুষের জীবনের অবিচ্ছিন্ন ঘটনার নীরব সাক্ষী, নীরব চরিত্র।' তিনি ঘরের দেওয়ালগুলিকে যতদূর সম্ভব নিরেট করে দেখালেন। সত্যিকারের দরজা-জানালা তৈরি করে মঞ্চে বসালেন। পরিবেশ ও দর্শকের দৃষ্টি-সুখের জন্য মঞ্চে অনেক বস্তুসামগ্রী সাজিয়ে রাখলেন। তিনি দৃশ্য-পরিকল্পনায় বাস্তবের এতটাই হুবহু অনুকরণের চেষ্টা করতেন যে, ১৮৮৮ সালে একটি নাটকে কসাইয়ের দোকানের একটি দৃশ্যসৃষ্টির জন্য আসল মাংসের চাঁই রাখলেন। জোলা যেমন দাবি করলেন 'পরিবেশের হুবহু অনুকরণ চাই', আঁতোয়ানও তেমনই তাঁকে অনুসরণ করে ফোটোগ্রাফিক সত্যতার খুঁটিনাটি দিয়ে মঞ্চে বাস্তবের হুবহু পরিবেশ তৈরি করলেন।

ওডিয়ন থিয়েটারের পরিচালক হিসেবে কাজ করার সময় আঁতোয়ান তাঁর নতুন ধারার মঞ্চসজ্জাকে ব্যবহার করলেন। শুধু ন্যাচারিলিস্টিক নাটকের জন্যই নয়— এসকাইলাস, সোফোক্লেস, শেক্সপীয়র, ক্যালডেরন, রাসিন, মলিয়ের, গ্যোয়টে এবং শিলারের ক্লাসিক নাটকগুলির ক্ষেত্রেও তা প্রয়োগ করলেন। তিনি এইসব নাটকে যথাযথ সেট ব্যবহার করে সেই সময়কার প্রকৃত চিত্র দর্শকের কাছে তুলে ধরলেন।

আঁতোয়ান মঞ্চ-আলোকেও উন্নত করলেন। আলোর ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করলেন। প্রথমেই তিনি ফুটলাইট সরিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, 'বাস্তবে আলো আসে ওপর থেকে, নিচ থেকে নয়— সে সূর্যের আলোই হোক বা কৃত্রিম বৈদ্যুতিক আলোই হোক।' তিনি 'সাইড রিফ্লেক্টর' তৈরি করলেন। সীমিত যন্ত্রপাতি নিয়ে অনেক আলোর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করলেন। মঞ্চের যে সমস্ত জায়গায় অ্যাকশন সংঘটিত হচ্ছে, সেইসব জায়গা আলোকিত করার জন্য তিনি বিভিন্ন আলোর প্রাখর্য সৃষ্টি করলেন। দিন ও রাত্রির তফাত বোঝাতে তিনি দিনের আলোর জন্য তীব্র আলো ও রাত্রির অন্ধকারের জন্য নিষ্প্রভ আলো ব্যবহার করলেন। তিনিই প্রথম নাটক শুরুর প্রাক-মুহূর্তে প্রেক্ষাগৃহের আলো নিয়ন্ত্রিত করে ধীরে ধীরে প্রেক্ষাগৃহ অন্ধকার করে দিলেন। তিনিই প্রথম বৈদ্যুতিক আলোর সুবিধাগুলি গ্রহণ করলেন। যেমন, কোনও কিছুকে দর্শকের আড়ালে রাখা, সর্বদা তীব্রতার সমাবস্থা থেকে অধিক আলো পাওয়া, মঞ্চের সমস্ত কোণই সমভাবে আলোকিত করতে পারা।

আঁতোয়ান অভিনয়ধারাতেও যুগান্তকারী পরিবর্তন আনলেন। তিনি উপলব্ধি করলেন, 'পাবি কনজারভেটার'-এর প্রতিষ্ঠিত অভিনয়শৈলী, 'কমেদিয়া ফ্রাঁসোয়া'-র অভিনয়রীতি এবং 'ফরাসি ক্লাসিকাল থিয়েটারে-এর অভিনয়ের প্রথা-প্রকরণ এই পেশাকে পঙ্গু করে দিয়েছে। রেপারটরির প্রয়োজনে এইসব

প্রতিষ্ঠান ফরাসি অভিনেতাদের একটি বিশেষ 'টাইপ' সৃষ্টি করতে বলত। তাঁদের শুধুই বাচিক অভিনয় শেখানো হত। 'আবৃত্তি' করার দিকে ঝোঁক দেওয়া হত। স্বাভাবিক কথা বলার পরিবর্তে শব্দের ওপর ঝোঁক বা জোর দেওয়া হত। স্বাভাবিক কথা বলার পরিবর্তে শব্দের ওপর ঝোঁক বা জোর দেওয়া ও সুরের কথা বলা শেখানো হত। চরিত্র যাই হোক না কেন, চলাফেরার সময় তাঁদের কথা বলতে দেওয়া হত না। এইরকম একশটা বিধি তাঁদের মেনে চলতে হত।

আঁতোয়ান বুঝলেন, এই অভিনয়রীতি দিয়ে ন্যাচারিস্টিক নাটক মঞ্চস্থ করা যাবে না। তাই তিনি এতদিনের প্রচলিত রীতি সম্পূর্ণ পালটে দিলেন। তিনি প্রথমেই 'চতুর্থ দেওয়াল'-এর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে অভিনেতাদের দর্শকের উপস্থিতি সম্বন্ধে ভুলে যেতে বললেন। ফরাসি নাট্যকার ও সমালোচক দেনিস দিদেরো (১৭১৩-১৭৮৪) অভিনেতাদের নিজেদের মধ্যে আরও বেশি স্বাভাবিক অন্তঃক্রিয়া সৃষ্টি করার জন্য এই কাল্পনিক চতুর্থ দেওয়ালের প্রস্তাব দেন। ১৭৫৮ সালে 'অন ড্রামাটিক পোয়েট্রি'-তে দিদেরো বলেছেন, 'কল্পনা করো মঞ্চের সামনের দিকটি দেওয়াল দিয়ে ঢাকা আছে। দর্শকের কাছ থেকে তোমাকে পৃথক করে রাখা হয়েছে। অভিনয় করো যেন মনে হয় যবনিকা ওঠেনি।' আঁতোয়ান দিদেরোর এই তত্ত্ব খুব ভালোভাবেই কাজে লাগিয়েছেন। তিনি অভিনেতাদের যেন দর্শক নেই এমনভাবে অভিনয় করতে বলেছেন। এমনকি তিনি দেওয়ালের সেট বানিয়ে পরে ঠিক করতেন কোন দেওয়ালটি সরানো হবে।

আঁতোয়ান তাঁর অভিনেতাদের শুধু কণ্ঠস্বরের ব্যবহার ও হাতের ভঙ্গিমা না করে সমস্ত শরীর দিয়ে অভিনয় করতে বলতেন। নিজস্ব ঘরে যেভাবে হাঁটাচলা করা হয়, এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে দর্শকের দিকে পিছন ফিরে অভিনয় করতে হলেও, সেইরকম হাঁটাচলা করতে উৎসাহ দিলেন। বাচনভঙ্গির ক্ষেত্রেও তিনি উল্লেখযোগ্য সংযোজন করলেন। তিনি আবেগময় বক্তৃতারীতিকে বর্জন করলেন। বাস্তব জীবনের মতো অভিনেতাদের সংলাপ বলতে বললেন। সহ-অভিনেতাদের দিকে না তাকিয়ে দর্শকের দিকে মুখ করে সরাসরি কথা বলাও নিষিদ্ধ করে দিলেন। আবেগ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তিনি আবেগের বাহ্য বৈশিষ্ট্যতে মনোযোগ দিতে বললেন। তিনি বললেন, 'বাস্তব জীবনে বিশুদ্ধ আবেগ কখনও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় না। সম্পূর্ণভাবে প্রকাশের পরিবর্তে তা ইঙ্গিতে বোঝানো হয়। অভিনেতাদেরও তাই সেই জিনিসই বলা বা করা উচিত, যা মানুষ দৈনন্দিন জীবনে বলে বা করে।'

আঁতোয়ান তাঁর অভিনেতাদের প্রম্পটারের দিকে তাকাতে বারণ করলেন। তিনি তাঁদের লোক-দেখানো কৃত্রিম ভঙ্গিমা অথবা দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার

জন্য অযৌক্তিকভাবে দর্শকের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে অভিনয় করতে দিলেন না। প্রচলিত নিয়ম ভেঙে তাঁরা প্রয়োজনমতো দর্শকের দিকে পিছন ফিরে বা ঘুরে অভিনয় করতেন। প্রত্যেকটি ভূমিকায় অভিনয় করার সময় তিনি তাঁদের বিভিন্ন সম্ভাবনা ও ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করতে বললেন। তাঁদের স্বাভাবিক ভঙ্গিমা এবং সাধারণ জীবনের মতো আচরণ করতে বললেন।

পরিচালক হিসেবে আঁতোয়ান অভিনেতাদের বাচনভঙ্গি, অঙ্গভঙ্গি এবং বিজনেসের অনুপুঙ্খ বিশদতায় তীক্ষ্ণ লক্ষ রাখতেন। তিনি বলতেন, 'একটি পেনসিল ফেরত দেওয়া বা একটি কাপের ওপর ধীরে ধীরে টোকা মারাও দর্শকের মনকে আলোড়িত করার পক্ষে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।' তিনি সাজানো মঞ্চে প্রকৃত আসবাব ও প্রকৃত ব্যবহার্য বস্তুসহ অভিনেতাদের নিয়ে সমবেতভাবে মহড়া দিতেন। তিনি মনে করতেন, পরিচালকের ধৈর্যসহকারে অতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলিকে এতটাই নজর দেওয়া উচিত যাতে দর্শক মনে করতে বাধ্য হন যে তাঁরা যা দেখছেন তা আসল, কৃত্রিম নয়।

দর্শক যাতে ধ্রুপদি নাটকের রসাস্বাদন করতে পারেন, নাটকে বর্ণিত ঘটনা ও চরিত্র যাতে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে, সেই জন্য এই রীতির নাটকের ক্ষেত্রেও প্রচলিত কৃত্রিম সুরে সংলাপ বলা ও কৃত্রিম অঙ্গসঞ্চালনের পরিবর্তে তিনি অভিনয়ে নিয়ে এলেন সহজতা ও স্বাভাবিকতা। আঁতোয়ানের ক্লাসিক নাটকের এই উপস্থাপনরীতি পরবর্তীকালে সর্বত্র গ্রহণ করা হয়েছে।

১৮৮০ সালে ফ্রান্সে আঁতোয়ান 'তেয়াত্র লিব্রতে' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁকে অনুসরণ করে ১৮৮৯-তে বার্লিনে অটো ব্রাহ্‌ম 'ফ্রেই ব্যুহনে' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯১-এ লন্ডনে জে. টি. গ্রেইন (১৮৬২-১৯৩৫) রয়্যাল থিয়েটারে ইনডিপেনডেন্ট থিয়েটার ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রেইনের ইংরেজি নাটকের সমালোচনা ১৮৯৮, ১৯০৩, ১৯২১ ও ১৯২৪-এ ৫টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৬ সালে 'জে. টি. গ্রেইন : দা স্টোরি অব আ পাইয়োনিয়ার' নামে তাঁর জীবনগ্রন্থটি প্রকাশ করেন তাঁর বিধবা স্ত্রী মাইকেল ওরমি। আঁতোয়ান, ব্রাহ্‌ম ও গ্রেইন— এই তিনজনের মধ্যে মিল হল, এঁরা প্রত্যেকেই ইবসেনের 'গোস্টস' নাটকটি প্রযোজনা করেছেন। এঁরা তিনজনই মঞ্চ সাজিয়েছেন বাস্তবের অনুকরণে। এঁদের অভিনেতারা সংলাপ বলেছেন কথোপকথনের ভঙ্গিতে। খুব স্বাভাবিকভাবে, সাবলীল ছন্দে। এই তিনজন পরিচালকই বাস্তবের নির্ভুল ইলিউশন সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। এঁরা তিনজনই আগের সমস্তরকম নাটক প্রযোজনার প্রথা-প্রকরণকে বর্জন করেছেন। এঁরা তিনজনই দৃশ্যপট থেকে অভিনয়শৈলী সংলাপ-কথন থেকে অঙ্গরাগ, সমস্ত দিক থেকে থিয়েটারে এক

নবযুগের সূচনা করেছেন। এঁরা তিনজনই ন্যাচারিলিস্টিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।

॥ ৬॥

ন্যাচারালিস্টিক থিয়েটারের পূর্ণ বিকাশ ঘটায় সোভিয়েত রাশিয়ার পৃথিবী বিখ্যাত মস্কো আর্ট থিয়েটার (১৮৯৮-১৯৮৫)। সংক্ষেপে 'ম্যাট'। ১৮৯৮-এ কনস্তানতিন স্তানিস্লাভস্কি (১৮৬৩-১৯৩৮) ও নেমিরোভিচ দানচেংকো (১৮৫৯-১৯৪৩) মস্কোতে একটি সমবায় সমিতি হিসেবে এই নাট্যদল প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন মেয়ারহোলদ, তোইরভ ও ওখলোপকভ। এই নাট্যদলের প্রযোজনার দিকটি দেখতেন স্তানিস্লাভস্কি ও প্রশাসনের দিকটি দেখতেন দানচেংকো। 'ম্যাট'-এর সমস্ত প্রযোজনার মঞ্চ-পরিকল্পনা করতেন রাশিয়ান ডিজাইনার আনদ্রোভিচ ভিক্তর সাইমভ (১৮৫৮-১৯৩৫)। প্রখ্যাত অভিনেতা আইভানেভিচ ভাসিলি কাচালভ (১৮৭৫-১৯৪৮), মিখাইলোভিচ ইভান মস্কভিন (১৮৭৪-১৯৪৬) এবং চেকভের বিধবা স্ত্রী ওলগা নিপার চেকোভা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই নাট্যদলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নবীন অভিনেতাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।

'ম্যাট'-এর মূল নাট্যগৃহ ও নাট্যদল ছাড়া আরও ৩টি শাখা নাট্যগৃহ ও নাট্যদল ছিল। সেগুলি হল : ১৯১৩ সালে স্থাপিত লিওপোলদ সুখের জিতস্কির পরিচালনায় 'ফার্স্ট স্টুডিও', ১৯১৪-তে মাইকেল চেকভের পরিচালনায় 'সেকেন্ড স্টুডিও' (পরে এই স্টুডিওর নামকরণ হয় 'নেমিরোভিচ দানচেংকো মিউজিকাল থিয়েটার') এবং ১৯১৫-তে ইউজিন ভাখতানগভের পরিচালনায় 'থার্ড স্টুডিও' (পরে নামকরণ হয় 'ভাগতানগভ থিয়েটার')। 'ম্যাট' বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের সময়েও বেঁচে ছিল এবং ১৯২২ থেকে ১৯২৩ পর্যন্ত এই দু-বছর ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করে। এরপর ১৯৫৮, ১৯৬৩ ও ১৯৭০ সালে 'ম্যাট' চেকভের নাটকগুলি নিয়ে লন্ডনে যায় এবং ভূয়সী প্রশংসা পায়। ১৯৭৩ সালে 'ম্যাট' পুরোনো জায়গা ছেড়ে ১৮০০ দর্শকাসনবিশিষ্ট একটি বড় রঙ্গমঞ্চে চলে আসে। পুরোনো জায়গায় নাট্য-বিদ্যালয়টি থেকে যায়। ১৯৮৫ সালের পর দু-জায়গা থেকেই এই থিয়েটার এককভাবে নাট্য-প্রযোজনা করে যাচ্ছে। নতুন জায়গায় মহড়া দেওয়ার জন্য একটি ছোট রঙ্গমঞ্চ, দুটি রেকর্ডিং-ঘর ও একটি নাট্য-জাদুঘর আছে। 'ম্যাট' এখন ম্যাক্সিম গোর্কির নামে উৎসর্গ করা হয়েছে।

১৮৯৮-তে তলস্তয়ের 'জার ফিওদোর ইভানোভিচ', ১৯০০-তে অস্ত্রোভস্কির 'স্নো মেইডেন' ও ১৯০২-এ তলস্তয়ের 'দ্য পাওয়ার অব ডার্কনেস' মঞ্চস্থ করে

'ম্যাট'-এর যাত্রা শুরু হয়। তবে চেকভের ন্যাচারালিস্টিক নাটক 'দা সীগাল' (১৮৯৮), 'আংকল ভানিয়া' (১৮৯৯), 'থ্রি সিস্টারস' (১৯০১) ও 'দা চেরি অর্চার্ড' (১৯০৪) এবং গোর্কির ন্যাচারালিস্টিক নাটক 'দ্য লোয়ার ডেপথস' (১৯০২) প্রযোজনা করেই 'ম্যাট'-এর ভুবনজোড়া প্রসিদ্ধি হয়। 'ম্যাট'-এর অন্যান্য প্রযোজনার মধ্যে আছে : গোর্কির 'ইয়েগর বুলিকভ অ্যান্ড আদারস' (১৯৩২), শেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সিজার' (১৯০৩), তলস্তয়ের 'লিভিং করপস' (১৯৩১), ইবসেনের 'অ্যান এনিমি অব দ্য পিপল' (১৯০৬), গোগোলের 'ডেড সোল' (১৯৩২)। 'ম্যাট'-এর বিপ্লবোত্তর প্রযোজনার মধ্যে আছে সোভিয়েত নাট্যকার ভিয়াচেশ লাভোভিস ইভানভের (১৮৯৫-১৯৬৩) 'আরমার্ড ট্রেন ১৪-৬৯' (১৯২৭) এবং মিখাইল বুলগাকভের (১৮৯১-১৯৪০) 'দ্য ডেজ অব দ্য টারবিনস' (১৯২৬)। এই প্রযোজনাটি বলশেভিক কর্তৃপক্ষকে ক্ষিপ্ত করেছিল। বুলগাকভ পরে 'ব্ল্যাক স্নো' নামে একটি নিষিদ্ধ উপন্যাসকে প্রহসনের রূপ দেন।

'ম্যাট'-এর প্রথম প্রযোজনা তলস্তয়ের 'জার ফিওদোর ইভানোভিচ'-এর মহলা শুরুর আগে মধ্যযুগীয় জার ফিওদোরের সমযকাল ও জীবনধারা নিয়ে প্রচুর গবেষণা করা হয়। রাশিয়ার কয়েকটি মধ্যযুগীয় শহরও ব্যাপকভাবে পরিদর্শন করা হয়। এই নাটকের দৃশ্য-পরিকল্পনায় বাস্তবের প্রামাণ্যতা দর্শকদের বিস্মিত করেছে। কাঠের স্তম্ভ দিয়ে ঘেরা আর্ট অ্যাঞ্জেলের ক্যাথিড্রাল গৃহ, ক্রেমলিনে জার ফিওদোরের আবাসগৃহ, মস্কো শহরের অংশবিশেষ প্রভৃতি এমন বাস্তবসম্মত ও বিশ্বাস্য করে নির্মাণ করা হয়েছিল যে, দর্শকরা যে প্রেক্ষাগৃহে বসে থিয়েটার দেখছেন একথা ভুলে গিয়েছিলেন। এই নাটকেই একটি উৎসব-দৃশ্যে অনেকগুলি সোনার পাত্রে রাজহাঁসের মাংস, শুয়োরের মাংস, গো-মাংস, ফল ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী এবং প্রচুর মদ ও মধু রাজকুমারী ও সুন্দরী পরিচারিকারা মঞ্চোপরি অতিথিগণের মধ্যে পরিবেশন করে তাঁদের সসম্মানে আপ্যায়িত করেছিল। এই নাটকের দৃশ্যরচনায় দরজা, জানালা প্রভৃতিতে ধাতু-নির্মিত হাতল ব্যবহার করা হয়েছিল। তাছাড়া আসবাবপত্র, অস্ত্রাদি প্রভৃতিতেও ষোড়শ শতকের প্রামাণ্যতা বজায় রাখা হয়েছিল। এর উদ্যানদৃশ্যতে যে বৃক্ষরাজি নির্মিত হয়েছিল, তা চিত্রিত পটের পরিবর্তে সম্পূর্ণ 'কাটআউট' পদ্ধতিতে করা হয়েছিল। শেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সিজার' নাটকের মঞ্চায়নের আগেও রোমান স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আহরণের জন্য দানচেংকো সাইমভের সঙ্গে বহুদিন রোমে গিয়ে বসবাস করেন।

স্তানিস্লাভস্কি 'দ্য লোয়ার ডেপথস' নাটকের প্রযোজনার পরিকল্পনাটি তিনটি অংশে ভাগ করেছেন। গোর্কির মূল গ্রন্থের প্রতিটি পাতার সঙ্গে তাঁর নিজস্ব

পরিচালনা সম্পর্কিত ব্যাখ্যা ও টীকাসহ একটি করে পাতা গেঁথে দিয়েছেন। তার মধ্যে প্রযোজনার প্রতিটি স্তর অত্যন্ত সাবধানতা ও যত্নসহকারে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মঞ্চসজ্জা, মঞ্চে চলাফেরা ও মঞ্চের ওপর শিল্পীদের পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝাতে প্রচুর নকশা ও চিত্রের সাহায্যে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নাটকটি মহলায় ফেলার আগে, নাটকে বর্ণিত ভবঘুরেরা কীভাবে কেবলমাত্র আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যে মনুষ্যপদবাচ্য হয়ে বাঁচে, তা চাক্ষুস দেখতে ও তাঁদের বিচিত্র উচ্চারণ শুনতে স্তানিস্লাভস্কি, দানচেংকো, সিমকভ, সাহিত্যিক গিলাইরোভস্কি এবং ওই নাটকের অভিনেতারা মস্কোব 'খিত্রভ বাজার'-এ যান। গিয়ে দেখেন ওই ভবঘুরেদের জীবন চলে বিপদ ও ঝুঁকি নিয়ে। সিঁধ কাটা, চুরি-ডাকাতি-রাহাজানি-হত্যা-সন্ত্রাস এদের ধর্ম। এক নিষ্ঠুর, বন্য, ভয়ঙ্কর পরিমণ্ডল এদের মধ্যে বিরাজ করছে। স্তানিস্লাভস্কিরা ওই বাজারে গিয়ে অনেক বিপদেও পড়েন। তবে তাঁরা চরিত্রসৃষ্টির জন্য পেলেন অনেক জীবন্ত উপাদান। নাটকের প্রত্যেকটি বিষয়ের বাস্তব উৎসও পেয়ে গেলেন। মঞ্চের নকশা তৈরি করতে, পরিচালনার পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে অথবা অভিনেতাদের কোনও দৃশ্য বোঝাতে গিয়ে কোনও অনুমান বা কল্পনার আশ্রয় নিতে হল না। ওই জীবন্ত স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা সবাইকেই সাহায্য করল। তিনদিকের তিনটি দেওয়ালের সঙ্গে ছাদ যুক্ত করে মঞ্চে ওই নাটকের ঘরের ভিতরের দৃশ্যটি নির্মিত হয়েছিল। অভিনয়ও অনুষ্ঠিত হয়েছে দৃশ্যের অভ্যন্তরেই। দৃশ্যের নিরেট গঠন ও তার অভ্যন্তরে অভিনয়ক্রিয়া বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টিরই সহায়ক হয়ে উঠেছে। অভিনেতারাও এমনভাবে অভিনয় করেছেন যেন মনে হয়েছে, তাঁরা ঘরের মধ্যেই চলাফেরা করছেন, কথা বলছেন। দর্শক তাঁদের দেখতে পারছেন না।

চেকভের 'দ্য সীগাল' নাটক প্রযোজনার সময়ও স্তানিস্লাভস্কি বেশ কয়েক সপ্তাহ মস্কো থেকে দূরে চলে গিয়েছিলেন। ফিরে এসেছিলেন নাটকের একটি সম্পূর্ণ 'মিস-এন-সিন' তৈরি করে। নাটকের অন্তর্নিহিত বয়ান থেকে অভিনেতাদের প্রত্যেকটি চলাফেরা, ভঙ্গিমা এবং বাচিক ব্যঞ্জনা সবই ওই 'মিস-এন-সিন'-এ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ ছিল। ওই 'প্রমট বুক'-এ তাঁর নির্দেশাবলির অনেকগুলিই স্কেচ করা ছিল। আবহসংগীত, মেকআপ, পোশাক এবং প্রপস কেমন ও কী কী হবে তাও লেখা ছিল। প্রথম অঙ্কের শেষ দৃশ্যে স্তানিস্লাভস্কির একটি নির্দেশ থেকেই এটি বোঝা যায়।

চেকভের নাটকে আছে :

মাশা আমি এত অসুখী। অথচ কেউ না, কেউ জানে না, আমি কত অসুখী (বুকের ওপর একটা হাত আলতো করে রাখে) আমি কনস্তানতিনকে

ভালোবাসি।

দর্ন প্রত্যেকের মনে কী আছে। কী মনের অবস্থা! কী ভালোবাসা! ও তুমি জাদু হ্রদ। (নরমভাবে) কিন্তু বাছা আমি কী করতে পারি? আমাকে বলো, অমি কী করতে পারি? কী? [যবনিকা]

স্তানিস্লাভস্কির 'প্রমট বুক'-এ লেখা আছে :

দর্ন ...কিন্তু বাছা, আমি কী করতে পারি? আমাকে বলো, আমি কী করতে পারি? কী? [মাশা কান্নায় ভেঙে পড়ে, হাঁটু গেড়ে বসে, ডর্নের হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে দেয়। পনেরো সেকেন্ডের বিরতি। দর্ন মাশার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। পিয়ানোতে অত্যন্ত উত্তেজিত সুরে। (দু'জনে একসঙ্গে নাচার) 'ওয়ালস' বাজে। ধীরে ধীরে বাজনা জোরে, আরও জোরে বেজে চলে। চার্চের মৃদু ঘণ্টাধ্বনি, কৃষকের গান, ব্যাঙের ডাক, রাতপ্রহরীর খটখট শব্দ এবং অন্যান্য সমস্ত রাত্রিকালীন শব্দের এফেক্ট শোনা যায়]।

একইভাবে 'দ্য সীগাল' নাটকের প্রত্যেকটি অঙ্কের শুরুতে স্তানিস্লাভস্কি বাঞ্ছিত পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য থিয়েটারের সমস্ত উপাদানকে সংহত করতেন। যেমন :

নাটকের শুরুতেই চেকভ নির্দেশ করেছেন : 'হ্রদের কাছে একটি পার্ক। এই সূর্যাস্ত হল। পর্দার পেছনে ইয়াকভ ও অন্যান্য মানুষ কাজ করছে। তাদের কাশির বা হাতুড়ি মারার শব্দ শোনা যেতে পারে।...

স্তানিস্লাভস্কির 'প্রমট বুক'-এ আছে : 'নাটকটি অন্ধকারে শুরু হচ্ছে। অগাস্টের এক সন্ধ্যা। ল্যাম্পপোস্টের ওপর ল্যানটার্নের অল্প আলো চোখে পড়ছে। দূরে এক মাতালের গান শোনা যাচ্ছে। আরও দূরে একটি কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে। ব্যাঙের ডাক। ঝিঁঝি পোকার ডাক। দূরের একটি চার্চের ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছে। বিদ্যুৎ চমকের সঙ্গো দূরবর্তী বজ্রপাতের শব্দ। সমস্ত পরিবেশটাই নাটকের চরিত্রগুলির একঘেয়ে জীবন সম্বন্ধে দর্শকদের একটা ধারণা দিচ্ছে।

এই নাটকের দৃশ্যগুলিও বাস্তবানুগ করে রচিত হয়েছিল। যেমন, প্রথম দৃশ্যটি একটি পার্কের অংশ। চওড়া একটি রাস্তা ডাউনস্টেজ থেকে শুরু করে আপস্টেজের গভীরে একটি সরোবরের দিকে চলে গেছে। গাছের ঝোপের আড়ালে সরোবরটি চাপা পড়ে গেছে। দৃশ্যটির বাস্তবরূপ এতটাই প্রকট হয়ে উঠেছিল যে, নাটক দেখতে দেখতে একটি শিশু তার মাকে বলেছিল, 'মা চলো না, বাগানটায় আমরা একটু হেঁটে আসি।'

স্তানিস্লাভস্কির 'দ্য সীগাল' প্রযোজনাতেই আমরা প্রথম দেখলাম একটি

দেশলাই কাঠি, একটি জলন্ত সিগারেট, ফেস পাউডার, সেরিনের কম্বল, চিরুনি, হাত ধোয়া, গবগব করে জল গেলা।

॥ ৭ ॥

ন্যাচারালিস্টিক নাটক যেহেতু প্রাত্যহিক জীবনের খুব কাছাকাছি চলে এল, দৈনন্দিন জীবনের গলি-ঘুঁজিতে ঢুকে পড়তে চাইল, বাস্তব পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে অনুপুঙ্খ বিশদতায় তুলে ধরতে শুরু করল, চরিত্ররা চেনা মানুষের মতো কথা বা আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতে থাকল, অভিনয় রীতিতেও তেমনই এক নতুন অভিজ্ঞানের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। ট্র্যাজেডি, কমেডি, মেলোড্রামা ও রোমান্টিক নাটকে এতাবৎকাল যে পরম্পরাগত অভিনয় চলে আসছিল, তা অবাঞ্ছিত হয়ে পড়ল। পুরোনো অভিনয়ধারা কৃত্রিম ও অতিরঞ্জিত মনে হল। এতদিন থিয়েটারে যে একটি বিশেষ প্যাটার্নে হাত-পা নাড়তে হত, ঘাড় ফিরিয়ে বিশেষ অ্যাঙ্গেলে তাকাতে হত, বিশেষ একটি সুরে কথা বলতে হত, সেই ধারা অকেজো হয়ে গেল। ন্যাচারালিস্টিক নাটক দাবি করল অভিনয়-বর্জিত অভিনয়। নিরন্তর স্বাভাবিকতা। বাস্তবকে বাস্তবের মতো তুলে ধরা। যেন মনে হয় এ নাটক নয়, অভিনয় নয়— এ বাস্তব, এ জীবন।

ন্যাচারালিস্টিক নাটক অভিনেতার কাছে এই যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল, যে অগ্নিপরীক্ষায় তাঁকে ফেলে দিল তার সঠিক সমাধান বা উত্তর কিন্তু কোপেনহেগেন, প্যারিস বা বার্লিন থেকে এল না। এল সোভিয়েত রাশিয়ার 'ম্যাট' থেকে। আধুনিক থিয়েটারের প্রতিভাধর অভিনেতা, পরিচালক ও নাট্যশিক্ষক স্তানিস্লাভস্কির কাছ থেকে। তাঁর নেতৃত্বে 'ম্যাট' ন্যাচারালিস্টিক নাটকের আন্দোলনের আঁতুরঘর হয়ে দাঁড়াল এবং মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই পৃথিবীর সর্বত্র ন্যাচারালিস্টিক অভিনয় ও প্রযোজনার তত্ত্ব ও পদ্ধতির শিক্ষাকেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল। অন্যান্য নাট্য-পরিচালকরা যখন কেবল বাস্তব জীবনের 'সারফেস রিয়ালিটিকে' অনুকরণ করেই আত্মপ্রসাদ অনুভব করছিলেন, স্তানিস্লাভস্কি তখন 'সাইকোলজিকাল রিয়ালিজম'-এর নতুন প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলেন।

স্তানিস্লাভস্কিই প্রথম রাশিয়ান পরিচালক, যিনি ন্যাচারালিস্টিক নাটকের উপস্থাপনায় ও অভিনয়রীতিতে, মঞ্চসজ্জায় ও অঙ্গরাগে, আলো ও আবহে এক অবিস্মরণীয় কীর্তি রেখে গেছেন। তিনিই প্রথম পরিচালক, যিনি অঁসবঁল নিয়মানুবর্তিতা, ইলিউশন-সৃষ্টি, মঞ্চ-এফেক্ট ও প্রযোজনার অনুপুঙ্খ বিশদতায় অভূতপূর্ব স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তিনিই প্রথম অভিনেতা যিনি ১৯২৩-এ

আরএসএফএসআর-এর 'পিপলস আর্টিস্ট', ১৯৩৩-এ 'অর্ডার অব দ্য রেড ব্যানার', ১৯৩৬-এ 'পিপলস আর্টিস্ট অব দ্য ইউএসএসআর' এবং ১৯৩৬-এ 'অর্ডার অব দ্য লেনিন' পুরস্কারে ভূষিত হন। তাঁর ৭৫তম জন্মদিনে তাঁর বাসস্থান লিওনতাইভস্কি লেনের নামকরণ হয় 'স্তানিস্লাভস্কি স্ট্রিট'। তাঁর নামে রাশিয়ায় অনেক নাট্যদলের নামও রাখা হয়েছে।

চেকভ ও গোর্কির ন্যাচারালিস্টিক নাটক ছাড়াও স্তানিস্লাভস্কি ১৮৯১-তে তলস্তয়ের 'দ্য ফ্রুটস অব এনলাইটমেন্ট' ও দস্তয়েভস্কির 'সেলা স্তেপানচিকভ' উপন্যাসের নাট্যরূপ পরিচালনা করেন। ১৯০৫ থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত তিনি সিম্বলিস্ট নাট্যকার মেতারলিংক ও আন্দ্রিয়েভের নাটক পরিচালনা করেন।

অভিনেতা হিসেবেও স্তানিস্লাভস্কি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। তিনি প্রথমে কিছুদিন এক অপেশাদার নাট্যদলে অভিনয় করেছিলেন। ১৮৯০-এ জার্মানির স্যাক্সে মেইনিনজেন দলটি যখন ডিউকের নেতৃত্বে দ্বিতীয়বার মস্কো শহরে নাট্যাভিনয় করে সেই সময় খুব কাছ থেকে গভীরভাবে তাদের পর্যবেক্ষণ করে তিনি উদ্দীপিত হন। তিনি ইতালির খ্যাতনামা অভিনেতা তমাসো স্যালভিনি (১৮২৯-১৯১৬), এলিনরা ডিউস, মিখাইল শেচপকিন (১৭৮৮-১৮৬৩), ফরাসি অভিনেতা জোসেফ তালমা (১৮৬৩-১৮২৬) ও ফিওদর চ্যালিয়াপিন প্রমুখ সমকালীন বিখ্যাত অভিনেতাদের অভিনয় খুব কাছ থেকে দেখেছেন। এরপর তিনি নিজে দীর্ঘদিন সাধনা করে এক অনুপম অভিনয়রীতি আবিষ্কার করেন এবং বিভিন্ন নাটকের চরিত্রসৃষ্টিতে তা সার্থকভাবে প্রয়োগ করেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ চরিত্র-সৃষ্টিগুলির মধ্যে পড়ে : 'আংকল ভানিয়া'য় আসত্রভ, 'থ্রি সিস্টারস'-এ ভারশিনিন, 'চেরি অর্চার্ড'-এ গেইভ, 'অ্যান এনিমি অব দ্য পিপল'-এ স্টকম্যান, তুর্গেনেভের 'আ মান্থ ইন দ্য কানট্রি'-তে র‍্যাকিটিন ও শেক্সপীয়রের 'ওথেলো' নাটকে ওথেলো। শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি শেষের দিকে অভিনয় করা ছেড়ে দিয়েছিলেন। তবে পরিচালনা ও শিক্ষকতা করা ছাড়েননি।

অর্থ-শতাব্দীর শিল্পীজীবনের অভিজ্ঞতায়, অনুশীলনে, অভিনয়কলা-চর্চায় পথ-নির্দেশিকার সন্ধানে যা পেয়েছেন স্তানিস্লাভস্কি তা সংহিতাকারে লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাঁর চারখানি পুস্তকে : 'মাই লাইফ ইন আর্ট' (১৯২৪), 'অ্যান অ্যাক্টর প্রিপেয়ারস' (১৯৩৬), 'স্তানিস্লাভস্কি রিহার্সেস ওথেলো' (১৯৪৮) ও 'বিল্ডিং আ ক্যারেক্টর' (১৯৫০)। স্তানিস্লাভস্কির কৃতিত্ব এখানেই যে, স্বতন্ত্রভাবে অনেক অভিনেতা বিভিন্ন চরিত্রসৃষ্টিতে তাঁদের প্রতিভা ও দক্ষতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন। কিন্তু কেউই এমন কোনও বৈজ্ঞানিক অভিনয়-পদ্ধতি লিখে যাননি যার দ্বারা একে অন্যকে শেখানো যায় এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে

দেওয়া যায়। স্তানিস্লাভস্কি এই কাজটিই সাফল্যের সঙ্গে করেছেন। শিল্পী ও শিক্ষাগুরু হিসেবে তাঁর আরও মহত্ত্ব হল এই যে, তিনি তাঁর তত্ত্ব নিয়ে কোনও গোঁড়ামি করেননি।

স্তানিস্লাভস্কির 'সাইকোলজিক্যাল রিয়ালিজিম'-এর তত্ত্ব গড়ে ওঠার পিছনে রুশ মনোবিজ্ঞানী আইভান সেচেনভ (১৮২৯-১৯০৫), পেত্রোভিচ আইভান পাভলভ (১৮৪৯-১৯৩৬) ও অস্ট্রিয়ান মনোবিদ সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের (১৮৫৬-১৯৩৯) শারীরতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক নিয়মগুলি যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। সেচেনভই প্রথম বস্তুবাদী দর্শনের দৃষ্টিতে মানসিকতায় মস্তিষ্কাশিত ক্রিয়ার বিশ্লেষণ করেন। ১৮৬৩-তে প্রকাশিত তাঁর বহু আলোচিত গ্রন্থ 'রিফ্লেকসেজ অব দ্য ব্রেন'-এ তিনি বলেন, 'মানসিক ও আত্মিক সবরকমের ক্রিয়াকলাপই মস্তিষ্কের কোনও না কোনওরকমের 'রিফ্লেক্স'। 'কনডিশনড রিফ্লেক্স' তত্ত্বের আবিষ্কারক পাভলভ বললেন, 'মানুষের গুরুমস্তিষ্ক দেহাভ্যন্তরস্থ যাবতীয় জৈবক্রিয়ার নিয়ামক ও নির্ধারক। এই গুরুমস্তিষ্ক 'কনডিশনড রিফ্লেক্স' মারফত বহির্বাস্তবের পরিবর্তনের সঙ্গে জীবদেহের সমস্ত যন্ত্রাদির ক্রিয়াকলাপের সারাক্ষণ সম্পর্ক সাধন ও সামঞ্জস্য বিধান করে চলেছে। একদিকে মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণ করছে খাদ্যান্বেষণ, বিপদ থেকে দূরে থাকা, সঙ্গী খোঁজা, আত্মরক্ষা, প্রজনন ইত্যাদি ক্রিয়াকর্ম, অন্যদিকে এইসবের জন্য বহির্জগতের যে পরিবর্তন ঘটছে, সেই পরিবর্তনের সঙ্গে দেহের ভিতরকার সমস্ত যন্ত্রাদির ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করে মানুষের সঙ্গে বহির্বাস্তবের এক চলমান সামঞ্জস্য রেখে চলেছে। পাভলভ একে বলেছেন 'ডায়নামিক ইকুইলিব্রিয়াম'। ফ্রয়েড বললেন, 'হিপনোসিস' ও স্বপ্ন-ব্যাখ্যার টেকনিক ব্যবহার করে অবচেতন মনে পৌঁছনো যায়।

স্তানিস্লাভস্কির থিয়েটার, শিল্প ও জীবন সম্পর্কীয় সমস্ত অভিমত ও শিক্ষাই ছিল বিজ্ঞাননিষ্ঠ চিন্তা ও গভীর অভিজ্ঞানের ফলশ্রুতি। তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থিয়েটারকে এক নতুন পথের দিশা দেখিয়েছে। তিনি বললেন, 'দর্শককে আনন্দ দেওয়াটাই থিয়েটারের প্রধান উদ্দেশ্য নয়। তাঁকে শিক্ষিত করে তোলা, জীবনের নানা আদর্শের বিষয়ে তাঁর চোখ খুলে দেওয়া— এই হল থিয়েটারের আসল কাজ। থিয়েটার দেখতে গিয়ে দর্শক যদি নিজের মনে যেসব প্রশ্ন ওঠে, তাঁর উত্তর খুঁজে পান, তবেই তিনি থিয়েটারকে ভালোবাসতে শুরু করবেন। বুঝতে শিখবেন জীবনের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের যে সম্বন্ধ, সেটা প্রয়োজনের সম্বন্ধ।'

স্তানিস্লাভস্কি অভিনেতাদের বললেন, 'শুধুমাত্র প্রশংসা বা পুরস্কারের লোভে অভিনয়কে ভালোবাসলে চলবে না। অভিনয়কে ভালোবাসবে এই জন্য যে, এর সাহায্যে তুমি দর্শকদের কাছে এমন সব কথা বলতে পারবে, যার দ্বারা তাঁরা

নিজেদের জীবনকে গড়ে তুলতে পারে মহত্তর, উন্নততর জীবনের কথা ভাবতে পারে।'

স্তানিস্লাভস্কির মতে, পরিচালক হলেন শিল্পগুরু। অভিনয়, উপস্থাপনা, আলো, মঞ্চসজ্জা, সংগীত সব কিছুর সুসামঞ্জস্য প্রয়োগ করবেন তিনি। নাটককে অথর্বহ করবেন তিনি। তাঁর কল্পনাশক্তির ইন্দ্রজালে দর্শক অভিভূত হবেন। তিনি প্রযোজনার বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব দেবেন দক্ষ শিল্পী ও কর্মীকে, সমস্ত প্রযোজনাকে নিয়ন্ত্রণ করবেন তিনিই।

এমিল জোলা যে দাবি করেছিলেন, 'অভিনয়কে হতে হবে স্বাভাবিক— একেবারে জীবন যেমন সেইরকম— জীবনকে মঞ্চে তুলে আনা'— তার সূত্রপাত করেছিলেন আঁদ্রে আঁতোয়ান, তাঁর পরম প্রকাশ ঘটে স্তানিস্লাভস্কির নাট্যসৃষ্টিতে।

॥ ৮॥

স্তানিস্লাভস্কির অভিনয়-তত্ত্ব 'দ্য সিস্টেম' নামে পরিচিত। স্তানিস্লাভস্কি নিজে একে 'স্পিরিচুয়াল রিয়ালিজম' বলেছেন। তিনি চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের ওপর জোর দিয়েছিলেন বলে অনেকে তাঁর পদ্ধতিকে 'সাইকো-টেকনিক'ও বলেন। অনেকের মতে, তিনি 'ইনার রিয়ালিজম'-এর ভক্ত ছিলেন।

স্তানিস্লাভস্কি বললেন, 'প্রকৃতির নিয়মের মতোই অভিনয়শিল্পের নিয়ম। শিশুর জন্ম, গাছের বেড়ে ওঠা ও অভিনেতার চরিত্রসৃষ্টি একই নিয়মের অধীন।'

স্তানিস্লাভস্কি অভিনেতাদের সতর্ক করে দিয়ে বললেন, 'থিয়েটারের মধ্যে যেমন ভালো জিনিস আছে, তেমনই ক্ষতির বিপজ্জনক বীজাণুও আছে। ঠিক এই কারণেই তোমার কঠিন নৈতিক সংযমের প্রয়োজন। থিয়েটার যদি তোমাকে মহত্তর বা উন্নততর মানুষ না করতে পারে, তাহলে তুমি থিয়েটার থেকে পালিয়ে যেও।'

স্তানিস্লাভস্কি দাবি করলেন, মঞ্চে অভিনেতার প্রতিটি অ্যাকশনের যুক্তি থাকতে হবে। উদ্দেশ্য থাকতে হবে। প্রতিটি অ্যাকশন আবিষ্কার করার আগে অভিনেতা নিজেকে তিনটি প্রশ্ন করবেন—কী? কেন? কীভাবে? যেমন : কী ঘটল? একটি দরজা খোলা হল। কেন খোলা হল? কারণ কেউ ডাকল। দরজাটি কীভাবে খোলা হল? ধীরে ধীরে শঙ্কিত চিত্তে খোলা হল। কারণ এখন দুপুর দুটো। এই সময় কারোর আসার কথা নয়। এইভাবে প্রতিটি অ্যাকশন আলাদা আলাদাভাবে তৈরি করে নিয়ে শেষে জোড়া দিতে হবে। অভিনেতা তাঁর

চারপাশের বহমান জীবনকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করবেন। বাস্তব জগৎ ও জীবন থেকে অভিজ্ঞান নেবেন। জীবনের অন্ধকার ও আলো দু'দিকেই পরিচিত হবেন। মানবিক সম্পর্কগুলি সম্পর্কে অবহিত হবেন। বাস্তব জীবন থেকে আহরিত এই গভীর পর্যবেক্ষণ ও প্রতিকল্প তাঁকে তাঁর চরিত্রনির্মাণে সাহায্য করবে। তাঁর শিল্পের উদ্দেশ্যকে সার্থক করে তুলবে।

মঞ্চের ওপর যা কিছু ঘটছে, অভিনেতা তার সব কিছুকে বিশ্বাস করবেন। শিশু যেমন বিশ্বাস করে তার পুতুলটি জীবন্ত, তাকে ঘিরে সে যেমন তৈরি করে তার সংসার, তার জীবন— অভিনেতাও তেমনই মঞ্চের কাল্পনিক, সাজানো ঘটনাকে সত্য বলে বিশ্বাস করবেন। তিনি বিশ্বাস করলে দর্শকও বিশ্বাস করবেন। তিনি অবিশ্বাস করলে, তাঁর অভিনয় যান্ত্রিক ও কৃত্রিম হবে। দর্শক হতাশ ও বিরক্ত হবেন।

স্তানিস্লাভস্কি বুঝিয়ে দিলেন, অভিনয়ে 'কথা' সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, কথা দিয়ে অভিনেতা 'কী বোঝাতে চাইছেন', তাই হচ্ছে আসল জিনিস। 'প্রিয়' কথাটি গালমন্দ দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা চলে। আবার 'বোকা' কথাটি ভালোবাসার অভিব্যক্তি হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে। অভিনেতার জানা চাই তিনি কী নিয়ে কথা বলছেন? তিনি সংলাপের নিহিতার্থটি উপলব্ধি করে সংলাপ বললে সেই বলা প্রাণময় হয়ে উঠবে। স্তানিস্লাভস্কি একে বলেছেন 'সাব-টেক্স্ট' যার অর্থ শব্দের অন্তর্বার্তা। অন্তর্নিহিত বয়ান। শব্দের প্রাণের ভাব। অন্তর্বিষয়। পাঠ্য বিষয়ের গভীর স্তরে নিহিত অর্থ বা অর্থসমষ্টি।

অভিনেতা সরাসরি দর্শকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবেন না। তিনি বাস্তবের সম্পূর্ণ ইলিউশন সৃষ্টি করবেন। তা না করলে তিনি জীবন্ত চরিত্রের বদলে নিছক অভিনেতা বা রিপোর্টার হয়ে যাবেন মাত্র। অভিনয়-দর্শক সরাসরি সংযোগ অভিনয়-সত্যকে যেমন বিনষ্ট করে, তেমনই নাটক থেকে দর্শকের মনকে বিচ্ছিন্ন ও বিচূর্ণ করে দেয়। স্তানিস্লাভস্কি এমন প্রযোজনার স্বপ্নও দেখতেন যেখানে অভিনেতারা কখনই জানবেন না, কোন অভিনয়-রজনীতে কোন চতুর্থ দেওয়ালটি দর্শকের কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে।

অভিনেতার নিজের যখন সংলাপ বলা থাকবে না তখন সহ-অভিনেতার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। সহ-অভিনেতা সেই সময় কোনও শারীরিক ক্রিয়া দেখালে তা তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন। এতে অভিনয়ে কৃত্রিমতা ও যান্ত্রিকতা দূর হয়ে যাবে। অভিনেতাকে খুব স্বাভাবিক দেখাবে। সহ-অভিনেতার সঙ্গে তাঁর একটা সংযোগ-সাধন হবে। মিথস্ক্রিয়া ঘটবে। সমবেত অভিনয়ের লাবণ্যে স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক নাট্য-মুহূর্ত তৈরি হবে। চরিত্রগুলিও প্রাণময় হয়ে

উঠবে। স্তানিস্লাভস্কি একে বলেছেন 'আঁসার্বল অ্যাকটিং'।

স্তানিস্লাভস্কি লক্ষ করে দেখলেন, শরীরে টেনশন থাকলে কাঠিন্য ও কৃত্রিমতা গ্রাস করে। স্বাভাবিকত্ব ও সহজিয়া ভাব অন্তর্হিত হয়। চরিত্রের আবেগকে অনুভব বা প্রকাশ করা যায় না। অনুশীলন ও অভ্যাসের মাধ্যমে রিলাক্সেশনের এমন এক স্তরে অবস্থান করা দরকার যাতে অবাঞ্ছিত টেনশন দূর হয়। চরিত্রের আচরণ বিনা বাধায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পায়।

স্তানিস্লাভস্কি অভিনেতাকে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা বা আবেগ-স্মৃতি দিয়ে অভিনীত চরিত্রের আবেগ রূপায়িত করতে বললেন। তিনি এই তত্ত্বের নাম দিলেন 'অ্যাফেকটিভ-মেমারি'। আবেগ বোঝাতে মনস্তত্ত্বে 'এফেক্টস' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সেই থেকেই 'অ্যাফেকটিভ' কথাটির ব্যুৎপত্তি। অর্থাৎ 'অ্যাফেকটিভ মেমারি কথাটির অর্থ 'আবেগ-স্মৃতি'। স্তানিস্লাভস্কির এই তত্ত্ব অনুযায়ী অভিনেতা মঞ্চে অভিনয়ের সময় তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে ডুবে যাবেন। চরিত্রটি জীবন্ত করার জন্য 'আবেগ-স্মৃতি'র সাহায্যে তাঁর অনুভূতিকে জাগ্রত রাখবেন। দর্শক নেই মনে করে অভিনয় করবেন। তিনি এমন ইলিউশন সৃষ্টি করবেন যাতে দর্শক আপন সত্তা হারিয়ে অভিনেয় বিষয়ে একাত্ম হয়ে যাবেন।

স্তানিস্লাভস্কি বললেন, প্রতিটি নাটকের একটি 'সুপার অবজেকটিভ' অর্থাৎ পরম লক্ষ্যবস্তু থাকে। এটাই নাটকের মেরুদণ্ড। যেমন দস্তয়েভস্কি ঈশ্বরের সন্ধানে লিখেছেন 'ব্রাদার্স কারমাজভ', তলস্তয় সারাজীবন আত্মশুদ্ধির জন্য সংগ্রাম করেছেন বলে লিখেছেন 'কনফেশন', চেকভ বুর্জোয়া জীবনের তুচ্ছতার কথা বলতে চেয়েছেন তাঁর 'দ্য চেরি অর্চার্ড' নাটকে। প্রত্যেকটি নাটকের যেমন লক্ষ্যবস্তু থাকে, তেমনই প্রত্যেকটি চরিত্রেরই একটি প্রধান লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে। সেটিই চরিত্রের আসল চালিকাশক্তি। অভিনেতার দায়িত্ব এই সুপার অবজেকটিভকে মূর্ত করে তোলা। যেমন 'আংকল ভানিয়া' নাটকে ভানিয়া নীরস, নৈরাশ্যজনক অস্তিত্ব থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কিন্তু ব্যর্থ হচ্ছে।

স্তানিস্লাভস্কি বললেন, সৃজনশীল হতে গেলে অভিনেতাকে সম্পূর্ণভাবে মনঃসংযোগের কৌশল আয়ত্ত করতে হবে। কারণ মনঃসংযোগ শুধু অভিনেতার দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের ওপরই কাজ করে না, তাঁর অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলির ওপরও কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করে। মন, ইচ্ছাশক্তি, ভাবানুভূতি, স্মৃতিশক্তি, কল্পনা---সব কিছু নতুন করে প্রাণ পেয়ে জেগে ওঠে। অভিনয়ের সময় সমস্ত মন নিবদ্ধ হয়ে থাকে মঞ্চের ওপর। ফলে দর্শকও মঞ্চের জীবনালেখ্যতে মনোনিবেশ করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে। দর্শকের সঙ্গে অভিনেতার আত্মিক যোগাযোগ ঘটে যায়। মঞ্চে অভিনয়ের সময় অভিনেতা প্রথমে কোনও বস্তু, ব্যক্তি বা ঘটনায় গভীরভাবে

মনঃসংযোগ করবেন। ওই ছোট বৃত্তে মনোযোগ স্থিতধী হলে, ধীরে ধীরে তা ছড়াতে ছড়াতে সমগ্র মঞ্চে ব্যাপ্ত করে দেবেন। কোনও কারণে মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হলে বৃত্তটি আবার ছোট করে নেবেন। এতে নানারকম বিক্ষেপ থেকে তিনি নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারবেন। অভিনয়ও উচ্চমানের হবে। স্তানিস্লাভস্কি এই কৌশলের নাম দিয়েছেন 'সার্কল অফ কনসেনট্রেশন'।

স্তানিস্লাভস্কি দেখলেন, বাস্তব জীবনে মানুষ তার আবেগ প্রকাশে বিশেষ অ্যাকশন বা ভঙ্গি ব্যবহার করে। যেমন : উদ্বিগ্ন স্ত্রী হাতের তালুতে রুমাল ঘষে। রাগি যুবক পাথর ছুঁড়ে মারে। কারও চোখের রোগ থাকলে ঘন ঘন চশমা পরিষ্কার করে। স্তানিস্লাভস্কি অভিনেতাকে তাঁর চরিত্রের অনুরূপ অ্যাকশন আবিষ্কার করতে বললেন। অনেক সময় নাট্যকার নিজেই নাটকের মধ্যে ওইরকম বিশেষ অ্যাকশন লিখে দেন। যেমন, শেক্সপীয়রের 'কিং লিয়ার' নাটকে লিয়ার চূড়ান্ত মুহূর্তে তার কোটের বোতাম খুলে ফেলে। 'ম্যাকবেথ' নাটকে লেডি ম্যাকবেথ ঘুমের মধ্যে হাঁটে। হাতের রক্ত ধুয়ে পাপ মুছে ফেলতে চায়। ব্রেশট তাঁর 'মাদার কারেজ'-এ চরিত্রদের বিজনেসের জন্য অনেক প্রপস্ দিয়েছেন। মাদার ও তাঁর ছেলেপুলেরা একটি ওয়াগন সারাক্ষণ এদিক থেকে ওদিকে টেনে নিয়ে চলে। মেয়ে ক্যাটরিন একটা ড্রাম বাজিয়ে নিকটবর্তী শহরকে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সাবধান করে দেয়। যদি নাটকে ওইরকম কোনও অ্যাকশন নির্দিষ্ট করা না থাকে, তাহলে অভিনেতা সেগুলি আবিষ্কার করবেন। করতেই হবে। কারণ অভিনয় মানেই অ্যাকশন। শারীরিক অ্যাকশন। কী? কেন? কখন? কোথায়? কীভাবে?— এই পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর পেলেই অ্যাকশনও আবিষ্কৃত হবে। মাইকেল চেকভ একে বলেছেন 'সাইকোলজিকাল জেসচার'।

অভিনেতা মন, ইচ্ছাশক্তি ও অনুভূতি— এই ত্রিগুণের সাহায্যে তাঁর কল্পনাশক্তি, অনুরণনী শক্তি, কেন্দ্রীভূত অভিনিবেশ, আবেগ, স্মৃতি, নিজ বাক্যে ও ক্রিয়ায় পূর্ণ বিশ্বাস ইত্যাদি সতেরোটি আন্তর শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করবেন। অনুশীলনীর মাধ্যমে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রশান্তি, স্বরক্ষেপণ, বাচনশুদ্ধি, নৃত্যাভ্যাস, অসিচালনা, খেলাধুলা, ভারসাম্য, চারুভঙ্গিমা ইত্যাদি তেরোটি বাহ্যিক শক্তিকে তৈরি করবেন। মুদ্রাদোষ, কণ্ঠস্বরের কৃত্রিমতা, উচ্চারণদোষ, বিসদৃশ দেহভঙ্গি সংশোধন করে নেবেন। মঞ্চের বিজ্ঞান মেনে শিখবেন মঞ্চে কীভাবে হাঁটতে হয়, বসতে হয়, শুতে হয়, কণ্ঠস্বরকে দর্শকের কাছে পৌঁছে দিতে হয়। কীভাবে আলো নিতে হয়, কীভাবে মঞ্চসামগ্রী ব্যবহার করতে হয়, কীভাবে প্রবেশ ও প্রস্থান করতে হয়। এইভাবে তিনি নিজেকে মঞ্চের প্রয়োজনে পুনঃশিক্ষিত করে নেবেন।

শিল্প হল কল্পনার ফসল। তার ভিত্তি বাস্তব জীবন হলেও সে কল্পনাকে আশ্রয়

করেই গড়ে ওঠে। নাট্যশিল্পও তার ব্যতিক্রম নয়। সেই শিল্প নিয়ে কাজ করতে হলে অভিনেতাকেও কল্পনাশক্তির অধিকারী হতে হবে। কিন্তু কীভাবে? স্তানিস্লাভস্কি এক পথের কথা বললেন, 'ম্যাজিক ইফ'। 'যদি'-র অর্থই কল্পনা করা। কল্পনার সাহায্যে চিন্তার রূপান্তর ঘটানো। কল্পনার সাহায্যে যে কোনও পরিস্থিতিতে নিজেকে স্থাপন করা। 'ম্যাজিক ইফ' হল কল্পনার জ্বালানি, উদ্দীপক। অভিনেতা চরিত্রসৃষ্টির সময় নিজেকে প্রশ্ন করবেন, 'যদি' এই পরিস্থিতি আমার জীবনে ঘটত তাহলে আমি কী করতাম?

চরিত্রনির্মাণে অভিনেতা ছয়টি স্তর অনুসরণ করবেন : ১. নাটকের 'প্রদত্ত পরিস্থিতি' বিশ্লেষণ করবেন। ২. চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক প্রকৃতিকে জানবেন। ৩. চরিত্রের একটি রূপকল্প বা কাল্পনিক মডেল সৃষ্টি করবেন। ৪. ওই রূপকল্পকে নিজ শরীর ও মনে প্রোথিত করবেন। ৫. সৃষ্টিশীলতার পর্যায়গুলিতে শুরু থেকেই মনকে যুক্ত করবেন। ৬. অনুভূতি থেকে বহিঃস্থ রূপকল্পে যাবেন। 'প্রদত্ত পরিস্থিতি' হল স্তানিস্লাভস্কির ভাষায় নাটকের 'গিভন সারকামস্ট্যানসেস'। অভিনেতা চরিত্র-ভাবনার আগেই কাহিনি, সময় ও ঘটনার স্থান, যুগ ও তৎকালীন জীবনযাত্রা, নির্দেশকের ব্যাখ্যা, মঞ্চসজ্জা, মঞ্চসামগ্রী, ব্যবহার্য-সামগ্রী, সাজপোশাক, আলো, সংগীত, আবহ ইত্যাদি সম্বন্ধে অবহিত হবেন। তারপর নিজের চরিত্র বিশ্লেষণ করবেন। স্তানিস্লাভস্কি এই চরিত্র বিশ্লেষণেরও একটি সহজ সূত্র দিয়েছেন। চরিত্রের জায়গায় অবস্থান করে অভিনেতা নিজেকে প্রশ্ন করবেন : আমি কে? আমি কোথায়? আমি এখানে কেন? আমি কোথা থেকে আসছি? আমি কোথায় যাচ্ছি? আমি কী করতে চাই? এই প্রশ্নগুলির উত্তর পেলে অভিনেতব্য চরিত্রের ধারণাটি স্পষ্ট হবে। চরিত্র প্রকাশে অভিনেতা যে দেহভঙ্গিমা, চলাফেরা, হাতের ভঙ্গি ও বিজনেস করবেন, কথা বললেন, অনুভূতির প্রকাশে অভিব্যক্তি দেখাবেন, সেসব যেন স্বাভাবিক ও বিশ্বাসযোগ্য হয়। শরীর ও মনকে নতুন সজ্জায় সাজাবার জন্য অভিনয় শুরুর অনেক আগে থেকে তিনি চরিত্রের ধ্যানে মগ্ন হবেন। মনের এক বিশেষ প্রস্তুতি নেবেন। তাহলেই সৃজনীশীল অভিনয় করা সম্ভব হবে।

অভিনেতা চরিত্রের অন্তরটা সম্পূর্ণভাবে দর্শককে খুলে দেখাবেন। এর জন্য তিনি চরিত্রের অনুভূতিতে প্রবেশ করবেন। চরিত্রের আবেগ অনুভব করবেন। প্রত্যেক মানুষের বাইরের চেহারার যেমন একটা রূপ আছে, বিশেষত্ব আছে, তেমনই তার মনেরও একটা প্রকৃতি আছে, বাঁক আছে। দুটিই প্রকাশিত হওয়া দরকার। এর জন্য প্রয়োজন হলে অভিনেতা তাঁর চেতন-মনের ভিতর দিয়ে অবচেতনে পৌঁছবেন। সেখানে ঘুমিয়ে থাকা, স্মৃতি হয়ে যাওয়া অনুভূতিকে

জাগ্রত করে চরিত্রের অনুভূতির সঙ্গো মেলাবেন।

স্তানিস্লাভস্কির অভিনয়-তত্ত্ব সংক্রান্ত বইগুলি ইংরাজি ভাষায় অনূদিত হয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর অভিনয়-পদ্ধতির চর্চার জন্য বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় নাট্য-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। প্রখ্যাত নাট্য ও চিত্র অভিনেতা, পরিচালক ও সমালোচকরা তাঁর তত্ত্বগুলি নিয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকভাবে গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। কেউ তাঁর উপপাদ্যগুলিকে অভিনয়শিল্পের মৌল বিজ্ঞান ও ব্যাকরণ বলে অভিহিত করেছেন। কেউ তাঁর কয়েকটি সূত্রকে পরিমার্জিত করে নিয়েছেন। কেউ তাঁর সূত্রগুলির বিস্তার ঘটিয়েছেন। আবার কেউ তাঁর বেশিরভাগ তত্ত্বকে অবাস্তব বা ভুল বলে বর্জন করতে উপদেশ দিয়েছেন।

প্রখ্যাত পরিচালক, অভিনয়-শিক্ষক ও স্তানিস্লাভস্কির সহকর্মী দানচেংকো তাঁর জীবনচরিত 'মাই লাইফ ইন দ্য রাশিয়ান থিয়েটার' বইতে লিখেছেন, স্তানিস্লাভস্কির মতো তিনিও নাট্য-পরিচালনার ক্ষেত্রে এক ব্যক্তির নেতৃত্বেই বিশ্বাস করেন, যাঁর প্রজ্ঞা প্রযোজনার প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রত্যেক শিল্পীকে সংক্রামিত করে। স্তানিস্লাভস্কির মতো তিনিও আশা করেন, অভিনেতা তাঁর চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলবেন, 'ভান' না করে সত্যি সত্যি চরিত্রের আবেগ অনুভব করবেন। তাঁর প্রতিটি অ্যাকশনের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধতা থাকবে, আন্তরিকতা থাকবে, অভিজ্ঞতার ছাপ থাকবে। তিনি স্বাভাবিকভাবে কথা বলবেন, আচরণ করবেন।

স্তানিস্লাভস্কির 'অ্যান অ্যাকটর প্রিপেয়ারস' গ্রন্থের আমেরিকা সংস্করণের ভূমিকায় প্রখ্যাত অভিনেতা জন গিলগুড এক জায়গায় লিখেছেন, 'যাঁরা অভিনয় করেন ও যাঁরা পরিচালনা করেন অথবা যাঁরা শুধু বই পড়েন তাঁদের জন্য এই গ্রন্থটিতে খুব সুন্দর উপদেশ আছে। কীভাবে রিলাক্স করা যায়, কীভাবে দেহকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, কীভাবে চরিত্র নিয়ে গবেষণা করতে হয়, কীভাবে মনঃসংযোগ করতে হয়, কীভাবে কল্পনাকে কাজে লাগাতে হয়, কীভাবে অন্তর থেকে অভিনয়কে নির্মাণ করতে হয়, কীভাবে সতীর্থ অভিনেতাদের সঙ্গো কাজ করতে হয়, কীবাবে দর্শককে সম্মান করতে হয়, ক্লাসিকাল ও রিয়ালিস্টিক নাটকে কীভাবে অভিনয় করতে হয়, এই সবই বইটিতে সুনিপুণ স্বচ্ছতায় ও সরলতায় আলোচিত ও পরীক্ষিত হয়েছে।'

'অ্যান অ্যাকটর প্রিপেয়ারস' বইটি সম্পর্কে প্রখ্যাত ইংরাজ অভিনেতা মাইকেল রেডগ্রেভ (১৯০৮-১৯৮৫) বলেছেন, 'স্তানিস্লাভস্কির এই বইটি একটি বিরাট আয়নার মতো। এই আয়নার সামনে গেলে মানুষ তার চোখ, মুখ, দেহ ও নিজের ভেতরটা দেখতে পায়। আয়না থেকে দূরে সরে গেলে নিজের দেহকে

একটি ফ্রেমের মধ্যে দেখতে পায়।'

চার্লি চ্যাপলিন 'অ্যান অ্যাক্টর প্রিপেয়ারস' বইটি সম্পর্কে বলেছেন, 'যাঁরা মহৎ নাট্যশিল্প তৈরি করতে চান, এই বইটি তাঁদের সাহায্য করবে।'

জোসেফ চাইকিন বলেছেন, 'অভিনেতার চরিত্রের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি কীভাবে হওয়া সম্ভব, স্তানিস্লাভস্কির 'দ্য সিস্টেম' সেই রাস্তার একটি পথ-প্রদর্শক মানচিত্র।'

নিকোলাই ওখলোপকভ বলেছেন, 'স্তানিস্লাভস্কি মহৎ, কারণ তিনিই প্রথম তাঁর অগাধ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে নাট্যজগতে বিজ্ঞানসম্মত অভিনয়ের একটি বড় নির্ঘণ্ট (তালিকা) তৈরি করে দিয়েছেন। তাঁর 'সিস্টেম' অভিনয়শিল্পের ভিত্তিস্বরূপ। সংগীতজ্ঞের স্বরগ্রাম ও নৃত্যবিদের দেহচর্চার মতো।'

বের্টোল্ট ব্রেশট স্তানিস্লাভস্কি সম্পর্কে বলেছেন, 'স্তানিস্লাভস্কি তর্কাতীতভাবে মানবতাবাদী ছিলেন। তিনি জানতেন মানুষই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই তিনি তাঁর থিয়েটারকে সমাজবাদের পথে পরিচালিত করেছিলেন। সামাজিক জীবনের জটিলতা ও অসাদৃশ্য সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন এবং পক্ষপাতদুষ্ট না হয়ে কীভাবে তাদের দেখানো যায় তা তিনি জানতেন। একজন রিয়ালিস্ট হিসেবে তিনি জীবনের কদর্য দিকটা দেখাতে ভয় পাননি। কিন্তু সেটা আকর্ষণীয়ভাবে দেখিয়েছেন। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে তিনি যে ন্যাচারালিস্টিক নাটকগুলি প্রযোজনা করেছেন তাঁর জাদুস্পর্শে সেগুলিতে একটা কাব্যিক ছোঁয়া লেগেছিল। বিষয়বস্তুর সঙ্গে সততা গভীরভাবে মিশেছিল। সৎ অভিনয় ও অপূর্ব শৈলীর সমতান ঘটেছিল। তিনি প্রত্যেকটি নাটক গভীরভাবে বিশ্লেষণ ও আত্মস্থ করেছেন। তারপর অনুপুঙ্খ বিশদতায় ও নির্ভুলতায় মঞ্চস্থ করেছেন। তিনি প্রত্যেকটি প্রযোজনার জন্য নতুন নাট্যধর্মী উপায়ও খুঁজে বার করতেন। শুধু শিল্পদৃষ্টিই তাঁর লক্ষ্য ছিল না, তিনি এটাও জানতেন যে, থিয়েটারে শিল্প ছাড়া কোনও কিছুই করা সম্ভব নয়। স্তানিস্লাভস্কি তাঁর অভিনেতাদের থিয়েটারের সামাজিক উদ্দেশ্য বুঝতে শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর থিয়েটারে তারকা-অভিনেতারা ছিল— বড় এবং ছোট। তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি-অভিনেতার সুঅভিনয়ই দলগত অভিনয়ে শ্রেষ্ঠতম এফেক্ট আনতে পারে। তিনি শিখিয়েছেন, অভিনেতার নিজেকে এবং যে চরিত্রে তিনি অভিনয় করছেন সেই মানুষটিকে সমস্ত খুঁটিনাটি সমেত জানতে হবে এবং একটি আর একটিকে অনুসরণ করবে। অভিনেতা পর্যবেক্ষণ থেকে যা সংগ্রহ করতে পারেন না, তা দর্শককেও আকর্ষণ করতে পারে না। স্তানিস্লাভস্কি ভাখতানগভ, মেয়ারহোল্দ ও

তেইরভের মতো প্রতিভাবান পরিচালকদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, যাঁরা তাঁদের শিক্ষকের শিল্পকে নিজ নিজ মতানুযায়ী স্বাধীনভাবে বিকশিত করেছেন।'

হ্যারল্ড ক্লারমান বলেছেন, 'স্তানিস্লাভস্কির 'মেথড' অভিনয়ের ব্যাকরণ। ভাষা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে শিখলে যেমন ব্যাকরণের আর দরকার হয় না, তেমনই অভিনয় করতে শিখে গেলে আর 'মেথড'-এরও দরকার হয় না। অনেক বড় বড় লেখক আদৌ ব্যাকরণ পড়েননি, যদিও তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই তার অধিকারী। কিন্তু কেউই বলবেন না যে, ব্যাকরণের দরকার নেই। শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়া অনর্থক। ব্যাকরণের পাণ্ডিত্য লেখক তৈরি করে না। 'মেথড' আয়ত্তাধীন হয়ে গেলে লেখক 'মেথড' সম্পর্কে অচেতন হয়ে যান। স্তানিস্লাভস্কির 'মেথড'ও তাই। বৈয়াকরণের আগেও ব্যাকরণ ছিল। 'মেথড'-এর আগেও ভালো অভিনয় ছিল এবং এখনও 'মেথড' অজানা থাকা সত্ত্বেও ভালো অভিনয় হচ্ছে। মাইকেল রেডগ্রেভ বা লরেন্স অলিভিয়ারের দুর্দান্ত অভিনয় দেখে কোনও দর্শক বলতে পারবেন না কে 'মেথড'-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।'

আলেকজান্দার তেইরভ বলেছেন, 'জিনিয়াস কী? আমি জানি না। এর কোনও স্পষ্ট তাত্ত্বিক উত্তর আছে কি না, তাও জানি না। কিন্তু বাস্তবে একজন জিনিয়াস আছেন। তিনি স্তানিস্লাভস্কি। স্তানিস্লাভস্কির জিনিয়াস তাঁর অসাধারণ অভিনয়ের মধ্যে নেই। তাঁর অত্যুৎকৃষ্ট পরিচালনার মধ্যেও নেই। স্তানিস্লাভস্কি যে জিনিয়াস তা এই সত্য থেকে নির্ধারিত হয়েছে যে, তিনি তাঁর বিস্ময়কর সৃজনীশীল অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে এক নতুন জীবন, এক নতুন ছন্দ, এক নতুন গুণমানের থিয়েটার বিদিত করেছেন। তিনি যে জিনিয়াস তা এই সত্য থেকে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে যে, থিয়েটারের কোনও কারিগরই তাঁর এই গুণমানকে অস্বীকার করতে পারেন না। কেউ হয়তো, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই তাঁকে অতিক্রম করে যেতে পারেন, কিন্তু কেউ তাঁকে এড়িয়ে যেতে পারেন না। এই নতুন গুণমানটি কী? এককথায় 'সত্য'। 'সত্য' এমন একটি শব্দ যা অবিশ্বাসযোগ্য ও অনির্দিষ্টের মতো শোনায়। বাস্তবিকই 'সত্য' কী? জীবনের সত্য না থিয়েটারের সত্য? বাস্তবের সত্য না অভিনয়ের সত্য? আবেগের সত্য না ভাবনার সত্য? বিমূর্ত সত্য না বাস্তব সত্য? হ্যাঁ, 'সত্য' একটা অনির্দিষ্ট ধারণা। সত্যিই তাই। এটা অনির্দিষ্ট, কিন্তু নির্ধারণক্ষম। স্তানিস্লাভস্কির পর বিভিন্ন শিল্পী, বিভিন্ন প্রজন্ম, বিভিন্ন যুগপুরুষ তাঁদের মতো করে সত্যকে খুঁজে বেড়াবেন। আমরা সবাই স্তানিস্লাভস্কির সত্যকে অংশত বা পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারি। এই তো জীবন। এই তো প্রগতি। এই তো সামাজিকভাবে অনিবার্য। কিন্তু স্তানিস্লাভস্কির পর কেউই বলবেন না যে, থিয়েটারে সত্যের প্রয়োজন নেই। বললে, সেটা প্রবাদের মতোও শোনাবে না,

সেটা হবে শোচনীয়ভাবে যুগের সঙ্গো সামঞ্জস্যহীন।'

রাশিয়ান পরিচালক, লেনিন পুরস্কারে ভূষিত জর্জি তভসতোনোগভ তাঁর 'দ্য প্রফেশন অব দ্য স্টেজ ডাইরেক্টর' (১৯৭২) গ্রন্থে স্তানিস্লাভস্কির 'সিস্টেম' সম্পর্কে বলেছেন, 'স্তানিস্লাভস্কির তত্ত্ব সম্বন্ধে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে, তিনি শেষ জীবনে তাঁর প্রথম দিকের অনেক তত্ত্বকে বাতিল করেছেন। বলা হয়েছে, সৃজনীশীল কাজে তিনি 'চিন্তা'র পরিবর্তে 'আবেগ'কে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু তা সত্য নয়। স্তানিস্লাভস্কি সৃজনীশীল প্রক্রিয়ায় 'চিন্তা'কেই প্রধান উপাদান হিসেবে গণ্য করেছেন। তাই তিনি প্রথম ধাপে 'সাব-টেকস্ট' নিয়ে ও কিছু পরে 'আত্মকথন' বা 'মনোলগ' নিয়ে কাজ করেছেন, যে দুটিতে মানবিক চরিত্র প্রধানত 'বুদ্ধি'র মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। স্তানিস্লাভস্কি প্রথম থেকেই চরিত্রকে জীবন্ত করার উদ্দীপক হিসেবে আবেগকে বাদ দিয়েছেন। তাঁর এই তত্ত্ব শেষ পর্যন্ত পালটায়নি। 'আবেগ' একটি বিশুদ্ধ গৌণ পদার্থ। যে অভিনেতা চরিত্রসৃষ্টিতে অবচেতনের ওপর নির্ভর করেন, তিনি নিশ্চিতভাবে 'ক্লিশে'র কবলে পড়বেন। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে স্তানিস্লাভস্কি দেখেছিলেন চরিত্রসৃষ্টির সময় অতিরিক্ত বৌদ্ধিক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অভিনেতা একপেশে হয়ে পড়ছেন। তাঁর দৈহিক অভিব্যক্তির যন্ত্রগুলি নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকছে। তিনি নাট্যকারের নাট্য-উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করে বৌদ্ধিক দক্ষতা অর্জন করছেন। কিন্তু অভিনয় করতে পারছেন না। স্তানিস্লাভস্কি এই বিষয়ে এতটাই চিন্তিত হয়ে পড়লেন যে, তিনি তাঁর সমস্ত 'সিস্টেম'-এর পুনর্বিচার করলেন এবং তাঁর মৃত্যুর আগে তিনি একটি নতুন 'সিস্টেম' বিকশিত করলেন যার নাম দিলেন 'মেথড অব অ্যাকটিভ অ্যানালিসিস'। সেখানে তিনি সৃজনীশীল প্রক্রিয়ায় দেহ ও মনের একইসঙ্গো সুসামঞ্জস্য বিকাশের কথা বলেছেন। স্তানিস্লাভস্কি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, একমাত্র শারীরিক অ্যাকশনই যুক্তি ও ইচ্ছাকে উজ্জীবিত করতে পারে, যা পরে আবেগকে জাগিয়ে তোলে। তিনি বুঝেছিলেন, 'চেতন থেকে অবচেতনে' যাওয়াই সঠিক পদ্ধতি। তাঁর 'আবেগ-স্মৃতি', 'অনুভূতি', 'অবচেতনকে জাগিয়ে তোলা' ইত্যাদি মনস্তাত্ত্বিক অনুশীলনীগুলি অভিনেতাকে এতটাই আচ্ছন্ন ও বেষ্টিত করে রাখছে যে দীর্ঘ সময়ের জন্য তিনি চরিত্রের বাহ্যপ্রকাশ বা অভিব্যক্তির দিকটাই অবহেলা বা অগ্রাহ্য করছেন এবং মানসিক ক্রিয়া থেকে দৈহিক ক্রিয়াকে আলাদা করে ফেলছেন। ফলে চরিত্রসৃষ্টিতে অভিনেতার যুক্তিসঙ্গাত বৌদ্ধিক প্রস্তুতি ও সম্পূর্ণ দৈহিক অপ্রস্তুতি ও অসহায়তা— এই দুটির মধ্যে এক বিরাট ফাঁক তৈরি হচ্ছে। এই ফাঁক পূরণ করার সহজ পথ হচ্ছে প্রথমেই চরিত্রের দৈহিক বাহ্যরূপকে উপস্থিত করা। অভিনেতাকে তাঁর চরিত্রের ও নাটকের পরিস্থিতি

সম্বন্ধে অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত করলে তিনি এক 'রিকেটি' (হাড়ের রোগে আক্রান্ত) শিশুর মতো হয়ে যান, তাঁর দুর্বল দেহ বড় মাথার ওজনে নুয়ে পড়ে। একই সময়ে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটি, চরিত্রের সেই শারীরিক মূর্তকরণ, তার ব্যাপারে অভিনেতা সম্পূর্ণ অসহায় বোধ করেন। এই শোচনীয় অবস্থা থেকে উদ্ধার করল স্তানিস্লাভস্কির 'মেথড অব অ্যাকটিভ অ্যানালিসিস', আমরা যাকে বলি চরিত্রসৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়ে 'ফিজিকাল রিকনিসন্স' বা শারীরিক প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ। অর্থাৎ আমরা চরিত্রের ভিতরে প্রবেশ করি। আমাদের হাত, পা, পিঠ ও সমস্ত দৈহিক সত্তা দিয়ে তাকে প্রকাশ করি।'

স্তানিস্লাভস্কির 'সিস্টেম'-এর যাঁরা বিরোধিতা করেছেন, তাঁদের মধ্যে ফ্রাংকো রাফিনি, ওটিস স্কিনার, স্টেলা অ্যাডলার, মাইকেল চেকভ, থিওদোর কমিসারজেভস্কি, আন্তন চেকভ, সালভিনি, ইয়তি লেন, সাংহাইয়ের বিপ্লবী গণ-সমালোচনা গোষ্ঠী এবং মেয়াবহোলদ প্রধান।

মেয়ারহোলদ 'বায়োমেকানিক্স' নামে স্তানিস্লাভস্কির 'সিস্টেম'-এর একটি পালটা তত্ত্ব তৈরি করেছেন। সেখানে তিনি দৈহিক অভিব্যক্তির মাধ্যমে আবেগের প্রকাশকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

মাইকেল চেকভও স্তানিস্লাভস্কির তত্ত্বকে সর্বআদর্শরূপে গ্রহণ করেননি।

কমিসারজেভস্কি 'অ্যাফেকটিভ মেমারি'র কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, এই তত্ত্ব প্রয়োগ করে দেখা গেছে, নাট্যকার রচিত জীবনের অ্যাকশন সৃষ্টি করার পরিবর্তে অভিনেতা নিজের ব্যক্তিগত অনুভূতিকেই প্রকাশ করে ফেলছেন। আউগুস্তো বোআল বলেছেন, ভিন্নরূপ অভিজ্ঞতার স্মৃতিকে কাজে লাগিয়েও চরিত্রের প্রয়োজনীয় বিশেষ আবেগ প্রকাশ করা যায়।

স্তানিস্লাভস্কির বিরুদ্ধে নাট্যকার চেকভেরও অভিযোগ ছিল যে, তিনি চেকভের নাটকের বিষয়বস্তুর ভুল ব্যাখ্যা করে নাটকের অর্থই পালটে দিয়েছেন।

সালভিনি বলেছেন, অভিনেতার পক্ষে সত্য সত্যই অভিনেয় চরিত্রে রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব নয়। একই সঙ্গে তিনি যেমন চরিত্র অভিনয় করে চলেন, তেমনই তার প্রতি লক্ষ্যও রাখেন।

ইয়তি লেন তাঁর 'ইফ ইউ উড অ্যাক্ট' (১৯৫১) বইতে লিখেছেন : স্তানিস্লাভস্কি অভিনেতা সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন বা ভেবেছেন। দর্শকের সম্পর্কে খুব কম কথা বলেছেন। থিয়েটারে দর্শকের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রত্যেক পেশাদার অভিনেতাকে সচেতন বা তটস্থ থাকতে হয়। তাঁকে সবসময় দর্শকের কাছে কত কী শিখতে হয়। স্তানিস্লাভস্কি এই দিকটি সম্পর্কে যদি ভাবতেন তাহলে

তিনি তাঁর প্রধান তত্ত্বকে— 'অভিনেতাকে অভিনয়ের সব সময় চরিত্রের আবেগ অনুভব করতে হবে'— স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিতে বলতেন কি না সন্দেহ। তিনি এই মৌল সত্যটি বুঝতেন যে, অভিনেতার কাজ দর্শককে অনুভব করানোর জন্য অভিনয় করা।'

ফ্র্যাংকো রাফিনি বলেছেন, 'মঞ্চে ন্যাচারাল অ্যাকটিং' কথাটি সম্পূর্ণ অর্থহীন। দর্শকের চোখে যে অভিনয় যত ন্যাচারাল মনে হবে, বুঝতে হবে সেই অভিনয়ের পেছনে শিল্পীর ততখানি দক্ষতা, অনুশীল ও অধ্যবসায় বর্তমান।'

ওটিস স্কিনার বলেছেন, 'অভিনেতা যদি ভাবাবেগে চরিত্রের মধ্যে ডুবে যান, দর্শকের কথা মনে না রাখেন তাহলে ব্যাপারটি হবে বিপজ্জনক। এতে চরিত্রের তো শোচনীয় সলিল সমাধি হবেই, অভিনেতাও মঞ্চে ভাবাবেগবশে অনেক অঘটন ঘটাতে পারেন। উত্তেজনাময় কোনও দৃশ্যে তিনি নিজে উত্তেজিত হয়ে পড়লে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। 'ওথেলো'র অভিনেতা সত্যি সত্যি ডেসডিমোনার চরিত্রাভিনেত্রীকে গলা টিপে হত্যা করবেন। 'হ্যামলেট' এর অভিনেতা পলিনিয়াস ও লেয়ারতিসের শরীরে তরবারি ঢুকিয়ে দেবেন। জুলিয়াস সিজারকে ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াস রক্তাক্ত করে ছাড়বেন। প্রকৃত ধীসম্পন্ন অভিনেতা নিয়ন্ত্রিত আবেগ ব্যবহার করেন। যেমন, বিখ্যাত অভিনেতা গ্যারিক 'কিং লিয়ার'-এর ভূমিকায় এমন ভাবাবেগ সৃষ্টি করতেন যাতে দর্শকরা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেন। সেই মুহূর্তে গ্যারিক পাদপ্রদীপের সামনে এগিয়ে শান্তভাবে দর্শকদের হাততালি গ্রহণ করতেন।'

স্টেলা অ্যাডলার বলেছেন, 'স্তানিস্লাভস্কির 'সিস্টেম' ব্যাপারটি জটিল এবং ওটা ব্যাখ্যা করাও কঠিন। স্তানিস্লাভস্কি নিজেই জানতেন এভাবে তাঁর অভিনয়রীতিকে নিয়ম-কানুনে বাঁধতে যাওয়ার বিপদ আছে।'

উৎপল দত্ত তাঁর 'স্তানিস্লাভস্কির পথ' বইতে লিখেছেন, 'স্তানিস্লাভস্কি পদ্ধতিকে সর্বরোগহর কোনও দাওয়াই ভাববার কোনও কারণ নেই। অনেক নাটকে স্তানিস্লাভস্কির অভিনয়ধারা ব্যর্থ হতে পারে। শেক্সপীয়রের ছন্দ ও বিশালত্বকে বা রবীন্দ্রনাথের কোনও কবিত্বময় নাটককে এই নিয়মে বাঁধতে গেলে হাস্যকর এক জিনিস তৈরি হতে পারে। কিন্তু যেখানে ভাষা মোটামুটি দৈনন্দিন কথাবার্তার কাছাকাছি, যেখানে চরিত্রগুলি অন্তর্মুখী, যেখানে মামুলি কথোপকথনের পিছনে লুকিয়ে আছে প্রবল মানসিক দ্বন্দ্ব, সেখানে স্তানিস্লাভস্কি একচ্ছত্র সম্রাট। ইবসেন, হাউপ্টমান, চেকভ. গোর্কি, শ, তলস্তয়ের নাটকগুলির পূর্ণ প্রকাশই ঘটবে না স্তানিস্লাভস্কি অভিনয়ধারার প্রয়োগ না করলে।'

সাংহাই-এর 'বিপ্লবী গণ-সমালোচনা গোষ্ঠী' বলেছে, 'তথাকথিত অবচেতন

সৃষ্টিশীল কর্ম' নামে স্তানিস্লাভস্কি যে জিনিসটি ফেরি করে বেড়িয়েছেন, ঘটনাই প্রমাণ করছে সেটা একটা অসার চটকদার জিনিস বই কিছু নয়। 'অবচেতন সৃষ্টিশীল কর্ম' নামে কোনও জিনিস কোনও দিনই ছিল না। বিপ্লবী সাহিত্য ও শিল্পই হোক বা প্রতিবিপ্লবী সাহিত্য ও শিল্পই হোক— এদের প্রত্যেকেই এক একটা বিশেষ শ্রেণীর বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি বহন করে এবং সেটা সেই শ্রেণীর রাজনীতিকেই সহায়তা করে।

॥ ১০॥

ন্যাচারিলিস্টিক থিয়েটারের পরিণত সুখকর হয়নি। সাত বছর চলার পর আঁতোয়ানের 'তেয়াত্র লিব্রতে' প্রচণ্ড আর্থিক ক্ষতির জন্য বন্ধ হয়ে যায়। পৃথিবীর সুন্দরতম শিল্পীদল হিসেবে স্বীকৃত স্তানিস্লাভস্কির মস্কো আর্ট থিয়েটারে পঁয়তাল্লিশ হাজার রুবলের ঘাটতি বাজেট দেখা দেয়। হ্যারল্ড ক্লারম্যান, এলিয়া কাজান, চেরিল ক্রফোর্ড ও লি স্ট্রেমবার্গের পরিচালনাধীন আমেরিকার 'গ্রুপ থিয়েটার' দশ বছর আর্থিক ঘাটতির পর খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙে পড়ে।

স্তানিস্লাভস্কির ন্যাচারালিস্টিক প্রযোজনা প্রথম প্রথম থিয়েটারে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই দেখা গেল এতে থিয়েটারের ক্ষতি হয়েছে। কেবলই হুবহু জীবন-সদৃশ্য করার অনুশীলনের ফলে থিয়েটার শুধুই জীবনের এক অক্ষম অনুকরণ বা প্রতিলিপি হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্তানিস্লাভস্কি যখন চেকভের 'দ্য থ্রি সিস্টারস' প্রযোজনা করেছিলেন তখন নাট্যকার, অভিনেতা ও পরিচালক নিকোলাই ইভরিনভ (১৮৭৯-১৯৫৫) তাঁর 'থিয়েটার ইন লাইফ' (১৯১৭) বইটিতে পরিহাস করে বলেছিলেন, 'এর চেয়ে স্তানিস্লাভস্কি বরং মস্কোর শহরতলিতে একটি বাড়ি ভাড়া করে নাটকটি করতে পারতেন এবং দর্শকদের সেখানে এসে চুপি চুপি দরজার চাবির গর্ত বা অর্ধ-উন্মুক্ত দরজার ফাঁক দিয়ে অভিনয় দেখতে বলতে পারতেন।' তিনি সম্ভবত এই ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন যে, স্তানিস্লাভস্কির থিয়েটার আদৌ থিয়েটার নয়। এই থিয়েটার শুধু বিশ্বাস করতে চায় যে, মঞ্চের পৃথিবীই আসল পৃথিবী। এর ফলে দর্শকরা শুধু নিষ্ক্রিয় পর্যবেক্ষক হয়ে যাবেন। পৃথিবী কীভাবে চলছে সেই পথের দিশা তাঁরা কোনও দিনই পাবেন না। এর পরিবর্তনের ইচ্ছাটুকুও আবিষ্কার করতে চাইবেন না।

স্তানিস্লাভস্কির ন্যাচারিলিস্টিক থিয়েটারের কর্মকাণ্ডের সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা করেছেন সোভিয়েত রাশিয়ার প্রখ্যাত অভিনেতা, লেখক ও পরিচালক পাভলোভিচ ওখলোপকভ (১৯০০-১৯৬৭)। রাশিয়ান থিয়েটারের

একজন শ্রেষ্ঠ পর্যবেক্ষক, নরিস হাউগটন তাঁর 'রিটার্ন এনগেজমেন্ট' বইতে লিখেছেন, 'স্তানিস্লাভস্কি থিয়েটার থেকে 'থিয়েটার'কে নির্বাসিত করার চেষ্টা করেছেন। এর উলটোটা করেছেন ওখলোপকভ এই বলে যে, 'আমরা 'থিয়েটার'-এ নেই এটা ভুলতে আমরা থিয়েটারে যাই না। আমরা থিয়েটারে যাই, কারণ সে আমাদের জীবনের থেকে অন্য কোনও জায়গায় নিয়ে যায়। এটা অনেকটা সার্কাসে যাওয়ার মতো। সেখানে ক্লাউনের রং-করা বিরাট লাল মুখ, সাদা গাল এবং তাঁর বিশাল ঝাপটামারা জুতো মেনে নিই। আমরা এটাকে 'আসল' বলে মনে করে নিজেদের বোকা বানাই না। সে একটা ক্লাউন এবং সেটাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।' ওখলোপকভের লক্ষ্যই ছিল নাটকীয় অ্যাকশনকে দর্শকের কাছে নিয়ে যাওয়া। মঞ্চকে সম্পূর্ণ ত্রিমাত্রিক করে গড়ে তোলা। অভিনয়ের সময় অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যে 'সৃজনীশীল পারস্পরিক ক্রিয়া' সৃষ্টি করা।

ন্যাচারিলিস্টিদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ হল, চারপাশে হতাশা, মৃত্যু আর ধ্বংসের যে অবিরাম প্রবাহ চলছে, তাকেই তাঁরা মোটা দাগের বাস্তবতার নামাবলি পরিয়ে ধরতে চেয়েছেন তাঁদের ক্যানভাসে। তাঁদের কাজের মধ্যে বীভৎসা আছে, সুষমা নেই। অশ্লীলতা আছে, সৌন্দর্য নেই। শরীর আছে, মন নেই। বাস্তবতা আছে, শিল্পিত ইঙ্গিতময়তা নেই। এঁদের শিল্প তাই শিল্পীর সঙ্গে দর্শকের আত্মিক মেলবন্ধনের মাধ্যম নয়। দর্শনেন্দ্রিয়ের সহায়তায় হৃদয়ের গভীরে পৌঁছনোর সামগ্রী নয়। এঁদের কাজে চিরকালীনতার কোনও শর্তই প্রতিফলিত নয়। কেবলমাত্র বস্তুকেন্দ্রিক উচ্চকিত আধুনিকতাই এদের ক্ষীণায়ু এবং দর্শকবিমুখ হওয়ার একমাত্র কারণ।

গ্রোটেস্ক থিয়েটার

- 'আমাদের জীবন-পদ্ম আচ্ছাদিত হয়ে রয়েছে গভীর এক কুজ্ঝটিকা জালের অন্তরালে। সে চায় আলো। সে চায় বিকাশ। তারই অভাবে তার সমস্ত আকুতি। বেদনা। আমি এই বেদনাকে রূপ দিতে চেষ্টা করেছি।'

  —লুইজি পিরানদেল্লো

- 'জীবনের রঙ্গামঞ্চে আমরা সবাই মুখোশ পড়ে আছি। আমরা বাইরের যে মানুষটাকে দেখি, সে সেই মানুষটির অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। আবার এই মুখোশও দু'রকম। আদত মানুষ তার ভিতরের মুখোশটি জানে, আর বাইরের লোকেরা দেখে তার একাধিক মুখোশ। বাইরের এই মুখোশটা হয় সে নিজেই তৈরি করে নেয়, নয়তো তার ওপর সামাজিক পরিবেশ এই মুখোশ আরোপ করে এবং তা সে সানন্দে গ্রহণ করে।'

  —লুইজি পিরানদেল্লো

- 'নাটক হল শিল্প। শিল্প হল জীবন। নাটক মানুষ তৈরি করে না। মানুষ নাটক তৈরি করে। নাটকের যথার্থ শৈলী জীবন্ত চরিত্র থেকে উঠে আসে। নাটকের সঙ্গো জীবন্ত চরিত্রের মিলন ঘটানোই নাট্যকারের সবচেয়ে বড় কাজ।' *—লুইজি পিরানদেল্লো*

॥ ১ ॥

ইতালীয় 'গ্রোথে' শব্দ থেকে 'গ্রোটেস্ক' শব্দটির উদ্ভব হয়েছে। যার অর্থ 'গুহা'। রেনেসাঁস যুগে দেওয়ালের মাথা বেয়ে যেসব অদ্ভুত অদ্ভুত মুখ বসানো থাকত, সেগুলি থেকে গ্রোটেস্ক শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। গ্রোটেস্কের ভালো বাংলা প্রতিশব্দ পাওয়া কঠিন। তবে 'উদ্ভট', 'উৎকট' কিংবা 'কিম্ভূত' দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়। কাফকার 'মেটামরফোসিস' গল্পে গ্রোটেস্কের উদাহরণ আছে। গল্পের গোড়াতেই গ্রেথোর সামসার কীটে রূপান্তরিত হওয়ার বিবরণ আছে। ডিকেন্স ও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসে ও ব্রাউনিংয়ের কবিতায় গ্রোটেস্কের যথেষ্ট উপাদান আছে।

চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে গ্রোটেস্ক একটি শিল্পরীতি। এই রীতির সঙ্গো অ্যাবসার্ড

রীতির সাদৃশ্য আছে। এই রীতি বাস্তবতার ঠিক বিপরীতে চলে। মানুষকে অতিশয়িত ও বিকৃত করে অথবা মানুষ ও পশু বা বস্তুর মধ্যেকার বৈসাদৃশ্যগুলিকে উপস্থিত করে সে আমাদের হাসায়। আমাদের নিয়ে মজা করে। যেমন, বৃহদাকার এক কাগুজে বাঘের সামনে ক্ষুদ্রকায় এক মানুষ। একদিকে অসহায়তার তীব্র আততি। অন্যদিকে কৌতুকের ঝলক।

গ্রোটেস্কের নিন্দার্থক কিংবা নঞর্থক মূল্যায়ন না করে তাকে যদি কুৎসিত কিংবা খাপছাড়া সম্পর্কিত একটা নন্দনতাত্ত্বিক ধারণারূপে গ্রহণ করা যায় তাহলে সেটা যথেষ্ট অর্থবহ হয় এবং সেই নিরিখে 'গ্রোটেস্ক থিয়েটার'-এর বিচার করা হলে এই থিয়েটারের ওপর সুবিচার করা হয়।

'গ্রোটেস্ক থিয়েটার' প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অঙ্কুরিত আধুনিক ইতালীয় নাটকের একটি আন্দোলন। ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকের সারাটি সময় জুড়ে দাপিয়ে বেড়ানো এই আন্দোলন ব্যঙ্গরচনা, ব্যঙ্গোক্তি, চরম বাস্তববাদ এবং হাস্যোদ্দীপক কৌতুকের উপাদানের সূচনা করে ইতালীয় থিয়েটারে এক নতুন শক্তি ও জীবনদান করার চেষ্টা করে।

এই আন্দোলনের পুরোধায় ছিলেন নাট্যকার লুইজি চিত্ররেলি (১৮৮৪-১৯৪৭)। তাঁর নাটক : 'দ্য মাস্ক অ্যান্ড দ্য ফেস'। পিয়ের মেরিয়া রসসো ডাইস্যান সেকনডো (১৮৮৭-১৯৫৬)। তাঁর নাটক : 'পাপেটস, হোয়াট প্যাশন' (১৯১৮) ও 'দা ল্যাডার' (১৯২৬)। ম্যাসিমো বনটেম্পল্লী (১৮৭৮-১৯৬০) এবং বিশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ ইতালীয় নাট্যকার, অভিনেতা, সমালোচক, ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্প রচয়িতা লুইজি পিরানদেল্লো (১৮৬৭-১৯৩৬)।

পিরানদেল্লোর জন্ম সিসিলিতে। রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। ১৮৮৮-তে বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে ডক্টরেট পান। ১৯২২ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার ছিলেন। ১৯৩৪-এ সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পান। গল্প, উপন্যাস ও কবিতা লিখে তিনি লেখকজীবন শুরু করেন। প্রথম উপন্যাস 'দ্য আউটকাস্ট' (১৮৯৩)। অন্য দুটি বিখ্যাত উপন্যাস : 'দ্য লেট মাতিয়া পাসকাল' (১৯০৪) ও 'ওয়ান, নো ওয়ান, অ্যান্ড ওয়ান হানড্রেড থাউজেন্ড' (১৯২৫)। তিনি ৭টি উপন্যাস, ২৩২টি গল্প ও ৪৪টি নাটক লিখেছেন। নাট্যকার হিসেবে আধুনিক থিয়েটারে স্ট্রিন্ডবার্গ, চেকভ, শ, ইবসেন ও ব্রেশটের সমান আসনেই পিরানদেল্লো অধিষ্ঠিত।

পিরানদেল্লোর পূর্ণাঙ্গ নাটক : 'রাইট ইউ আর ইফ ইউ থিংক সো' (১৯১৬), 'দ্য প্লেজার অব অনেস্টি' (১৯১৮), 'দ্য রুলস অব দ্য গেম' (১৯১৮), 'সিক্স ক্যারেকটারস ইন সার্চ অব অ্যান অথর' (১৯২১), 'এনরিকো ফোর' (১৯২২)— [এই নাটকটি লন্ডনে ১৯২৫-এ ও 'হেনরি ফোর' নামে, এবং

১৯২৯-এ নিউ ইয়র্কে 'দ্য মক এমপায়ারার' নামে অভিনীত হয়], 'টু ড্রেস দ্য নেকেড' (১৯২২), 'দ্য লাইফ আই গেভ ইউ' (১৯২৩), 'ইচ ইন হিজ ওন ওয়ে' (১৯২৪), 'টুনাইট উই ইম্প্রোভাইজ' (১৯৩০)।

পিরানদেল্লোর একাঙ্ক নাটক : 'দ্য ম্যান উইথ আ ফ্লাওয়ার ইন হিজ মাউথ' (১৯২৩)— [লন্ডনে ১৯২৬-এ নাটকটি মঞ্চস্থ হয়], 'ডায়েনা অ্যান্ড টুডা' (১৯২৬), 'বেল্লাভিটা' (১৯২৭), 'দ্য নিউ কলোনি' (১৯২৮), 'লাজারুস' (১৯৩২), 'টু ফাইন্ড ওয়ানসেলফ' (১৯৩২), 'হোয়েন ওয়ান ইজ সামবডি' (১৯৩৩), 'অ্যাজ ইউ ডিজায়ার মি' (১৯৩৬), 'দ্য মাউন্টেইন জায়েন্টস' (১৯৩৭), 'পোসথুমাসলি' (১৯৩৭)। এই একাঙ্ক নাটকগুলির কয়েকটি তাঁর ছোটগল্প থেকে তৈরি হয়েছিল। কয়েকটি তাঁর নিজস্ব নাট্যসংস্থার প্রযোজনার জন্য লেখা হয়েছিল।

১৯২৫ সালে পিরানদেল্লো ৩০০ আসনবিশিষ্ট রোমের তিয়েত্রো ওদেশকালচি থিয়েটারের পরিচালনভার গ্রহণ করেন। এখানে তিনি তাঁর নাটক প্রযোজনা ও পরিচালনা করেন। সফল পরিচালক হিসেবে স্বীকৃতিও পান। তিনি তাঁর নাট্যসম্প্রদায় 'তিয়েত্রো দেনলি উনদিসি' নিয়ে বহুবার ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও লাতিন আমেরিকা সফর করেন।

পিরানদেল্লো ১৯২৩-এ মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট পার্টির সভ্য হন। কিন্তু ১৯৩৪-এ ফ্যাসিস্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে। ১৯৩৫-এ ইতালি ইথিওপিয়া আক্রমণ করলে তিনি তাঁর তীব্র নিন্দা করেন।

॥ ২॥

পিরানদেল্লোকে ইতালির বার্নাড শ বলা হয়। দুইয়ের মানসিক চিন্তাধারার মধ্যে যেমন একটা সাদৃশ্য দেখা যায়, চেহারাতেও তেমনই এক উল্লেখযোগ্য মিল আছে। মানুষের জীবন-সংগ্রামের ভিতর দিয়ে যে নিয়ত এক মর্মান্তিক বেদনা অভিব্যক্ত হয়, সেই বেদনাই পিরানদেল্লোর সাহিত্য ও নাট্যসাধনার প্রাণস্বরূপ। তিনি বলেছেন, 'জীবন আমার কাছে নিত্য-পরিবর্তনশীল। নতুন অভিব্যক্তির অভিমুখেই সে সর্বদা চলছে। কোরকের অবস্থা থেকে জীবন-পদ্ম অনাগত মহাকালের পরিস্ফূর্তির দিকে মুখ করে ফুটে উঠছে। নিত্যনতুন তার উপলব্ধি। কোনও বাঁধনের গন্ডি সে মানে না। আর যা নতুন, কাল তা পুরোনো হয়ে পড়ে। আমাদের জীবন-পদ্ম আচ্ছাদিত হয়ে রয়েছে গভীর বুজরুকির জালের অন্তরালে। সে চায় আলো। সে চায় বিকাশ। তারই অভাবে তার সমস্ত আকুতি। বেদনা। আমি এই বেদনাকে রূপ দিতে চেষ্টা করেছি। গভীর কুয়াশাজালে আমাদের দৃষ্টি

সমাচ্ছন্ন রয়েছে। আমরা নিজেদের সত্যস্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারছি না। পরস্পরকে ভুল বুঝছি। জীবনে অনেক বেদনা আমি পেয়েছি। কিন্তু সেইসব বেদনা আমাকে এই আত্মোপলব্ধি দান করেছে। জড়বাদের প্রভাবে পড়ে সমস্ত যৌবন আমি শুধু অন্ধকারে হাতড়িয়েছি। কিন্তু আমি এখন নিজেকে পেয়েছি। জীবন-সংগ্রামের মূলে বেদনার এই অনুভূতিই যুগে যুগে নবসৃষ্টির অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। যিনি জীবনে এই অনুভূতির আলো পেয়েছেন, তাঁর সাধনা যে বিশ্বে সমাদরলাভ করবে, তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই।'

১৯০৮-এ পিরানদেল্লো তাঁর নাট্যতত্ত্ব 'গ্রোটেস্ক থিয়েটার' বইটি প্রকাশ করেন। এই বইতে তাঁর দর্শন ও অন্তর্দৃষ্টির সংশ্লেষ পাওয়া যায়। তিনি বাস্তববাদ, ভাববাদ ও চিরাচরিত সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। তিনি বললেন, 'স্থির বাস্তবতা বলে কিছু নেই। কারণ আমরা যাকে বাস্তবতা বলি, লোকভেদে, দেশভেদে তা পালটে যায়। ভাববাদ বলে কিছু নেই। ভাববাদ বলে যা চালু আছে তা সুবিধাবাদীদের শোষণ ও শক্তি মদমত্ততার নিষ্পেষণ যন্ত্রমাত্র। পরিপূর্ণ সত্য বলেও কিছু নেই। জীবনেও নেই, ব্যবহারেও নেই। কারণ স্থান ও কাল ভেদে সত্য পালটায়। যে সত্যের কথা আমরা বলি তা মানুষের তৈরি, মানুষের ভুলে রঙিন।'

পিরানদেল্লো বললেন, 'জীবনের রঙ্গামঞ্চে আমরা সবাই মুখোশ পড়ে আছি। আমরা বাইরের যে মানুষটাকে দেখি, সে সেই মানুষটির অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। আবার এই মুখোশও দু'রকম। অন্তত মানুষ তার ভিতরের মুখোশটি জানে আর বাইরের লোকেরা দেখে তার একাধিক মুখোশ। বাইরের এই মুখোশ হয় সে নিজেই তৈরি করে নেয়, নয়তো তার ওপর সামাজিক পরিবেশ এই মুখোশ আরোপ করে এবং তা সে সানন্দে গ্রহণ করে।' পিরানদেল্লোর প্রশ্ন : এর মধ্যে আমরা খাঁটি মানুষটাকে কোথায় খুঁজে পাব? ব্যক্তি মানুষের সঠিক পরিচয়ই বা কী করে পাব? পিরানদেল্লো তাঁর নাটকে মানুষের এই বাইরের সত্য ও প্রকৃত সত্যের দুই বৈপরীত্য ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। একই চরিত্রের মধ্যে এনেছেন অনেক সত্তার উপস্থিতি।

পিরানদেল্লো থিয়েটার নিয়ে খেলা করেছেন। 'নাটকের মধ্যে নাটক' এনেছেন। কৌতুক আর বিদ্রূপের আড়ালে তৈরি করেছেন এক প্রতীকী ভাষা। প্রবল ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিয়েছেন নাট্যজগৎকে। স্বাভাবিকতার সঙ্গে অস্বাভাবিকতা মিশিয়ে এক নতুন নাট্যরীতির অর্গল খুলে দিয়েছেন। বুদ্ধি ও আবেগের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছেন।

পিরানদেল্লোর নাটকে আমরা চিরাচরিত ব্যর্থতাবোধের মুখোমুখি হই। তাঁর নাটকের চরিত্রদের মনের অলিগলির বাঁকাচোরা পথে নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখে চমকে উঠি। নাটক হয়ে দাঁড়ায় আমাদের মনশুদ্ধির পাঠ। জীবনদর্শনের মন্ত্র। যে

প্রশ্ন তাঁর নাটকে জেগে ওঠে, আমাদের জীবনে-মননে তা অনিবার্য হয়ে ওঠে।

পিরানদেল্লোর প্রতিটি নাটকে ছড়িয়ে রয়েছে 'হিউমার'। পিরানদেল্লোর ব্যাখ্যায় 'হিউমার' মানে হাসানো নয়। 'হিউমার'-এর অভিঘাতে মানুষ হ্যা হ্যা করে হাসবে না। মজা পাবে। একটা ধাক্কা খাওয়ার মজা।

পিরানদেল্লো বললেন, 'নাটক হল শিল্প। শিল্প হল জীবন। নাটক মানুষ তৈরি করে না। মানুষ নাটক তৈরি করে। নাটকের যথার্থ শৈলী জীবন্ত চরিত্র থেকে উঠে আসে। নাটকের সঙ্গে জীবন্ত চরিত্রের মিলন ঘটানোই নাট্যকারের সবচেয়ে বড় কাজ। তাই নাট্যকারের আগে কাহিনি ও পরে চরিত্র ঠিক করা উচিত নয়। উলটোটা করা উচিত। আগে চরিত্র ও পরে কাহিনি নির্মাণ করা উচিত।'

॥ ৩॥

পিরানদেল্লো তাঁর 'রাইউ ইউ আর ইফ ইউ থিংক সো' নাটকে একটি বিশেষ সম্পর্কের ভাষা পাশাপাশি উপস্থিত করেছেন। সমস্ত নাটক জুড়ে রহস্যের একাধিক বাতাবরণ সৃষ্টি করেছেন। রহস্যের সমাধান করেননি। 'দ্য প্লেজার অব অনেস্টি' ও 'হেনরি ফোর' নাটকে তিনি একাধিক চরিত্রকে ছদ্মচরিত্র বা মুখোশ পরিয়েছেন। 'হেনরি ফোর' নাটকের মুখ্য চরিত্র নিজস্ব জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে অভিনয়রত পাগল হেনরির চরিত্রের ভূমিকাতেই চিরকালের মতো আটকে পরে যায়। পরে তার যখন জ্ঞানবুদ্ধি ফেরে, তার আশপাশের লোকেরা তা টের পায় না। সে তার পুরোনো প্রতিদ্বন্দ্বীকে খুন করে ও পাগলামির ভানের আড়ালে ফিরে গিয়ে আত্মরক্ষা করে। অন্যদিকে জীবন ও নাটকের সম্পর্ক ও বৈপরীত্যের খেলা সার্থক রূপ পেয়েছে তাঁর 'ইচ ইন হিজ ওন ওয়ে' নাটকে। আপাতবাস্তব তথা আপাতসত্যের রহস্য তুলে ধরতে পিরানদেল্লো এই নাটকে প্রথম থিয়েটারের রূপক অবলম্বন করেন। নাটকে যে প্রেম-সন্দেহ-অবিশ্বাস-আত্মহত্যার ঘটনার প্রতিফলন ঘটে, প্রেক্ষাগৃহে আসল ঘটনার জীবিত কুশীলবদের উত্তেজিত প্রতিক্রিয়ায় মূল নাটকের অভিনয় আরও নাটকীয় হয়ে ওঠে।

পিরানদেল্লোর সবচেয়ে বিখ্যাত নাটক 'সিক্স ক্যারেকটারস ইন সার্চ অব অ্যান অথর'। এই নাটকটি তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দেয়। এই নাটকে থিয়েটার ও বাস্তবতার মধ্যেকার সম্পর্ক বিশ্লেষিত হয়েছে। দুইয়ের মধ্যেকার আপাত-বিরোধী সত্য ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। এই নাটকে ছ'টি নাটকীয় চরিত্র এক নাটকের মহলায় উপস্থিত হয়ে তাদের ভয়ঙ্কর, বিয়োগান্তক জীবননাট্য পরিচালক ও অভিনেতাদের সামনে পরিবেশন করতে চায় যাতে তাঁরা সেই জীবননাট্য অবলম্বনে এক নাটক রচনা ও অভিনয় করে ফেলতে পারেন। কিন্তু

বাস্তবে দেখা গেল এই বাস্তব চরিত্রদের কাহিনি, এমনকি তাদের আচরণও, নাটকের চেয়ে অনেক বেশি নাটকীয়। ওই নাট্যগোষ্ঠীর পেশাদার অভিনেতা-অভিনেত্রীরা তাদের অনুকরণ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁদের অভিনয়ে অবাস্তবতা ফুটে ওঠে। বাস্তব চরিত্ররা তাঁদের অভিনয়কে মেনে নিতে পারে না।

'সিক্স ক্যারেকটারস ইন সার্চ অব অ্যান অথর' নাটকটি প্রথম রজনীর অভিনয় কিন্তু শান্তিতে হয়নি। এই নাটকের অভিনয়ের সময় প্রেক্ষাগৃহে এক হুলস্থূল শুরু হয়। দর্শক, সমালোচক ও অভিনেতারা প্রত্যেকে প্রত্যেককে গালাগাল দিতে থাকেন। মারামারি বেধে যায় এবং তা মঞ্চের ওপর, এমনকি বক্সেও পৌঁছে যায়। নাটকের শেষে কিছুক্ষণের জন্য নাট্যকার মঞ্চের ওপর দেখা দিলে গণ্ডগোল দ্বিগুণ হয়ে যায়। হলের বাইরেও দর্শকরা সমবেত হয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। পিরানদেল্লো ও তাঁর মেয়ে লিয়েট্টা এক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর পিছনের দরজা দিয়ে পালাতে যান। কিন্তু রাস্তায় একটি ল্যাম্পপোস্টের নিচে তাঁদের দেখতে পেয়ে দর্শকরা কটূক্তি ও শিস দিতে থাকেন। তাঁদের দিকে পয়সা ছুঁড়তে থাকেন। কোনওক্রমে একটি ট্যাক্সি করে তাঁরা পালাতে সমর্থ হন। সারা রাত ধরে উত্তপ্ত বিতর্ক চলতে থাকে।

চার মাস পরে নাটকটি মিলানের 'ত্রিয়েত্রো ম্যানজোনি'তে অভিনীত হয়। এই অভিনয় দর্শকরা মনোযোগ দিয়ে দেখেন। সংলাপ শোনেন। নাটকের শেষে তাঁরা অভিনন্দনও জানিয়ে যান। তাঁরা বুঝতে পারেন যে, বিশ্বনাট্যে শুধু একজন নতুন নাট্যকার বা একটি নতুন নাট্যশৈলীরই আবির্ভাব ঘটেনি, এক নতুন শক্তিরও স্ফূরণ হয়েছে। প্রথাগত থিয়েটারের রীতিনীতি ভেঙেচুরে এই নতুন নাট্যশক্তি এমন এক নতুন ফর্মের প্রবর্তন করেছে, যাতে বিশ শতকের বুর্জোয়া সমাজের ছদ্ম-মূল্যবোধ খসে পড়েছে। 'নাটকের মধ্যে নাটক'-এর রূপবন্ধে জীবন ও নাটক, ব্যক্তি ও সমাজের আপাত-বিরোধী সত্য প্রতিবিম্বিত হয়েছে। পিরানদেল্লোর এই আবিষ্কার আমরা পরবর্তী পর্যায়ে জেনে, আনুই, থর্নটন ওয়াইল্ডার ও টেনেসি উইলিয়ামসের মধ্যে দেখেছি। যুদ্ধ-পরবর্তী অ্যাবসার্ড নাটকেও এই নাটকীয় বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ করেছি।

১৯২২ সালে লন্ডনে কোমিজারস্কি, নিউ ইয়র্কে পেমারটন ও ১৯২৪-এ বার্লিনে রেইনহার্ড নাটকটি প্রযোজন করেন। এরপর সারা বিশ্বে এই নাটক বহু নাট্যদল অভিনয় করেছে। ১৯২৫-এ ২৫টি ভাষায় এই নাটকটি অনূদিত হয়।

বিশ শতকের সাতের দশকে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় কলকাতার 'নান্দীকার' নাট্যগোষ্ঠী এই নাটকটি বাংলায় 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র' ও 'হেনরি ফোর' অবলম্বনে 'শের আফগান' নাটকটি মঞ্চস্থ করে ও বিপুল জনপ্রিয়তা পায়।

গ্রুপ থিয়েটার

- 'মশাই এক ডলার দিয়ে দশটা পাউরুটি কেনা যায়। আবার এক ডলার নিয়ে নটা পাউরুটি ও এক কপি কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোও কেনা যায়।' —*ওয়েটিং ফর লেফটি*
- 'সব সাহিত্যের মতো নাটকও প্রচার।' —*ক্লিফোর্ড ওডেটস*
- 'ওডেটস প্রচণ্ড আঘাত করেন, প্রয়োজন হলে অন্যায়ভাবেও। কিন্তু নিশ্চিতভাবে তিনি আঘাত করেন।' —*ম্যাসন ব্রাউন*
- 'অ্যারিস্টোক্র্যাটিক অ্যাকটিং সত্যকে শ্বাসরুদ্ধ করে রেখেছে।' —*লি স্ট্রেসবার্গ*
- 'এই অভিনয়ের মাধ্যমে আমরা অতীতের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি দেখেও সন্তুষ্ট হই না। কারণ এই অভিনয়ে চিন্তা বা অনুভবের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রকাশ পায় না। কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া আমরা যা দেখেছি তা শুধুই কৌশল। শুধুই কৃত্রিম।' —*হ্যারল্ড ক্লারম্যান*
- 'যে কোনও প্রাণবন্ত থিয়েটারেব পক্ষে অভিনেতার প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' —*লি স্ট্রেসবার্গ*
- 'থিয়েটারের অনেকটাই কাল্পনিক সৃষ্টি। তার কাহিনি কাল্পনিক। চরিত্ররা কাল্পনিক। সংলাপ কাল্পনিক। তাই অভিনেতার অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব হচ্ছে মনের মধ্যে কাল্পনিক বাস্তবকে এমন প্রগাঢ়ভাবে সৃষ্টি ও পালন করা যাতে তা আসল প্রতিক্রিয়ায় প্ররোচিত করতে পারে।' —*লি স্ট্রেসবার্গ*
- 'অভিনয় সমবেত শিল্প। একজনের প্রতিক্রিয়া তার সতীর্থের আচরণের ওপর নির্ভর করে। তাই প্রাথমিক প্রশিক্ষণে দলগত অনুশীলন প্রয়োজন।' —*লি স্ট্রেসবার্গ*

'প্রতিটি মহড়াকে পরিচালকের এমন আনন্দদায়ক করে তোলা উচিত, যাতে অভিনেতারা পরবর্তী মহড়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকেন।'

—*টাইরন গুথরি*

'আমি ওনার কাছ থেকে যে অনন্য শিক্ষা পেয়েছি, তা আমি কারুর কাছ থেকে পাইনি।' —*লরেন্স অলিভিয়ার*

বিশ শতকের চারের দশকে সম্পূর্ণ তারকাবর্জিত, বাস্তবধর্মী অভিনয়সমৃদ্ধ, সৃজনশীল, সমাজমনস্ক ও তাৎপর্যপূর্ণ সমবেত নাট্যসৃজনের লক্ষ্যে আমেরিকার নিউ ইয়র্কে, দক্ষিণ আয়ারল্যান্ডের বেলফাস্টে ও ইংল্যান্ডের লন্ডনে 'গ্রুপ থিয়েটার' শিরোনামে এক নতুন ধারার নাট্য-আন্দোলন শুরু হয়।

১৯৩১ সালে হ্যারল্ড ক্লারম্যান, লি স্ট্রেসবার্গ, এলিয়া কাজান ও চেরিল ক্রফোর্ড নিউ ইয়র্কে প্রথম 'গ্রুপ থিয়েটার' নামে একটি নাট্যদল প্রতিষ্ঠা করেন। এই নাট্যদল ১০ বছরে ২২টি নতুন বাস্তববাদ ও সমাজবাদে সিক্ত আমেরিকান নাটক মঞ্চস্থ করে। বাণিজ্যিকভাবে সফলও হয়। এই দলের প্রথম প্রযোজনা ম্যাক্সওয়েল অ্যান্ডারসনের 'নাইট ওভার টাওস' (১৯৩২)। পরের বছর জন হাওয়ার্ড লসনের 'সাকসেস স্টোরি' ও সিডনি কিংসলির 'মেন ইন হোয়াইট'। শেষের নাটকটি ৩৫১ রজনী অভিনীত হয়। এই দলটি উইলিয়াম ম্যারোইয়ান, এরউইন শ, পল গ্রিন, রবার্ট আরড্র, ভ্যান হের্ফলিন, লি জে কব, ফ্রাঞ্চেস ফারমার, ফ্র্যানস্ট টোন, লুথার অ্যাডলার এবং বামপন্থী নাট্যকার ক্লিফোর্ড ওডেটসের নাটক মঞ্চস্থ করে। দলটি ১৯৪১-এ ভেঙে যায়। এর বেশিরভাগ অভিনেতাই বাণিজ্যিক থিয়েটার বা চলচ্চিত্রে চলে যান।

অভিনেতা, পরিচালক ও সমালোচক হ্যারল্ড ক্লারম্যান (১৯০১-১৯৮০) ১৯২৪ সালে গ্রিনউইচ ভিলেজ থিয়েটারে প্রথম মঞ্চাবতরণ করেন। ১৯২৫-এ থিয়েটার গিল্ডে অভিনেতা হিসেবে তিনি যোগ দেন। ১৯৩১-এ তিনি গ্রুপ থিয়েটার নাট্যদল প্রতিষ্ঠায় প্রধান ভূমিকা নেন। এখানে তিনি ক্লিফোর্ড ওডেটসের পাঁচটি নাটক 'অ্যাওয়েক অ্যান্ড সিং' (১৯৩৫), 'প্যারাডাইস লস্ট' (১৯৩৫), 'গোল্ডেন বয়' (১৯৩৭), 'রকেট টু দ্য মুন' (১৯৩৮) ও 'নাইট মিউজিক' (১৯৪০) পরিচালনা করেন। এছাড়াও তিনি এরউইন শ-র 'দ্য জেন্টল পিপল' (১৯৩৯), কারসন ম্যাককুলার্সের 'দ্য মেম্বার অব দ্য ওয়েডিং' (১৯৫০), ইনজেসের 'বাস স্টপ' (১৯৫৫), আনুইয়ের 'দ্য ওয়ালজ অব দ্য টোরিড্রডোরস (১৯৫৭), ও নিলের 'আ টাচ অব দ্য পোয়েট' (১৯৫৮) এবং বার্নাড শ-র 'হার্ট

ব্রেক' (১৯৫৯) নাটক পরিচালনা করেন।

ক্লারম্যান 'দ্য ফারভেন্ট ইয়ারস : দ্য স্টোরি অব দ্য গ্রুপ থিয়েটার' (১৯৪৫), 'লাইফ লাইক ট্রুথ : থিয়েটার রিভিউজ অ্যান্ড এসেজ' (১৯৫৮), 'দ্য নেকেড ইমেজ' (১৯৫৮), 'দ্য ডিভাইন প্যাসটাইম' (১৯৭৪), 'অন ডাইরেক্টিং' (১৯৬৮), 'ইবসেন' (১৯৭৭), 'অল পিপল আর ফেমাস, ইনস্টেড অব অ্যান অটোবায়োগ্রাফি' (১৯৭৪) গ্রন্থাদি রচনা করেন। তিনি 'দ্য নিউ রিপাবলিক' (১৯৪৯-৫২), 'লন্ডন অবজারভার' (১৯৫৫-৬৩) ও 'দ্য নেশন' (১৯৫৩-৮০) পত্রিকার নাট্য-সমালোচক ছিলেন।

অভিনেত্রী ও পবিচালক চেরিল ক্রফোর্ড (১৯০২-১৯৮৬) ১৯২৩ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত থিয়েটার গিল্ডে অভিনয় করেন। ১৯৩১-এ গ্রুপ থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় তিনি সক্রিয় ভূমিকা নেন। অর্থ সংগ্রহ, বাজেট নিয়ন্ত্রণ, মহড়ার জায়গা খোঁজা, মঞ্চ ভাড়া করা ইত্যাদি সমস্ত প্রশাসনিক কাজ তিনি করতেন। তিনি ১৯৪৬-এ 'আমেরিকান রেপারটরি থিয়েটার' ও ১৯৪৭-এ এলিয়া কাজান ও রবার্ট লুইসের সঙ্গো 'অ্যাকটর'স স্টুডিও' প্রতিষ্ঠা করেন।

চিত্র ও নাট্য-পরিচালক এলিয়া কাজান (১৯০৯-২০০৩) আমেরিকার উইলিয়ামস কলেজ ও ইয়েল ড্রামা স্কুলে অভিনয় শিখে গ্রুপ থিয়েটার নাট্যদলে অভিনেতা হিসেবে যোগ দেন। পরে তিনি এই নাট্যদলের পরিচালক ও সদস্য হন। ১৯৪৭-এ তিনি অ্যাকটর'স স্টুডিওর সহ-প্রতিষ্ঠক ছিলেন।

১৯৩৫-এ ওডেটসের 'ওয়েটিং ফর লেফটি' নাটকে অ্যাগেট কেলারের ভূমিকায় কাজানের প্রথম মঞ্চাবতরণ। ১৯৪০ থেকে ক্রমশই তিনি পরিচালনায় উৎসাহী হতে থাকেন। থর্নটন ওয়াইল্ডারের এক্সপ্রেশনিস্ট নাটক 'দ্য ভেনাস' (১৯৪৩), 'জ্যাকোবাউস্কি' ও 'কর্নেল' (১৯৪৪) নাটক পরিচালনা করে সকলের নজর কাড়েন।

এরপর দীর্ঘদিন কাজান আমেরিকার মঞ্চ ও চলচ্চিত্র জগতে মুখ্য ও অপরিহার্য পরিচালক হিসেবে গণ্য হয়েছেন। তাঁর মঞ্চ-পরিচালনা : 'আ স্ট্রিট কার নেমড ডিজায়ার' (১৯৪৭), 'ডেথ অব আ সেলসম্যান' (১৯৪৯), 'ক্যাট অন আ হট টিন রুফ' (১৯৫৫) এবং 'সুইট বার্ড অব ইয়ুথ' (১৯৫৫)। তাঁর চিত্র-পরিচালনা : 'আ স্ট্রিট কার নেমড ডিজায়ার' (১৯৫১), 'অন দ্য ওয়াটারফ্রন্ট' (১৯৫৪) এবং 'ইস্ট অব ইডেন' (১৯৫৫)।

কাজানের মঞ্চ ও চিত্র পরিচালনার সাফল্য তাঁকে 'মেথড' পরিচালক হিসেবে স্বনামধন্য ও জনপ্রিয় করে তোলে। তাঁর উচ্চমানের অভিনয় প্রশিক্ষণ শিশিক্ষু অভিনেতাদের অনুভূতির গভীরতা ও তীব্রতা প্রকাশে বিশেষ সাহায্য

করে। তাঁর ন্যাচারালিস্টিক অভিনয়শৈলী ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে আমেরিকান ছবিতে দেখা যায়।

কাজান ১৯৪৭-এ 'জেন্টলমেন'স এগ্রিমেন্ট' ও ১৯৫৪-তে 'অন দ্য ওয়াটারফ্রন্ট' ছবি পরিচালনার জন্য টনি অ্যাওয়ার্ড ও ১৯৯৯-তে অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড ফর লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট পান।

১৯৬২ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত কাজান নিউ ইয়র্কের লিঙ্কন সেন্টার ফর দ্য পারফরমিং আর্টসে সহ-পরিচালক হিসাবে ছিলেন।

কাজান ১৯৩৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। কিন্তু দেড় বছর পরে বীতস্পৃহ হয়ে ছেড়ে দেন। এক সময়ে তিনি হলিউডের ১৭ জন সহকর্মীকে কমিউনিস্ট হিসেবে চিহ্নিত করতে সরকারকে সাহায্য করেছিলেন, যা অনেকের মতে, তাঁর জীবনের একটি কলঙ্কিত অধ্যায়।

ক্লিফোর্ড ওডেটস (১৯০৬-১৯৬৩) এই সময় সামাজিক ও প্রতিবাদী নাট্যকার হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত হন। দীর্ঘ একাঙ্ক নাটক 'ওয়েটিং ফর লেফটি' (১৯৩০) লিখে তিনি রাতারাতি প্রসিদ্ধ হয়ে যান। 'অ্যাজিট-প্রপের' টেকনিকে রচিত এই নাটক সেই সময়কার একটি শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নাটক। নাটকের কয়েকটি সংলাপ পড়লেই তা বোঝা যায় : 'মশায়, এক ডলার দিয়ে দশটা পাউরুটি কেনা যায়। আবার এক ডলার দিয়ে নটা পাউরুটি ও এক কপি কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোও কেনা যায়।' আর এক জায়গায়, 'খেতে খেতে শেখো... দৌড়তে দৌড়তে পড়ো।' নাটকটিতে অনেক ফ্ল্যাশব্যাক দৃশ্য আছে, যেগুলিতে দেখানো হয়েছে কীভাবে দায়বদ্ধহীন চরিত্ররা তাদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দায়বদ্ধ হয়ে যায়। নাটকের কাহিনি এইরকম : নিউ ইয়র্কের ট্যাক্সি ড্রাইভারদের একটি সভা চলছে। তারা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে ধর্মঘট করবে কি না। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে তারা 'লেফটি' নামে একজনের আগমনের অপেক্ষায় আছে। শেষ পর্যন্ত 'লেফটি' আসে না। খবর আসে, সে খুন হয়ে গেছে। সবারই তখন প্রশ্ন : 'তাহলে কী সিদ্ধান্ত নেব আমরা? ধর্মঘট হবে, না হবে না? ঠিক এই মুহূর্তে সমস্ত দর্শক চিৎকার করে বলে উঠতেন, 'ধর্মঘট হবে, ধর্মঘট হবে।' দর্শকের এই গঠনমূলক সামাজিক প্রতিক্রিয়ায় নাটকের ফলপ্রসূতা আর একটি মাত্রা পেয়ে যেত। ওডেটসের অন্যান্য নাটক : নাৎজিদের গোপন চক্রান্ত নিয়ে লেখা 'টিল দ্য ডে আই ডাই' (১৯৩৫), ইহুদি শিশু-শ্রমিকদের নিয়ে লেখা 'অ্যাওয়েক অ্যান্ড সিং' (১৯৩৫), পেশাদার বক্সিং নিয়ে লেখা 'গোল্ডেন বয়' (১৯৩৭), হলিউডের অবক্ষয়ের সত্য উদ্ঘাটনে লেখক হিসেবে তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা 'দ্য বিগ নাইফ' (১৯৪৯), মদ্যপায়ী এক অভিনেতা ও তার স্ত্রীর গল্প 'দ্য কান্ট্রিগার্ল' (১৯৫০)।

দু'বছর পরে এই নাটকটি 'উইন্টার জার্নি' নামে লন্ডনে অভিনীত হয় এবং ১৯৫৪-তে এটি চলচ্চিত্রায়িত হয়। বিল ক্রসবি ও গ্রেস কেলি এই ছবিতে দুটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন। ওডেটসের শেষ নাটক আধুনিক ব্রুকলিনের নোয়া-র গল্প 'দ্য ফ্লাওয়ারিং পিচ' (১৯৫৪)। ওডেটস সম্পর্কে জন ম্যাসন ব্রাউন তাঁর 'ড্রামাটিক পারসোনা' বইতে বলেছেন, 'ওডেটস প্রচণ্ড আঘাত করেন, প্রয়োজন হলে অন্যায়ভাবেও। কিন্তু নিশ্চিতভাবে তিনি আঘাত করেন।' ওডেটস আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। নাটক সম্পর্কে তাঁর অভিমত ছিল : 'সব সাহিত্যের মতো নাটকও প্রচার।'

পরিচালক ও অভিনয় প্রশিক্ষক লি স্ট্রেসবার্গের (১৯০১-১৯৮২) জন্ম অস্ট্রিয়ায়। আমেরিকান ল্যাবরেটরি থিয়েটারে পড়াশোনা করে তিনি ১৯২৪-এ লন্ডনের গ্যারিক থিয়েটারে সহ-মঞ্চাধ্যক্ষ হিসেবে থিয়েটারের জগতে প্রবেশ করেন। এরপর তিনি থিয়েটার গিল্ডে কিছুদিন অভিনয় করেন। ১৯৩১-এ তিনি গ্রুপ থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় মুখ্য ভূমিকা নেন। তাঁর পরিচালনার মধ্যে আছে পল গ্রিনের 'দ্য হাউস অব কনোলি' (১৯৩২), ম্যাক্সওয়েল অ্যান্ডারসনের 'নাইট ওভার টাওস' (১৯৩২), সিডনি কিংসলের 'মেন ইন হোয়াইট' (১৯৩৩) ও পল গ্রিনের 'জনি জনসন' (১৯৩৬)। ১৯৬৫-তে তিনি অ্যালডউইচ থিয়েটারে আন্তন চেকভের 'থ্রি সিস্টারস' পরিচালনা করেন। তিনি মস্কো আর্ট থিয়েটারের অভিনেতা রিচার্ড বলিস্লাভস্কির কাছ থেকে স্তানিস্লাভস্কির অভিনয়-পদ্ধতি শেখেন ও ওই পদ্ধতি অনুসরণ করে 'মেথড অ্যাকটিং' নামে একটি পদ্ধতি সূত্রবদ্ধ করেন। ১৯৫০-এ অ্যাকটর'স স্টুডিওতে পরিচালক হয়ে এসে তিনি সেটিকে 'মেথড অ্যাকটিং স্কুল'-এ পরিণত করেন। ১৯৮২ সাল পর্যন্ত এখানে তিনি ব্যক্তিগতভাবে অভিনয় প্রশিক্ষণ দেন। তাঁর সময়ে স্টুডিওটি 'মেথড অ্যাকটিং'-এর উচ্চ মন্দির বলে প্রসিদ্ধ হয়। প্রখ্যাত মঞ্চ ও চলচ্চিত্র অভিনেতারা তাঁর কাছে অভিনয় শিখতে আসতেন।

'অ্যাকটর'স স্টুডিও' ছিল পেশাদার অভিনেতাদের একটি অপূর্ব কর্মশালা। এটি কোনও বিদ্যালয় নয়। এখানে কোনও টিউশন ফি লাগত না। কঠোর অডিশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনও অভিনেতা স্বীকৃত ও গৃহীত হয়ে গেলে তিনি সারা জীবনের জন্য স্টুডিওর সদস্যপদ পেয়ে যেতেন। সমগ্র আমেরিকায় এই স্টুডিওতে প্রবর্তিত মেথড অ্যাকটিংয়ের প্রচণ্ড প্রভাব পড়ে এবং বিশুদ্ধ ও অপরিহার্য আমেরিকান অভিনয়শৈলী হিসেবে চিহ্নিত হয়। এই স্টুডিওর প্রবাদপ্রতিম অভিনেতারা হলেন : মার্লো ব্র্যান্ডো, পল নিউম্যান, আল প্যাসিনো, মেরিলিন মনরো, ডাসটিন হফম্যান, মন্টোগোমারি ক্লিফট, রবার্ট ডি নিরো, শেলি

উইনটারস, জুলি হ্যারিস, জোয়ান উডওয়ার্ক, জেমস ডিন, অ্যান ব্যাংক্রফট, মরিস কারনোভস্কি, জন গারফিল্ড, জে. এডওয়ার্ড ব্রমবার্গ, ফোয়েবি ব্র্যান্ড, আর্ট স্মিথ, ম্যানফোর্ড মেইজলার, কুথ নেলসন, মার্গারেট বার্কার, ফ্যানকট টোন।

আমেরিকায় এই অভিনয়রীতি প্রসারের আর একটি কারণ ছিল। এই সময় নিউ ইয়র্ক ও লন্ডনের মঞ্চগুলিতে ব্রিটিশ স্টাইলের 'অ্যারিস্টোক্র্যাটিক অ্যাকটিং' নামে এক ধরনের ছাঁচে ঢালা অভিনয় প্রচলিত ছিল। তরঙ্গায়িত সংলাপ কথন, অতিরিক্ত স্পষ্ট ও শুদ্ধ উচ্চারণ, প্রতীকী মুভমেন্ট, সুন্দর ও নান্দনিক দেহভঙ্গিমা এই অভিনয়রীতির বৈশিষ্ট্য ছিল। এই 'অ্যারিস্টোক্র্যাটিক অ্যাকটিং' শুধু কৃত্রিমই দেখাত না, কৃত্রিম অর্থও প্রকাশ করত। তার মধ্যে কখনও স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক অভিব্যক্তি প্রকাশ পেত না।

স্ট্রেসবার্গ বললেন, 'অ্যারিস্টোক্র্যাটিক অ্যাকটিং' সভ্যকে শ্বাসবদ্ধ করে রেখেছে।' ক্লারম্যান বললেন, 'এই অভিনয়ের মাধ্যমে আমরা অতীতের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি দেখেও সন্তুষ্ট হই না। কারণ এই অভিনয়ে চিন্তা বা অনুভবের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রকাশ পায় না। কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া আমরা যা দেখেছি তা শুধুই কৌশল। শুধু কৃত্রিম।'

এই 'অ্যারিস্টোক্র্যাটিক অ্যাকটিং'-এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ায় আমেরিকায় আবাহন করা হল স্তানিস্লাভস্কির 'মেথড অ্যাকটিং'-কে। 'মেথড'-এর প্রবক্তারা দাবি করলেন যে, এই পদ্ধতিতে অভিনেতারা শক্তিশালী আবেগ অনুভব করেন। চরিত্রের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা দেন। 'অভিনয়' করার পরিবর্তে 'প্রতিক্রিয়া' দেখান। 'করা'র পরিবর্তে 'হন'। 'অ্যারিস্টোক্র্যাটিক অ্যাকটিংয়ের' অভিনয়শৈলীর চেয়ে এই 'মেথড অ্যাকটিং' অনেক বেশি স্বাভাবিক। একান্ত, গভীর, অন্তর্দর্শী। আরও দাবি করা হল যে, এই পদ্ধতিতে অভিনেতার চরিত্রচিত্রণ আরও বেশি বিশ্বাসযোগ্য, বাস্তবধর্মী ও জীবন্ত হয়।

স্ট্রেসবার্গ মার্ক্সবাদ অধ্যয়ন করলেন। তারকাপ্রথা ভেঙে দিয়ে অভিনেতাদের চরিত্র বণ্টনে আনলেন 'প্রলেতারিয়ান স্টাইল'। যাঁরা বরাবর কম গুরুত্বপূর্ণ বা ছোট চরিত্রে অভিনয় করতেন, তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ও সিরিয়াস চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ দিলেন। যেহেতু এই প্রলেতারিয়ানরা 'অ্যারিস্টোক্র্যাটিক অ্যাকটিং'-এর কৃত্রিম অভিনয়ধারায় সংক্রামিত ছিলেন না, তাই তাঁরা বিশুদ্ধ অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে পারলেন।

স্ট্রেসবার্গের 'মেথড অ্যাকটিং'-এর আর একটি বৈশিষ্ট্য হল রিয়ালিস্টিক অভিনয়। এখানে রিয়ালিস্টিক অভিনয়ের অর্থ হল চরিত্রের বাস্তবতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার প্রকাশ। স্ট্রেসবার্গের অভিনেতারা তাঁদের দেহ ও কণ্ঠস্বরকে

সাবলীল ও সহজভাবে ব্যবহার করলেন। এমন দেহভঙ্গি ব্যবহার করলেন যা ভাবপ্রকাশক, কিন্তু সাধারণ্যে পরিচিত। এমন স্বরভঙ্গি ব্যবহার করলেন যা স্বাভাবিক। এমন লয়, মূর্ছনা, উত্থান-পতন ব্যবহার করলেন যা লৌকিক বাক্ধারায় সিক্ত। স্ট্রেসবার্গের 'রিলাক্সেশন টেকনিক'-এর ফলেই এটি সম্ভব হয়েছিল। আত্মসচেতনতা ও অহেতুক টেনশন থেকে মুক্ত হয়ে অভিনেতাবা সাধারণ জীবনের আচার-আচরণকে স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন।

স্ট্রেসবার্গ বললেন, 'যে কোনও প্রাণবন্ত থিয়েটারের পক্ষে অভিনেতার প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি অভিনেতার অভ্যাসের জন্য নির্দিষ্ট ৮টি অপরিহার্য ও অত্যাবশ্যক অনুশীলনী বেঁধে দিলেন।

অনুশীলনী ১ : অ্যানালিটিক্যাল মেমারি

স্ট্রেসবার্গ বললেন, 'থিয়েটারের অনেকটাই কাল্পনিক সৃষ্টি। তার কাহিনি কাল্পনিক। চরিত্ররা কাল্পনিক। সংলাপ কাল্পনিক। তাই অভিনেতার অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব হচ্ছে মনের মধ্যে কাল্পনিক বাস্তবকে এমন প্রগাঢ়ভাবে সৃষ্টি ও পালন করা যাতে তা তাকে আসল প্রতিক্রিয়ায় প্ররোচিত করতে পারে।' এর জন্য তিনি প্রশিক্ষণে ও মহড়ায় দীর্ঘ ও বিচিত্ররকম ইম্প্রোভাইজেশনের মাধ্যমে নাট্যচরিত্রেব আন্তর-জীবনের নানা পরিস্থিতি নিয়ে কাল্পনিক দৃশ্য তৈরি করতে বললেন। এই 'অ্যানালিটিক্যাল মেমারি'-র অনুশীলন অভিনেতাকে কল্পনার জগতে গভীরভাবে বিজড়িত করতে প্রভূত সাহায্য করেছিল। কাল্পনিক বস্তুর ব্যবহারও শিখিয়েছিল।

অনুশীলনী ২ : রিলাক্সেশন

টেনশন অভিনেতার সবচেয়ে বড় শত্রু। টেনশন থাকলে কেউ চিন্তা বা অনুভব করতে পারে না। তাই স্ট্রেসবার্গ 'রিলাক্সেশন' অনুশীলনীর ওপর বিশেষ জোর দিলেন। শুধুমাত্র স্নায়বিক দৌর্বল্য বা চাপ দূর করার জন্যই তিনি তাঁর রিলাক্সেশন টেকনিককে ব্যবহার করলেন না, অভিনেতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র যে 'আবেগ', তাকে প্রকাশ করতে বা বাড়াতেও সাহায্য করলেন। এইরকম একটি অনুশীলনী হল : অভিনেতাকে একটি শক্ত চেয়ারে বসতে বলা হল। তারপর তাঁকে প্রকাশ করতে বলা হল যে, তিনি ওই চেয়ারটিতে বসে খুবই আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন।

অনুশীলনী ৩ : ইমোশন মেমারি

চরিত্রের আবেগের সঙ্গে অভিনেতার সম্পূর্ণ বোঝাপড়া ও শনাক্তকরণের

বিষয়টিকে স্ট্রেসবার্গ সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিলেন। তিনি অভিনেতাকে তাঁর নিজের জীবনের সম-অভিজ্ঞতার স্মৃতিকে (এমনকি অবচেতনে তাঁর যে যন্ত্রণাদায়ক বা মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার স্মৃতি সমাধিস্থ হয়ে আছে তাকেও) ব্যবহার করতে উৎসাহ দিলেন। স্ট্রেসবার্গ তাঁর 'ইমোশন মেমারি'র তত্ত্বে তিনরকম স্মৃতির কথা বললেন :

১. মানসিক স্মৃতি (একটি ঘটনাকে স্মরণ করা)

২. দৈহিক স্মৃতি (হাঁটা বা জুতোর ফিতে বাঁধার মতো দৈহিক ক্রিয়াকে স্মরণ করা)

৩. অনুভব-সম্বন্ধীয় স্মৃতি। একে স্ট্রেসবার্গ আবার দু'ভাগে ভাগ করলেন : সংবেদন স্মৃতি ও আবেগ স্মৃতি। প্রথমটির অনুশীলন হয় কাল্পনিক বস্তু নাড়াচাড়া কবে। দ্বিতীয়টির অনুশীলন হয় অতীতের ব্যক্তিগত আবেগকে অভিনয়ের কাজে লাগিয়ে। 'ইমোশন মেমারি'র সাহায্যে এটি করতে হয়।

পদ্ধতিটি এইরকম : প্রথমে অতীত জীবনের একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা বেছে নিতে হবে। তারপর ঘটনার খুঁটিনাটি স্মরণ করে বলার চেষ্টা করতে হবে। সাংবাদিক বা গল্প-বলিয়ের মতো বিবৃতি দিলে হবে না। এমনভাবে বলতে হবে যাতে মনে হয় ঘটনাটি এইমাত্র তাঁর সামনে ঘটছে। ঘটনা কীভাবে ঘটেছিল, কীভাবে তা দেখা গিয়েছিল, কীভাবে তার শব্দ শোনা গিয়েছিল, কী অনুভূতি হয়েছিল— এসব স্মরণ করলেই পূর্ব-অভিজ্ঞতার সঙ্গো জড়িত আবেগ অভিনেতার কাছে ফিরে আসবে। এইরকমভাবে কষ্ট, ক্রোধ, অসুস্থতা, ভয়, আতঙ্ক, উত্তেজনা, অভিযান, আনন্দ ইত্যাদি নানারকমের আবেগের পুনঃস্মরণের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে।

স্ট্রেসবার্গ চাইলেন, এই স্মৃতি যেন অন্তত সাত বছরের পুরোনো হয়। স্মৃতি শুধু 'তথ্য' হিসেবে পুনঃস্মরণীয় হবে না, 'অভিজ্ঞতা' হিসেবে হবে। যেমন হবে না : 'তখন বেশ ঠাণ্ডা'। পরিবর্তে হবে : 'আমার হাত দুটি ঠাণ্ডায় জমে গেছে'। প্রশিক্ষণের সময় অভিনেতা ছয় থেকে দশটি আবেগ জাগানোর অভ্যাস করবেন যাতে তিনি অভিনয়ের সময় অনায়াসে সেগুলিকে পুনঃস্মরণ করতে পারেন। স্ট্রেসবার্গের মতে, ঠিকমতো অভ্যাস করলে এক মিনিটের মধ্যে এগুলিকে পুনঃস্মরণ করা যাবে। এই অভ্যাসের ফলে নাটকের যেসব দৃশ্যে তিনি শক্তিশালী আবেগের প্রয়োজন বোধ করবেন, সেইসব দৃশ্যে তিনি তাঁর নিজস্ব আবেগকে প্রতিস্থাপিত করতে পারবেন। কিছুদিন পর অভিনেতা এতটাই শর্তসাপেক্ষ হয়ে যাবেন যে তিনি প্রায় সবরকম আবেগ অনুভব করতে পারবেন। নিজের জন্য নতুন প্রতিবর্ত ক্রিয়াও তৈরি করে ফেলবেন। নিজের মানসিক, দৈহিক ও ভাবময়

অনুভূতিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। এমনকি তাদের মেশাতেও পারবেন।

যদিও স্তানিস্লাভস্কির অভিনয়তত্ত্ব থেকে এই প্রক্রিয়াটি নেওয়া হয়েছে, তথাপি 'ইমোশন মেমারি'র অনুশীলনী স্ট্রেসবার্গের নিজস্ব সৃষ্টি। বলা যায়, স্তানিস্লাভস্কির শিক্ষকতার ঈষৎ পরিবর্তন। বলিস্লাভস্কির 'অ্যাকটিং : দ্য সিক্স লেসন' বইতে এ পদ্ধতির বিশদ ব্যাখ্যা আছে।

অনুশীলনী ৪ : আনলকিং ইমোশন

'রিলাক্সেশন' অনুশীলনে টেনশনমুক্ত হয়ে আবেগের প্রকাশ ঘটে। 'ইমোশন মেমারি'র অনুশীলন আবেগকে উদ্দীপিত করে। কিন্তু অভিনেতা কীভাবে সেই আবেগ দর্শককে জ্ঞাপন করবেন? এই সমস্যার সমাধানে স্ট্রেসবার্গ এক টেকনিক আবিষ্কার করলেন। নাম দিলেন 'আনলকিং ইমোশন'। এর একটি বিখ্যাত অনুশীলনী হল 'সং অ্যান্ড ডান্স : সিংগিং দ্য ওয়ার্ডস'। নৃত্যশিল্পী ও সংগীতশিল্পীর সঙ্গো অনুশীলনটি করতে হয়। এই অনুশীলনী সবাই সকলের দিকে তাকিয়ে অভ্যাস করেন। এই টেকনিকের প্রথম ধাপে সংগীতশিল্পী একটি গান পরিবেশন করেন। সুর বজায় রেখে অভিনেতারা গানটিকে ভেঙে দিয়ে প্রত্যেক অক্ষরকে আলাদা করে নিয়ে তাদের ওপর সমান ওজন ও জোর দিয়ে উচ্চারণ করেন। দ্বিতীয় ধাপে সংগীতশিল্পী আবার গানটি পরিবেশন করেন। কিন্তু এবার সংক্ষেপে। প্রত্যেকটি ধ্বনি পৃথক পৃথকভাবে উচ্চারণ করে করে। নৃত্যশিল্পী এর সঙ্গো জুড়ে দেন স্বতঃস্ফূর্ত নাচের মুভমেন্ট। এইভাবে অনুশীলন করতে করতে অভিনেতার অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী সত্তার মধ্যে এক সামঞ্জস্য এসে যায়। ফলে তিনি সহজেই তাঁর আবেগকে দর্শকের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারেন।

অনুশীলনী ৫ : অ্যানিম্যাল ক্যারেক্টারাইজেশন

স্ট্রেসবার্গের এটি নিজস্ব আবিষ্কার। তিনি লক্ষ করলেন যে মানুষকে পর্যবেক্ষণ করলে অভিনেতা নিজের সঙ্গো অনেক মিল দেখতে পান। আর তাই সেসব দেখাতেও তাঁর সুবিধা হয়। কিন্তু তিনি পশুকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখতে পান তাদের মধ্যে এমন কিছু বিশেষত্ব আছে যা দেখানো তাঁর পক্ষে অসম্ভব। অথচ তাঁকে দেখাতেও হবে। তখন তিনি বাধ্য হয়ে কিছুটা কল্পনার আশ্রয় নেন। তাছাড়া পশুর চলাফেরা ও ছন্দ আয়ত্ত করতে গেলে তাঁকে কিছুটা আবেগও অনুভব করতে হয়। এইভাবে বহিঃপ্রকাশ থেকে আন্তর আবেগ অনুভূত হয়। আরও একধাপ এগিয়ে ভাবলে এই পদ্ধতি মানুষের মধ্যে যে জন্তুর প্রকৃতি

আছে, তা আবিষ্কারের অনুশীলনীটিও হয়ে যায়।

অনুশীলনী ৬ : কালেকটিভ ইম্প্রোভাইজেশন

স্ট্রেসবার্গ বললেন, 'অভিনয় সমবেত শিল্প। একজনের প্রতিক্রিয়া তার সতীর্থের আচরণের ওপর নির্ভর করে। তাই প্রাথমিক প্রশিক্ষণে দলগত অনুশীলন প্রয়োজন।' স্ট্রেসবার্গের মেথডে এর জন্য একটি অনুশীলনী আছে। এটি একটি বনভোজনের দৃশ্য। প্রত্যেকে তাদের সঙ্গে খাদ্য ও ফল নিয়ে এসেছে। বনভোজনের জায়গায় পৌঁছতে গেলে একটি ছোট্ট নদী পার হতে হবে। এই নদী পার হওয়ার সময় অভিনেতা যদি মেঝের ওপর নির্দিষ্ট কয়েকটি স্থান বেছে নেন, সেগুলিকে পা ফেলার ছোট ছোট পাথর হিসেবে ব্যবহার করেন, তার ওপর ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করেন, তাহলে খুব সহজেই 'অ্যাকশন' তৈরি হবে। এই অনুশীলনী আর একটি সহজ সূত্রকে প্রতিষ্ঠা করে। তা হল, মঞ্চে নাট্যচাহিদা অনুযায়ী কোনও আসল বস্তুর দিকে তাকানোর প্রয়োজন হয় না। অন্য কোনও কিছুর দিকে বা কাল্পনিক বস্তুর দিকে তাকালেই যথেষ্ট। জানালা বা উইংসের ফাঁক দিয়ে দূরে আগুন লেগেছে বা আলের ওপর দিয়ে কেউ যাচ্ছে বোঝাতে কাল্পনিক বস্তুর দিকে তাকিয়ে সংলাপ বললেও তা বিশ্বাসযোগ্য হয়। তাতে তার চিন্তা বা অনুভূতিও জাগে।

স্ট্রেসবার্গের আর একটি দলগত অনুশীলনী হল, একদল উদ্বাস্তু ভিসার জন্য চেষ্টা করছে, অথবা একদল কৃষক এক আনন্দোচ্ছল উৎসব পালন করছে, অথবা একদল সৈনিক যুদ্ধে যাচ্ছে। এই অনুশীলনীটি করতে গেলে অভিনেতার পক্ষে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয় ব্যক্তিকে চিহ্নিত করার জন্য একটি বৈশিষ্ট্য আরোপ করা। বাকিটা অনুসন্ধান ও অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সহজ সমন্বয়। যেমন, তারা কারা, তারা কী করছে, তোমার কাছে তারা কী চায়, তুমিই বা তাদের কাছে কী চাও, তুমি কীভাবে সেটি দেবে, তারাই বা কীভাবে সেটি নেবে ইত্যাদি।

সমবেত অনুশীলনীটি আরও নাটকীয় করে তোলা হয় কয়েকটি দৃশ্যায়নের মাধ্যমে। দৃশ্য হল : সমুদ্রের ধারে একদল উদ্বাস্তু অপেক্ষা করছে। তাদের উদ্ধার করবে কোনও এক সমুদ্র জাহাজ। জাহাজটি আসার সময় পার হয়ে গেছে। অনিশ্চয়তা, ভয়, টেনশন, হতাশা, ক্ষোভ জমছে। অবশেষে জাহাজটিকে দূরে দেখা গেল। আনন্দোচ্ছাস, হুড়োহুড়ি, লুটোপুটি, হইচই। জাহাজটি যখন কাছে এগিয়ে আসছে তখন জাহাজের মধ্যে দেখা দিল আগুনের আভাস। তারপর মনে হল ঢেউয়ের আড়ালে জাহাজটি হারিয়ে গেল। আবার দেখা গেল। হঠাৎ জাহাজে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটল। দৃশ্যটির বাকি অংশ অভিনেতাদের কল্পনার ওপর

নির্ভরশীল। এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে ভালো ফল পাওয়া যাবে যদি অভিনেতারা পরিণতির কথা অনুমান না করেন। যদি প্রথমে তাঁরা কে, তাঁদের কী হয়েছে, তাঁরা কোথায় যেতে চান— এসবের ওপর মন দেন। তারপর তাঁরা যদি কিছু ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য বেছে নেন, জাহাজটিকে দেখার চেষ্টা করেন, তার ভিতরে কী হচ্ছে তা বোঝার চেষ্টা করেন তাহলে ভালো হয়। এটি অনেকটা সেই অনুশীলনীর মতো যেখানে একটি টুপিকে কুকুর বলে ধরে নেওয়া হয়, অর্থাৎ অভিনয় করার চেষ্টাই করা হয় না। শুধু জিনিসটি জীবন্ত বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়।

অনুশীলনী ৭ : পিকচারাইজেশন ফ্রম সাউন্ড

হাসপাতাল, যুদ্ধক্ষেত্র, হোটেল, রেলওয়ে স্টেশন, রিহার্সাল, নির্বাচন, ভূমিকম্প, চায়ের দোকান, বিয়েবাড়ি, মিটিং, মিছিল, বাজার, পোস্টঅফিস, কলেজ— এইরকম একটিমাত্র শব্দের ব্যবহার করা হয় অনুশীলনীতে। অভিনেতাকে কয়েক মিনিটের মধ্যে একটি দৃশ্যকল্প তুলে ধরতে হয়। সেই দৃশ্যকল্পে শব্দটি চিত্রময় হয়ে ওঠা চাই।

অনুশীলনী ৮ : ইম্প্রোভাইজেশন

চরিত্র : একজন পুরুষ, একজন নারী। নাট্যমুহূর্ত : নারী ঘরদোর পরিষ্কার করছে। কলিং বেল বাজল। নারী দরজা খুলে দিল।

পুরুষ   তুমি বাড়িতে আছ? আমি কিন্তু তোমাকে বাড়িতে পাব আশা করিনি। তবুও এলাম। তোমাকে আমার জরুরি কিছু কথা বলা দরকার। তুমি কি এখন কিছু করছ? আমার সঙ্গো একটু বাইরে যেতে পারবে? রেস্তোঁরায় বা পার্কে।

বিভিন্ন নাট্যমুহূর্ত তৈরি করে দৃশ্যটি অভিনয় করতে হবে। যেমন ছেলেটি বিয়ের প্রস্তাব দিতে চায়, অথবা ছেলেটির চাকরি চলে গেছে হঠাৎ, অথবা সে আজ চাকরি পেয়েছে, অথবা তার চাকরিতে উন্নতি হয়েছে, অথবা সে আজ জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে, অথবা সে বিদেশে চলে যাচ্ছে দু'বছরের জন্য। এখানে একটি জিনিস ঘটবেই। সংলাপ এক থাকলেও দৃশ্যানুযায়ী তার অর্থ পালটাবে। অন্যদিকে, যেহেতু ঘটনা বিভিন্নগামী হবে, নাট্যমুহূর্ত অনুযায়ী অ্যাকশনও উদ্ভাবন করতে হবে।

১৯৩৪ সালে এই 'মেথড' সম্পর্কে বিতর্কের ঝড় তুললেন আমেরিকান অভিনেত্রী স্টেলা অ্যাডলার (১৯০৩-১৯৯২)। ১৯২০ সালে অ্যাডলার

আমেরিকান ল্যাবরেটরি থিয়েটারে পড়াশোনা করেন। ১৯৩১-এ তিনি গ্রুপ থিয়েটারে যোগদান করেন। ১৯৩৫-এ ক্লিফোর্ড ওডেটসের 'অ্যাওয়েক অ্যান্ড সিং' ও 'প্যারাডাইস লস্ট' নাটক দুটিতে অভিনয় করে বিখ্যাত হন। তিনি প্যারিসে স্তানিস্লাভস্কির সঙ্গো গবেষণার পর আমেরিকায় ফিরে এসে ঘোষণা করেন, স্তানিস্লাভস্কি আগে অভিনয়ে যে 'ইনার টেকনিক'-এর ওপর জোর দিতেন এখন তিনি তা বাতিল করে তার পরিবর্তে নতুন 'এক্সটার্নাল টেকনিক'-এর সুপারিশ করছেন। এই পদ্ধতির নাম 'মেথড অব ফিজিক্যাল অ্যাকশন'। স্ট্রেসবার্গের 'মেথড'-এরও বিরোধিতা করে অ্যাডলার বললেন, 'এই পদ্ধতি বড় বেশি নিজেকে ফোকাস করে।' অ্যাডলার ও স্ট্রেসবার্গ দুই বিবাদীপক্ষ অবলম্বন করে সংঘর্ষে লিপ্ত হলেন। কিন্তু মীমাংসা হল না। স্ট্রেসবার্গ ও তাঁর অনুগামীরা অভিনেতার নিজস্ব ভাবময় সম্পদকে 'ফোকাস' করতে থাকলেন। অন্যদিকে অ্যাডলার ঠিক তার উলটোদিকে মনোযোগ দিলেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৯-এ তিনি 'স্টেলা অ্যাডলার কনজারভেটরি' প্রতিষ্ঠা করে সেখানকার শিক্ষিকা হলেন। তিনি তাঁর ছাত্রদের নিজেদের ফোকাস করতে বারণ করলেন। তিনি তাঁদের নাটকের পরিস্থিতি পরীক্ষা করে তাঁদের নিজেদের অভিজ্ঞতাকে ছাপিয়ে যাওয়াব পরামর্শ দিলেন।

॥ ২॥

দ্বিতীয় 'গ্রুপ থিয়েটার' আন্দোলন হয় আয়াবল্যান্ডের বেলফাস্টে। তিনটি অপেশাদার আইরিশ নাট্যদল চল্লিশের দশকে একত্রিত হয়ে উলস্টার গ্রুপ থিয়েটার নামে একটি নাট্যদল গঠন করে। এরা যেমন শেরিডন, ইবসেন, চেকভ এবং ওডেটসের নাটক মঞ্চস্থ করে, তেমনই উত্তর আয়ারল্যান্ডের নাট্যকার আরভিন, শিয়েলস ও জেমস টোমেলটির 'দ্য এন্ড হাউস' (১৯৪৪) এবং 'অল সোলস নাইট' (১৯৪৯) নাটকও অভিনয় করে। নাট্য-উপস্থাপনায় এই দল খুবই উঁচু মানে পৌঁছেছিল। এদের বিখ্যাত প্রযোজনার মধ্যে আছে স্যাম থমসনের 'ওভার দ্য ব্রিজ' এবং স্টুয়ার্ট পার্কারের 'দ্য র‍্যানডি ড্যানডি' (১৯৬০)। এই দলটি পেট্রিক ম্যাগি, জে. জি. ডেভলিন, স্টিফেন বয়েড, কলিন ব্লেকলি, জেমস এলিস প্রমুখ বিশিষ্ট অভিনেতাকে উপহার দিয়েছে। ১৯৬০-এ দলটি উঠে যায়।

॥ ৩॥

তৃতীয় 'গ্রুপ থিয়েটার' আন্দোলন হয় লন্ডনে। ১৯৩৩ এ ওয়েস্ট মিনিস্টার

থিয়েটারে' পরীক্ষামূলক ও সমাজমনস্ক নাটক করার জন্য রুপার্ট ডুনে, ওরমেরোড গ্রিনউড, হাগ অডেন ও টাইরন গুথরি এই বেসরকারি দলটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই দলটি যেমন কাব্যনাটক মঞ্চস্থ করে, তেমনই 'ওয়ার্কশপ থিয়েটার মুভমেন্ট'-এর মতো সামাজিক আদর্শ নিয়েও নাটক করে। এই দলের প্রথম সফল প্রযোজনা হেনরি মেডওয়েলের 'ফালজেনস অ্যান্ড লুক্রিসি'। এদের অন্যান্য প্রযোজনা : টি. এস. এলিয়টের 'সুইনি অ্যাগনিস্টস' (১৯৩৫) ও 'দ্য রক', ডব্লু. এইচ. অডেনের 'দ্য ডান্স অব ডেথ', ক্রিস্টোফার ইশারউডের 'দ্য ডগ বিনিথ দ্য স্কিন' (১৯৩৬), 'দ্য অ্যাসসেন্ট অব এফ সিক্স' (১৯৩৭) এবং 'অন দ্য ফ্রন্টিয়ার' (১৯৩৮), স্টিফেন স্পেনডারের 'দ্য ট্রায়াল অব আ জাজ' (১৯৩৮)। এই দলটি ১৯৫০ ও ১৯৫৪ সালের মধ্যে সার্ত্রের 'দ্য ফ্লাইজ' (১৯৫১) নাটকটি বহুবার অভিনয় করে।

এই দলের সবচেয়ে প্রতিভাবান দুই মানুষ হলেন নাট্য-পরিচালক টাইরন গুথরি ও নাট্যকার হাগ অডেন। অ্যাংলো-আইরিশ পরিচালক টাইরন গুথরি (১৯৩০-১৯৭১) ১৯৩০ সাল থেকে ব্রিটেন, আমেরিকা ও কানাডায় সৃজনশীল পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সাহসী ও জনপ্রিয় আন্তর্জাতিক পরিচালক হিসেবে পরিচিত হন। তাঁর পরিচালনায় শেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' ও 'হেনরি ফাইভ' নাটকে প্রবাদপ্রতিম অভিনেতা স্যার লরেন্স অলিভিয়ার ও অ্যালেক গিনিস অভিনয় করেন। ১৯৬৩-তে তাঁর নামে আমেরিকায় মেনিয়াপোলিসে 'গুথরি থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা হয়। এখানে তাঁর প্রবর্তিত 'থ্রাস্ট স্টেজ' ব্রিটেনে এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিল যে লন্ডনের বহু পুরোনো নাটমঞ্চ সংস্কার করে থ্রাস্ট স্টেজে রূপান্তর করা হয়েছিল। গুথরির এই থ্রাস্ট স্টেজের স্থাপত্য-কৌশল অভিনেতা ও দর্শকদের মধ্যে এক নিকট সম্পর্ক গড়ে তোলে। নাটকের মধ্যে আবর্তিত জনতার দৃশ্য প্রবর্তন করেও গুথরি প্রচুর প্রশংসা পেয়েছেন। গুথরি বলেছেন, 'প্রতিটি মহড়াকে পরিচালকের এমন আনন্দদায়ক করে তোলা উচিত, যাতে অভিনেতারা পরবর্তী মহড়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকেন।' লরেন্স অলিভিয়ার গুথরি সম্পর্কে বলেছেন, 'আমি ওনার কাছ থেকে যে অনন্য শিক্ষা পেয়েছি তা আমি কারুর কাছ থেকে পাইনি।' গুথরি 'থিয়েটার প্রসপেক্ট' (১৯৩২), 'আ লাইফ ইন দ্য থিয়েটার' (১৯৬০) এবং 'টাইরন গুথরি অন অ্যাকটিং' (১৯৭১) নামে তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ১৯৬১-তে 'নাইট' উপাধি পান।

ব্রিটিশ কবি ও নাট্যকার হাগ অডেনের (১৯০৭-১৯৭৩) প্রথম মার্ক্সবাদী চিন্তাধারার নাটক 'দ্য ডান্স অব ডেথ' (১৯৩৫)। তাঁর অন্যান্য নাটক : 'দ্য ডগ বিনিথ দ্য স্কিন' (১৯৩৫), 'দ্য অ্যাসসেন্ট অব এফ সিক্স' (১৯৩৬) এবং 'অন

দ্য ফ্রন্টিয়ার' (১৯৩৮)। তাঁর এই রাজনৈতিক রূপকথাগুলির মধ্যে ছিল প্রতীকের ব্যবহার, ব্রেশটের এপিক টেকনিক এবং বিদ্রূপাত্মক বহুশৈলীর মিশ্রণ। ১৯৩০-এর দশকে এগুলি খুবই শক্তিশালী ইংরাজি নাটক।

অডেন তাঁর আধুনিক মরালিটি প্লে 'দ্য এজ অব অ্যাংজাইটি' (১৯৪৭) নাটকের জন্য পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি আর্নেস্ট টলার, ব্রেশট ও ককতো অনুবাদ করে 'অপেরা লিবেরেটস' বলে পরিচিত হন।

নিউ ইয়র্ক, বেলফাস্ট ও লন্ডনে ১৯৩১ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত যে 'গ্রুপ থিয়েটার' আন্দোলন হয়েছিল, তার আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে ষাটের দশক থেকে পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশে অনেক নাট্যদল এই ভাবধারায় সিক্ত হয়েছে। তারকাপ্রথা বাতিল করে সমবেত সৃষ্টি, সাংগঠনিক ও শৈল্পিক সমস্যার দলগত মোকাবিলা, বাণিজ্যিক থিয়েটারের গতানুগতিকতা ও সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন চিন্তায় নিজেদের মতাদর্শানুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণামূলক নাট্যকর্ম করা, উচ্চমানের প্রযোজনা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অভিনয়ের অনুশীলন ও প্রয়োগ, বামপন্থী চিন্তাধারার প্রতিফলন, প্রতিভাধর পরিচালক, নাট্যশিক্ষক ও অভিনেতার আবির্ভাব--এইসব বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড ও ফলশ্রুতির মধ্য দিয়ে 'গ্রুপ থিয়েটার' আন্দোলন থিয়েটারেব ইতিহাসে এক নতুন চেতনার বীজ বপন করেছে। পুরোনো জীর্ণ পোশাক ছেড়ে, নিজেকে ভেঙেচুরে-বদলিয়ে, এক নতুন রূপে, নতুন সাজে, থিয়েটার আত্মপ্রকাশ করেছে।

লা কমিউন থিয়েটার

- 'ফো নোবেল প্রাইজ পেলেন নাট্যকার হিসেবে তাঁর অনন্য লিখনভঙ্গির জন্য, যা তাঁকে তুলনীয় করে তুলেছে মধ্যযুগের সেইসব শ্লেষাত্মক লেখকদের সঙ্গে, যাঁরা একদিন সমাজের হর্তাকর্তাদের চুরমার করে দিয়েছেন বিদ্রূপে-সমালোচনায়, অন্যদিকে তুলে ধরেছেন অত্যাচারিত ও অবহেলিতদের। মধ্যযুগীয় সাহিত্যের সততা, তীব্রতা এবং বাণিজ্যবিমুখ বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে দারিও ফো-র সাহিত্যকে তুলনা করেই এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।' —*সুইডিস আকাদেমি*
- 'এই নাটকের লক্ষ্য হল, ক্রমাগত এই কথাটা বলে যাওয়া যে, রাষ্ট্রীয় হত্যা এইভাবেই চলতে থাকবে এবং যারা এই চক্রের নায়ক তাদের চরিত্র অপরিবর্তিত থাকবে।' — *দারিও ফো*
- 'যদি ক্রোধ থেকে হাস্যরসের উদ্ভবকে শিল্প বলা হয়, তবে দারিও ফো এক মহান শিল্পী। তিনি কৌতুক ও প্রহসনের প্রবল ঢেউয়ে ইলিউশনকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন।' — *শিয়েরা ভ্যালেন্তিনি*
- 'স্তানিস্লাভস্কি বলেছেন যখন কোনও অভিনেতা অভিনয় করবেন তখন তাঁকে এমনভাবে কাজটা করতে হবে যাতে দর্শকরা অত্যন্ত মনোযোগী হয়ে তাঁর কথা শোনেন। যেন ঘটনাচক্রে দর্শকরা এখানে এসে পড়েছেন। অভিনেতাকে দর্শকদের এমন এক মনোজগতে প্রবেশ করতে হবে যে পরিবেশ বা জগৎ সেই মুহূর্তে প্রেক্ষাগৃহে নেই, নাটকীয় সংঘাতের কথা দর্শককে ভুলিয়ে দিয়ে বরং মনে করাতে হবে যে তাঁরা কারোর মুখে একটা গল্প শুনছেন অথবা একটা নাটক। এটা স্তানিস্লাভস্কির মূল উপপাদ্য বিষয়। আর এটাই ইতিহাসে সবচেয়ে খারাপ, প্রতিক্রিয়াশীল, রক্ষণশীল বুর্জোয়াদের অবস্থান।'

  —*দারিও ফো*

॥ ১॥

১৯৫৩ সালে ইতালিয়ান নাট্যকার-অভিনেতা-পরিচালক দারিও ফো (১৯২৬-) ও তাঁর স্ত্রী ফ্রাঙ্কা রামে একটি অপেশাদার ক্যাবারে নাট্যদলে অভিনয়-জীবন শুরু করেন। ১৯৫৭-তে তাঁরা 'লা কোম্পানিয়া দারিও ফো-ফ্রাঙ্কা' নামে একটি নাট্যদল গঠন করেন। এই নাট্যদলের জন্য দারিও ফো তিনটি প্রহসন নাটক লেখেন : 'অ্যারকোনজেলস ডোন্ট প্লে দ্য পিন টেবিলস' (১৯৫৯), 'স্টিলিং আ ফুট মেকস ইউ লাকি ইন লাভ' (১৯৬১) ও 'সেভেন্থ : দাউ শ্যালট স্টিল আ লিটল লেস' (১৯৬৪)। যদিও ফো-র এই প্রহসনগুলিতে কিছুমাত্রায় রাজনৈতিক বিষয় ছিল, সেগুলি মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিনোদনের কথা মাথায় রেখেই লেখা হয়েছিল।

১৯৬০-এর পর থেকেই ফো ইতালির ফ্যাসিস্ট সরকারের সমালোচনা করে রাজনৈতিক নাটক লিখতে শুরু করেন। ১৯৬৮-তে ভিয়েতনামের যুদ্ধ, চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব এবং ফ্রান্স ও ইতালির কিছু রাজনৈতিক ঘটনার প্রতিবাদে তিনি শামিল হলেন। ঠিক এই সময় থেকে ফো বাণিজ্যিক থিয়েটার থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত করে তৎকালীন নাটকের মূলস্রোত থেকে সরে এলেন। 'লা কোম্পানিয়া দারিও ফো-ফ্রাঙ্কা' দলটি ভেঙে দিলেন। তাঁর ভাষায়, 'বুর্জোয়া ভাঁড়ের' ভূমিকা ত্যাগ করে তিনি নিজের যাবতীয় সৃজনক্ষমতা ও পেশাদারি দক্ষতা ইতালীয় সমাজে মৌল পরিবর্তন আনার জন্য ব্যবহার করলেন। তিনি ১৯৬৮-তে ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির পৃষ্ঠপোষকতায় 'ন্যুভা সিনা' (নতুন মঞ্চ) নামে একটি নাট্যদল গঠন করলেন। এই দলটিকে নিয়ে বিভিন্ন কলকারখানার শ্রমিকদের মধ্যে, ক্লাব ও প্রেক্ষাগৃহে, সাধারণ মানুষদের সামনে রাজনৈতিক নাটক করতে লাগলেন। এই সময়ে তিনি দুটি বিখ্যাত নাটক লিখলেন। ইতালির ফ্যাসিস্ট রাজনীতি নিয়ে বিদ্রূপাত্মক নাটক : 'দ্য গ্রেট প্যান্টোমাইম' (১৯৬৮) ও ঈশ্বর নিন্দায় মুখর নাটক : 'মিস্তেরো বুফে' (১৯৬৯)। প্রথম নাটকটি তাঁর অসাধারণ মূকাভিনয়ে সমৃদ্ধ। দ্বিতীয় নাটকটি ইউরোপের বহু জায়গায় অভিনীত হয়। ১৯৭৭-এ এটি ইতালির টেলিভিশনে দেখানো হয়। কিন্তু ফো-র এই সমালোচনামূলক ব্যঙ্গাত্মক নাটকগুলি ইতালির রক্ষণশীল কমিউনিস্ট দলকে ক্রুদ্ধ করল। অবস্থা এমনই দাঁড়াল যে, ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির আমলাতন্ত্র ও শোধনবাদী লাইন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে ফো-র তীব্র সমালোচনায় উত্যক্ত হয়ে পার্টি 'ন্যুভা সিনা'র স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নিল ও তাঁর সমস্ত অভিনয় বয়কট করার ডাক দিল। দীর্ঘ বিতর্ক ও সংঘাতের পর দারিও ফো ও ফ্রাঙ্কা রামে 'ন্যুভা সিনা'র সঙ্গো সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। রক্ষণশীল

বামপন্থীদেরও ত্যাগ করলেন। তবে তাঁরা কোনও বুর্জোয়া তাঁবুতে নিরাপদ আশ্রয় নিলেন না। সত্যার্থে মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে খুঁজতে থাকলেন মানুষের স্বাধীনতার পথ।

১৯৭০-এ মিলানে দারিও ফো ও ফ্রাঙ্কা রামে 'লা কমিউন' নামে বামপন্থী রাজনীতির প্রতি সহানুভূতিশীল একটি নতুন নাট্যদল তৈরি করলেন। এই নাট্যদল অনেক বেশি আক্রমণাত্মক ও বৈপ্লবিক প্রযোজনা করল। সমকালীন রাজনৈতিক বিষয় ও সমস্যাকে নাটকে প্রাধান্য দিল। বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক সরকারের দুর্নীতি, শোষণ ও অযোগ্যতাকে প্রকাশ করে দিল। ফো-র এই নতুন কাজ ১৯৭০ সালেব শেষের দিকে ও আশির দশকে সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ল। এই সময়েই দারিও ফো-র কাছ থেকে পাই কয়েকটি বিখ্যাত নাটক : 'অ্যাকসিডেন্টাল ডেথ অব অ্যান অ্যানার্কিস্ট' (১৯৭০), 'কান্ট পে? ওন্ট পে' (১৯৭৪), 'ট্রামপেটস অব র‍্যাসবেরিজ' (১৯৮১), 'ফিমেল পার্টস' (১৯৮১)। শেষোক্ত নাটকটি ফ্রাঙ্কা রামের সঙ্গে যৌথভাবে লেখা। তাঁর নাটকগুলি এতই জনপ্রিয়তালাভে সমর্থ হয়েছে যে, বিশ্বের প্রায় ১০০টি ভাষায় সেগুলি অনূদিত ও অভিনীত হয়েছে।

॥ ২॥

পরিকল্পিত সন্ত্রাসের পিছনে শাসক শ্রেণীর রাজনৈতিক অভিসন্ধিকে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্যই 'অ্যাকসিডেন্টাল ডেথ অব অ্যান অ্যানার্কিস্ট' নাটকটি লেখেন দারিও ফো। ১৯৬৯ সালে পুলিসের হেফাজতে উগ্র-বিপ্লবী জিউসেপ্পি পিনেল্লির হত্যা এবং মিলান শহরে উপর্যুপরি বোমা বিস্ফোরণের সন্ত্রাসবাদী ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশদ তথ্যের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে এই তথ্যমূলক নাটক। ইতালীয় ভাষায় এই নাটক দারিও ফো-র পরিচালনায় অভিনীত হয় ১৯৭৩-এ।

ইংরাজি নাটকটি প্রযোজিত হয় ১৯৮০-তে। অনুবাদক গাভিন রিচার্ডস। ইংরাজি অনুবাদে ইংল্যান্ডের কিছু কিছু ঘটনাও নাটকের তথ্যের মধ্যে ঢুকে যায়। দারিও ফো-র নিজেরই প্রযোজনায় এই নাটকের আছে ছ'টি পাঠ। সময়ের পরিবর্তনে তথ্যের পরিবর্তন ঘটেছে। যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই নাটক তা হল, একজন উগ্র-বিপ্লবী রেলওয়ে কর্মী একটি কৃষিব্যাঙ্কে মারাত্মক বোমা রাখার অপরাধে ধরা পড়ে। পুলিসের জিজ্ঞাসাবাদের সময় সে চারতলার জানালা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। এটাই সরকারি বিবৃতি। দারিও ফো বলেছেন, এই নাটকের লক্ষ্য হল 'ক্রমাগত এই কথাটা বলে যাওয়া যে, রাষ্ট্রীয় হত্যা এইভাবেই

চলতে থাকবে এবং যারা এই চক্রের নায়ক তাদের চরিত্র অপরিবর্তিত থাকবে।' এই কারণেই এই নাটকটি ইংল্যান্ডে রাষ্ট্রীয় শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের হাতিয়ার হয়েছিল। এই কারণেই এই নাটকটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে বিভিন্ন দেশে অভিনীত হয়েছে।

কলকাতার 'নান্দীপট' নাট্যসংস্থাও 'মৃত্যু না হত্যা' নামে বিভাস চক্রবর্তীর পরিচালনায় নাটকটির শতাধিক রজনী অভিনয় করেছেন।

নাটকটির বিশেষত্ব হল, ফো এই ভয়াবহ ও মর্মান্তিক বিষয়টি সাজিয়েছেন একটি আদ্যন্ত প্রহসন হিসেবে। নাটকটি দেখতে বসে দর্শক বিচিত্র কাণ্ড-কারখানা দেখে হাসিতে ফেটে পড়েন। কিন্তু একই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস এবং অপরাধের প্রকৃত চেহারা দেখে তাঁদের মনে জমা হয় ঘৃণা এবং ক্রোধ। তাঁরা উত্তেজিত ও উদ্বেলিত হয়ে ওঠেন, চোয়াল শক্ত হয়ে যায়।

'কান্ট পে? ওন্ট পে' একটি প্রহসন নাটিকা। ঘটনাসূত্র : অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে বাজারে অবস্থান ধর্মঘট চলছে। স্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত— 'বেশি দাম দেওয়ার ক্ষমতা নেই। বেশি দাম দেব না'। পুলিস বিক্ষোভকারীদের তাড়াচ্ছে। এই সময় আদর্শবাদী শ্রমিক জিওভেন্নির স্ত্রী আন্তোনিয়া একটি দোকান থেকে গোপনে সস্তায় লুঠ হওয়া 'টিন ফুড' কেনে। বাড়িতে এসে স্বামীকে খাবার দিতে গিয়েই বিপত্তি হয় :

জিওভেন্নি (বাইরে থেকে আসে) খুব খিদে পেয়েছে। খাবার আনো।

আন্তোনিয়া (একটা টিন ফুট এনে টেবিলে রাখে)

জিওভেন্নি (ভালো করে টিনটা পরীক্ষা করে দেখে) এটা কীসের টিন?

আন্তোনিয়া খাবার আছে এতে।

জিওভেন্নি আমি খাব না।

আন্তোনিয়া কেন? দামি খাবার।

জিওভেন্নি দামি হতে পারে। কিন্তু মানুষের খাবার নয় এটা। টিনের গায়ে লেখা আছে 'কুকুরের খাবার'।

আন্তোনিয়া অ্যাঁ। ওঃ হো, ভুল হয়ে গেছে (আর একটা টিন ফুড এনে দেয় তাড়াতাড়ি)

জিওভেন্নি (টিনটা হাতে নিয়ে পড়ে) 'পাখির খাবার'।

আন্তোনিয়া অ্যাঁ। 'পাখির খাবার'! আবার ভুল করেছি। তাড়াহুড়ো করলে এইরকমই হয়। (আর একটা টিন ফুড এনে টেবিলের ওপর রাখে)

জিওভেন্নি (টিনটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। তারপর রেগে গিয়ে বলে) এটা খরগোশের খাবার। খিদের সময় এসব কী ঠাট্টা করছ!

এই হল ফো-র রচনাশৈলী। এইভাবেই তিনি ভয়াবহ পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে সুচতুর অথচ শিল্পসুষমামণ্ডিত প্রহসন তৈরি করেন। এই শৈলীতে তিনি ব্যাপকতর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটকে উপস্থিত করেন।

॥ ৩॥

১৯৯৭-এ দারিও ফো সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। সুইডিশ আকাদেমি জানাচ্ছে, 'ফো নোবেল প্রাইজ পেলেন নাট্যকার হিসেবে তাঁর অনন্য লিখনভঙ্গির জন্য, যা তাঁকে তুলনীয় করে তুলেছে মধ্যযুগের সেইসব শ্লেষাত্মক লেখকদের সঙ্গে, যাঁরা একদিকে সমাজের হর্তাকর্তাদের চুরমার করে দিয়েছেন বিদ্রূপে-সমালোচনায়, অন্যদিকে তুলে ধরেছেন অত্যাচারিত ও অবহেলিতদের। মধ্যযুগীয় সাহিত্যের সততা, তীব্রতা এবং বাণিজ্যবিমুখ বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে দারিও ফো-র সাহিত্যকে তুলনা করেই এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।'

ইতালীয় এই নাট্যকারের বিশেষ এই লিখনভঙ্গি স্বদেশের নাট্যভূমিতে সৃজিত শতকে উদ্ভূত 'কমেদিয়া দেল আর্তে' নাট্যধারা থেকে আহৃত। 'কমেদিয়া দেল আর্তে' একটি ইতালীয় শব্দ। ইংরাজিতে এই শব্দটির অনুবাদ হয়েছে 'কমেডি অব দ্য প্রফেশন'। বাংলায় এর আক্ষরিক অর্থ করলে দাঁড়ায় 'পেশাদার কমেডি'। এই নাট্যদলের অভিনেতারা পেশাদারি প্রশিক্ষণ নিতেন। 'কমেদিয়া দেল আর্তে'-র আরও অনেক নাম আছে। যেমন 'সোগ্গেট্টো'। এই নামকরণের কারণ, এই নাট্য পূর্ব-পরিকল্পিত কোনও সংক্ষিপ্ত ঘটনার বিবরণ বা চিত্রনাট্য অনুযায়ী অভিনীত হয়। এর আর একটি নাম 'অল ইম্প্রোভিসো'। এই নামের অর্থ, এই নাট্যদলের অভিনেতারা মঞ্চে গিয়ে তাৎক্ষণিক সংলাপ তৈরি করেন। তৃতীয় নাম 'ডেই জ্যান্নি', যার অর্থ হাস্যকৌতুক করে এমন এক ভৃত্য। চতুর্থ নাম 'ডেই ম্যাসচেরি', কারণ বেশিরভাগ অভিনেতাই মুখোশ ব্যবহার করেন। পঞ্চম নাম 'অল ইতালিয়ানা', যেহেতু এর ঘরানা হল ইতালীয়।

ইতালিতে ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতকের শুরু পর্যন্ত এই নাট্যধারা বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। কমেডিয়া দেল আর্তের প্রথম নাট্যদলের নাম 'জিলোসি' (১৫৬৮)। পরে ৫০ বছরে 'দেশোসি', 'কনফিদেনি', 'অ্যাকসেসি', 'ফেদেলি' ইত্যাদি নাট্যদল তৈরি হয়। সব দলই ছিল ভ্রাম্যমাণ। সব দলেই সাধারণত থাকত ৭ জন পুরুষ ও ৩ জন নারী। দলগুলি ইতালির বিভিন্ন প্রান্তে অভিনয় করা ছাড়াও ফ্রান্স, স্পেন, পূর্ব ইউরোপ, জার্মানি ও ইংল্যান্ডে ভ্রমণ করত। এঁদের নিজস্ব স্থায়ী রঙ্গালয় ছিল না। কখনও রাস্তায় বা মাঠে, কখনও বাজার বা সরাইখানার প্রাঙ্গণে অথবা অভিজাত ব্যক্তিবর্গের প্রাসাদে বা

অস্থায়ী পাটাতনের ওপর, আবার কোনও স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে এঁরা অভিনয় করতেন। এই জন্য এঁরা সর্বত্র সহজে বহনযোগ্য ও নির্মাণযোগ্য সামান্য দৃশ্যপট ও উপকরণ নিয়ে ভ্রমণ করতেন। এই নাট্যদলগুলির নাটক, অভিনয়-পদ্ধতি ও কলাকৌশল ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। নাটক বলতে থাকত একটি সংক্ষিপ্ত চিত্রনাট্য বা নাটকের কাঠামো, সেগুলি প্রায় একই ধরনের হত। প্রহসনমূলক হালকা রসের সহজ আনন্দ বিতরণই ছিল এঁদেব উদ্দেশ্য। এঁরা কোনও মহৎ ট্রাজেডি বা কমেডি সৃষ্টি করতে পারেননি। উচ্চাঙ্গ সৃজনের মতো শিক্ষা, মার্জনা বা চেষ্টাও এঁদের ছিল না। এই নাট্যদলগুলির অভিনেতারা সমকালীন সমাজ ও বাস্তব জীবন থেকে বিষয়বস্তু ও চরিত্র সংগ্রহ করে অভিনয় করতেন। সাধারণ মানুষের ভাষা এবং প্রয়োজনে স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করতেন। এর ফলে এঁদের নাটক সাধারণ মানুষের কাছে সহজেই অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

এই নাট্যগোষ্ঠীগুলির অভিনেতাদের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তাঁরা অলিখিত বিষয় নিয়ে মঞ্চে অবতীর্ণ হতেন এবং স্ব-স্ব প্রতিভার দ্বারা নিজেরাই কথোপকথন ও আচার আচরণ সৃষ্টি করে নাট্যাভিনয় করতেন। এই শিল্পীদল এই বিষয়ে এতটাই পারদর্শী ছিলেন যে, যে কোনও সময়ে যে কোনও স্থানে, যে কোনও বিষয়বস্তু অবলম্বনে তাৎক্ষণিক নাট্যাভিনয়েও তাঁরা সক্ষম হতেন। এজন্য তাঁদের প্রয়োজন হত বিষয়বস্তু বা ঘটনার একটি কাঠামোমাত্র। একই চিত্রনাট্যের একই দলের দুটি অভিনয় একইরকম হত না। কারণ প্রতি অভিনয়কালেই অভিনেতারা তাঁদের খুশিমতো কথোপকথন ও ক্রিয়া বানিয়ে নিতেন। তবে তাঁরা যেভাবেই কথাবার্তা চালাতেন না কেন, শেষ পর্যন্ত খুব কৃতকার্যতার সঙ্গেই তাঁরা নাটকটি শেষ করতেন। হাসি, নাচ, গান ও মূকাভিনয়ের সাহায্যে 'পান্তালুন', 'ক্যাপ্তিনো', 'জ্যানি', 'ডজরি' ইত্যাদি 'টাইপ' চরিত্র ফুটিয়ে তুলতেন। এই চরিত্রগুলির জন্য বিশেষ বিশেষ মুখোশ, পোশাক ও উপকরণ থাকত।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে নান্দনিক ও পরিশীলিত থিয়েটারের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই নাট্যধারা ক্রমশ স্তিমিত হতে হতে পিছু হটে যায়। কিন্তু বিশ শতকে 'ন্যাচারিলিজম'-এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ায় টেকনিক্যাল ও আদর্শগত কারণেই এই নাট্যশৈলীকে নতুন করে বরণ করে নিলেন থিয়েটারে মেয়ারহোলদ ও চলচ্চিত্রে আইজেনস্টাইন। মেয়ারহোলদের 'বায়োমেকানিক্স' এই অভিনয় পদ্ধতি থেকেই সৃজিত। ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত 'জাকুইস কোপিয়া স্কুল'-এ অভিনেতার প্রশিক্ষণের জন্য এই অভিনয়-পদ্ধতিই অনুসৃত হয়েছে।

॥ ৪ ॥

দারিও ফো-র নাট্যনির্মাণেও 'কমেদিয়া দেল আর্তে' এক গুরুত্বপূর্ণ প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। উত্তর ইতালির যে অঞ্চলগুলিকে 'কমেদিয়া দেল আর্তে'র সূচনাভূমি হিসেবে চিহ্নিত কবা হয়, তারই এক ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেছিলেন দারিও ফো। তাই তিনি এর শিকড় ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে ভালোভাবে ওয়াকিবহাল। তিনি সচেতনভাবেই দেল আর্তের নাট্যভাষা ও নাট্য-অভ্যাস থেকে আহরিত টেকনিক ব্যবহার করেন। ইতালির মধ্যযুগীয় এই নাট্যরীতির তিনি শুধু পুনরুজ্জীবনই করেন না, তার পুনর্নির্মাণও করেন। আধুনিক পরিস্থিতি ও সমস্যায় তিনি এই টেকনিককে খুব সাফল্যের সঙ্গো প্রয়োগ করেন। এর স্বতঃস্ফূর্ত চরিত্র ও মজাদার নাট্যরীতির সঙ্গো মিশিয়ে দেন সামাজিক ন্যায়-অন্যায়ের প্রতিরূপ।

দেল আর্তের মতো দারিও ফো-এরও বিশ্বাস জন্মেছে যে, প্রথাগত বুর্জোয়া নাট্যকাঠামো তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা প্রতিফলিত করার পক্ষে যথেষ্ট সীমিত। এই রীতি ভাঙা দরকার। তাই তিনি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছনোর তাগিদে প্রথা ভেঙে ছুটে যান কারখানার গেটে, সার্কাসের তাঁবু কিংবা ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে। তাঁর নাটকে যথার্থ গভীর সমস্যা আসে ব্যঙ্গ আর শ্লেষের সংমিশ্রণে। সামাজিক বা রাজনৈতিক তত্ত্ব আসে সাধারণের উপভোগ্য কমেডির হাত ধরে। 'অ্যাকসিডেন্টাল ডেথ অব অ্যান অ্যানার্কিস্ট'-এর মতো সিরিয়াস নাটকেও তাঁর বক্তব্যের সব গাম্ভীর্য বজায় রেখেও উপভোগ ও প্রমোদের উপকরণ ছড়ানো থাকে সর্বত্র। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব বা ভিয়েতনাম যুদ্ধের মতো বড় বড় ঘটনার পাশাপাশি ইতালীয় রেডিওর ওপর সরকারি জুলুম, মিলান শহরে বোমা বিস্ফোরণের দায়ে অভিযুক্ত এক উগ্র-বিপ্লবীর পুলিস হেডকোয়ার্টার্সে মৃত্যু, পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে শ্রমিক আন্দোলন ইত্যাকার স্থানীয় সমস্যা বিষয় হয়ে ওঠে তাঁর নাটকে। 'মিস্তেরো বুফে'র মতো নাটকও তিনি মঞ্চস্থ করেন স্টেডিয়াম, রাস্তায় বা বড় হল ঘরে, অভিনেতাদের কালো পাজামা ও কালো সোয়েটার পড়িয়ে। শুধু তাই নয়, পথে-ঘাটে অভিনয় করে বিপন্ন মানুষকে সাহায্য করেন তিনি। সাহায্যপ্রার্থী দুর্গত মানুষদের ডাকে ছুটে যান ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, সুইডেন, ডেনমার্ক ও ইউরোপের নানা শহরে। সারা ইতালি জুড়ে তিনি সাধারণ মানুষ, শ্রমিক, ধর্মঘটী শ্রমিক, রাজনৈতিক বন্দি এবং তাঁদের পরিবারবর্গের সাহায্যার্থে অর্থসংগ্রহ করেন।

কমেডিয়া দেল আর্তের মতোই দারিও ফো তাঁর নাটককে কখনই অনড়, অপরিবর্তনীয় করে রাখেন না। বরং তিনি পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও

বিভিন্ন দর্শক অনুযায়ী তাঁর নাটক পরিবর্তন করেন। যেমন ১৯৭২-এ জেল হেফাজতে ইন্সপেক্টর ক্যালোব্রেসি জনৈক অ্যানার্কিস্ট জিউসেপ্পি পিলেল্লিকে হত্যা করার পর তিনি 'অ্যাকসিডেন্টাল ডেথ অব অ্যান অ্যানার্কিস্ট' নাটকটি লিখলে ও প্রযোজনা করলেও আদালতে মামলা চলাকালীন নাটকটিতে ক্রমাগত হাল আমলের তথ্যাদি সংযোজিত হতে থাকে এবং প্রতি অভিনয় রজনীতে আদালতের সারাদিনের কার্যবিবরণীর একটি প্রতিবেদন যুক্ত হয়ে যায়। তাঁর 'মিস্তেরো বুফে' নাটকটিও অসংখ্যবার পরিবর্তিত হয়েছে। অসংখ্যবার তার সংস্করণ হয়েছে। এটি যতবার অভিনীত হয়েছে, ততবারই নতুনভাবে সৃষ্ট হয়ে চলেছে। ১৯৬৯ সালে ফো যে পাণ্ডুলিপিটি অভিনয় করেছিলেন, এখন তার এতটাই পবিবর্তন হয়েছে যে, আগেরটিকে আর চেনাই যায় না। নাটকটি যতবারই বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে, বিভিন্ন অভিনেতৃর দ্বারা অভিনীত হয়েছে, ততবারই পালটে পালটে গেছে।

দারিও ফো-র নাট্য-প্রযোজনার আর একটি বৈশিষ্ট্য, তিনি নাটক চলাকালীন যেমন দর্শকদের প্রতিটি প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেন, তেমনই নাটকের শেষে দর্শকদের কাছ থেকে দেশের সার্বিক রাজনৈতিক ও সামাজিক কথা মন দিয়ে শোনেন। পরে নাটকের মধ্যে সেগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করেন। যেহেতু শ্রমিক শ্রেণীর দর্শকই ফো-র মূল লক্ষ্য এবং তিনি শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকাতেই বেশি নাটক করেন, তাই এই প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়াতে তাঁর কোনও অসুবিধাই হয় না। শ্রমিকদের কাছ থেকে তিনি স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্যই পান।

এর জন্য ফো তাঁর নাটকগুলিকে দেল আর্তের ঢঙে এমনভাবে লেখেন যাতে যুগেব পরিবর্তনে বা স্থানের পরিবর্তনে তাদের পরিবর্তন ও সমসাময়িকত্ব দান করা সম্ভব হয়। দর্শকদের সমালোচনা শোনার পর নাটকগুলিতে অনেক কিছু সংযোজন ও বিয়োজন করা যায়। যেহেতু দেল আর্তের মতো নাটকগুলি ইম্প্রোভাইজেশনের ওপর নির্ভরশীল, ফলে দর্শকের অংশগ্রহণও বেশি।

ফো-র লক্ষ্য এমন এক থিয়েটার সৃষ্টি করা যা হবে প্রবন্ধের মতো, বিতর্কের মতো অথবা রাজনৈতিক অ্যাকশনের মতো। অনেকটা খবরের কাগজের মতো— প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই পুড়িয়ে ফেলা যায়।

॥ ৫ ॥

স্তানিস্লাভস্কির অভিনয়-পদ্ধতির অপ্রশংসা করেছেন ফো : 'স্তানিস্লাভস্কি বলেছেন যখন কোনও অভিনেতা অভিনয় করবেন তখন তাঁকে এমনভাবে কাজটা করতে হবে যাতে দর্শকরা অত্যন্ত মনোযোগী হয়ে তার কথা শোনেন। যেন ঘটনাচক্রে

দর্শকরা এখানে এসে পড়েছেন। অভিনেতাকে দর্শকদের এমন এক মনোজগতে প্রবেশ করতে হবে যে পরিবেশ বা জগৎ সেই মুহূর্তে প্রেক্ষাগৃহে নেই, নাটকীয় সংঘাতের কথা দর্শককে ভুলিয়ে দিয়ে বরং মনে করাতে হবে যে তাঁরা কারোর মুখে একটা গল্প শুনছেন অথবা একটা নাটক। এটাই স্তানিস্লাভস্কির মূল উপপাদ্য বিষয়, আর এটাই ইতিহাসে সবচেয়ে খারাপ, প্রতিক্রিয়াশীল, রক্ষণশীল বুর্জোয়াদের অবস্থান।'

ফো অভিনেতার সঙ্গো চরিত্রের সাঙ্গীকরণের স্তানিস্লাভস্কীয় পদ্ধতির বিরুদ্ধে সরব। তাঁর পছন্দ এপিক অভিনয়। প্রসেনিয়ামের 'চতুর্থ দেওয়াল' ভেঙে দর্শকের সঙ্গো সরাসরি সংযোগ স্থাপন। তিনি বলেন, 'সমস্ত পপুলার থিয়েটারই সব সময় এপিক, কারণ এক পরিষ্কার আদর্শবাদী ভিত্তির ওপর তা দাঁড়িয়ে আছে। এই আদর্শের লক্ষ্য হল একটি গোটা সম্প্রদায়ের, সমগ্রের স্বার্থ, সামাজিক স্বার্থ, পরস্পর একত্রে বাঁচার স্বার্থ, সামগ্রিকভাবে উৎপাদনের স্বার্থ এবং ফলভোগ করে নেওয়ার স্বার্থ।'

যে লক্ষ্যে, যে পরিস্থিতি ও যে সময়সীমার মধ্যে থেকে ফো-কে নাটকনির্মাণ ও উপস্থাপন করতে হয়, 'ইম্প্রোভাইজেশন' পদ্ধতি ছাড়া সেই নির্মিতি বা চটজলদি পরিবেশন সম্ভব নয়। আমরা তাঁর তিনটি প্রযোজনার ইতিহাস জানলেই এর সত্যাসত্য অনুধাবন করতে পারব :

১. 'চিলি ('দ্য পিপলস ওয়ার ইন চিলি' প্রথম অভিনয়, অক্টোবর ১৯৭৩) সম্পর্কিত আমাদের নাটকটি আমরা ইম্প্রোভাইজেশন টেকনিকে করে গেছি। এটা এমন এক নাটক যেখানে সমস্ত অভিনেতা একত্রে মঞ্চে আসেন এবং চরিত্রগুলির রূপ দেন এমনভাবে যেন তাঁরা সবাই আপাতভাবে একে অপরের সঙ্গো সম্পর্কহীন— আসলে এটি অভ্যন্তরীণ যোগসূত্র সম্বলিত ধারাবাহিক স্বগতোক্তি। কিন্তু এর মুখ্য উপাদান হল প্ররোচনা।'

২. 'চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একটা নাটক তৈরি করে দেখাতে হবে যে ফ্যাসিস্টরা বিচারের নামে প্রহসন করছে। যেমন হয়েছিল স্যালার্নোতে। সকালবেলায় আমরা গিয়ে দেখে আসতাম কেমনভাবে কী বিচার হল এবং চার ঘণ্টার মধ্যে নাট্যাকারে আমরা সেটা সংগীতসহ উপস্থাপিত করতাম। সেই উপস্থাপনার মধ্যে আমরা গোটা ঘটনাটার সমালোচনা করে তার কিম্ভূতকিমাকৃতি চেহারাটা দেখানোর চেষ্টা করতাম। ঠিক একই জিনিস ঘটেছিল যখন আমরা পেসকারাতে গিয়েছিলাম ৫০ জন কমরেডের সমর্থনে; যারা তখন বিচারাধীন ছিলেন। বিচার শুরু হয়ে

গিয়েছিল, কিন্তু সে সম্পর্কে সেখানকার কেউই কিছু জানতেন না—তাঁদের কিছু জানানোই হয়নি। কাজেই আমরা প্রায় হাজার দুই কি তারও বেশি লোকের সামনে আমাদের নাটক অভিনয় করলাম। এমনকি বাইরে থেকেও লোক এসেছিল। নাটকের মাধ্যমে বিচারের নামে কী হচ্ছিল সেকথা আমরা জনগণকে জানালাম, কতগুলি মুহূর্ত আমরা আবিষ্কার করলাম, সেই সঙ্গে ইম্প্রোভাইজেশন।'

৩. একই ঘটনা ঘটেছিল মেস্ত্রেতে, যেখানে বিচারের প্রহসন চলছিল মার্ঘেরার ঘটনা নিয়ে। আবার আমরা একটা বিচারের মহড়া দিলাম—বিচারক, উকিল, শ্রমিক ও পুলিসকেও আমরা উপস্থিত করলাম, আগামীকাল কী ঘটতে পারে তা দেখালাম। দর্শকদের মধ্যে এমন সব কমরেড ছিলেন যাঁরা পরের দিন বিচারের নামে সরকারের প্রহসন আরও বেশি নাটকীয় ঘটনার মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন। বিচার এবং ফ্যাসিজমের মূল চেহারাটা তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। একইভাবে, আমরা আমাদের ফরাসি কমরেডদের সমর্থনে আরও ডজনখানেক কারখানায় গেলাম। যেমন 'লিপ'। সুইজারল্যান্ডে গেলাম সেখানকার কমরেডদের জন্য, যাঁদের চূড়ান্তভাবে শোষণ করা হচ্ছিল না। সব সময়ই আমরা প্রথমেই যা করেছি তা হল, তাদের কথা আমরা শুনতে চেয়েছি, তারপর সেই কাহিনি নিয়ে ইম্প্রোভাইজেশনের মাধ্যমে কাজ করেছি।'

(১৯৭৪-এর ১৩ জুন ইতালির মিলানে প্যালাজিনো লিবার্টি প্রেক্ষাগৃহে 'লা কমিউন' আয়োজিত এক সাংস্কৃতিক সভায় বার্নার্দো বার্তোলুচি, ইতিযার স্কোলা, মারিও মোনিচেল্লি প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য শিল্পী ও পরিচালকদের উপস্থিতিতে দারিও ফো এক দীর্ঘ ভাষণ দেন। ভাষণটির বঙ্গানুবাদ করেন অশোক চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশিত হয় 'নাট্যচিন্তা' পত্রিকায়। ওপরের উদ্ধৃতি তিনটি তার থেকেই সংকলিত।)

থিয়েটার অব সিচুয়েশন

- 'আজকের যুগে সাহিত্যিক শিল্পীর পক্ষে রাজনীতির দিক থেকে পালিয়ে থাকা বা সরে থাকাও এক ধরনের রাজনৈতিক মনোভাব। লেখক বা যে কেউ বাস্তব জগৎ তথা জাগতিক ব্যাপার সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারেন না। কারণ আজ হোক বা কাল হোক, তিনি এর দ্বারা প্রভাবিত হবেনই। আমার মনে হয়, রাজনীতিই লেখকের প্রথম বিবেচ্য বিষয়।'

  —জাঁ পল সার্ত্র
- 'সাহিত্য ও শিল্পকর্ম চিত্তবিনোদন নয়, এ হল দায়বদ্ধ কর্ম।'

  —জাঁ পল সার্ত্র
- 'মানুষ তার কাজের জন্য সমাজের কাছে দায়বদ্ধ। তাই প্রত্যেক মানুষকে নিজেই নিজের আচরণবিধি সৃষ্টি করে নিতে হবে। নিজে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে হবে। নিজেব কাজের জন্য ও তার পরিণতি বা ফলাফলের জন্য দায়িত্ব নিতে হবে।' *—জাঁ পল সার্ত্র*
- 'এই জগৎ ও জীবন স্ববিরোধে পূর্ণ— অসঙ্গত, অযৌক্তিক ও অর্থহীন। তবু এই অসম্ভাব্য জীবনকে সাহসের সঙ্গে স্বীকার করে আমাদের কর্তব্য করে যেতে হবে।' *—আলবেয়ার কামু*
- 'আন্তরশক্তির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমেই মানুষ আরও শক্তিশালী হবে। নতুন নতুন মূল্যবোধের সৃষ্টি করবে। আন্তরশক্তির অনুশীলনের ফলে আবির্ভাব হবে 'অতিমানব'-এর। এই অতিমানবই হবে মানুষের আদর্শ। জগতের পূর্ণ মানুষ।' —ফ্রিডরিশ নিৎসে

॥ ১ ॥

জার্মান 'একজিস্টেনজফিলোসফি' শব্দটি থেকে ইংরাজি 'একজিস্টেনশিয়ালিজম' (বাংলায় 'অস্তিবাদ') শব্দটির উৎপত্তি। অনেকে বলেন, জার্মান দার্শনিক এডমুন্ড হুসার্লের 'ফেনোমেনোলজি' থেকে 'একজিস্টেনশিয়ালিজম'-এর উদ্ভব।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলায় মানুষ যখন তার 'অস্তিত্ব' নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে, তখন তার মনের ভাবপ্রকাশের জন্য যে দর্শনের প্রয়োজন হয়েছিল, ডেনমার্কের সোরেন কিয়েৰ্কেগার্ডের (১৮১৩-১৮৫৫) রচনায় তার সন্ধান পেলেন দার্শনিকরা। জগতের কাছে পরিচিত হল 'একজিস্টেনশিয়ালিজম' নামে এক আলোড়ন জাগানো দর্শন। প্রথমে জার্মানিতে, পরে ফ্রান্স ও আলজিরিবায় এই দর্শন ছড়িয়ে পড়ল। এই দর্শনের প্রচারক হয়ে এলেন জার্মানির ফ্রিডরিশ নিৎসে (১৮৩৪-১৯০০), কার্ল য়্যাসপার্স (১৮৮৩ ১৯৬৯), মার্টিন হাইডেগার (১৮৮৯-১৯৭৬), ফ্রান্সের গেব্রিয়েল মার্সেল (১৮৮৯-১৯৭২), জাঁ পল সার্ত্র (১৯০৫-১৯৮০), মরিস মার্লো পঁতি (১৯০৭-১৯৬১) এবং আলজিরিয়ার আলবেয়ার কামু (১৯১৩-১৯৬০)।

কিয়েৰ্কেগার্ড কোন নতুন দর্শনের কথা বললেন? সাধারণভাবে দার্শনিকরা মনে করেন, জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব উদ্‌ঘাটন ও বিশ্লেষণ করাই দর্শনের মূল উদ্দেশ্য। তাঁরা বিশ্বাস করেন, মানুষ তার আত্মস্বরূপের সন্ধান পেলেই জাগতিক দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি পাবে। কিয়েৰ্কেগার্ড এর দুটিই মানলেন না। তিনি বললেন, কোনও তত্ত্ব অনুসন্ধান করা জীবনের মূল কাজ হতে পারে না। 'অস্তিত্ব' উপলব্ধি করাই জীবনের বড় সত্য। দর্শন হল ব্যক্তির 'অস্তিত্ব'-র উপলব্ধি ও প্রকাশ। তবে তিনি এও বললেন যে, কোনও সূত্রাকারেই মানবজীবনের 'অস্তিত্ব'-র ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। কোনও মতেই আমরা জানতে পারি না কেন জন্ম: বস্তু কী? সত্তা কী? এক বিরাট অজ্ঞেয়তার মধ্যে আমরা পরিত্যক্ত, নিঃসঙ্গ।

অস্তিত্বের এই অজ্ঞেয়তার ও অনিশ্চয়তার কথা শুনিয়েও একজিস্টেনশিয়ালিস্টরা কিন্তু দুঃখবাদী বা নিরাশাবাদী নন। যেমন সার্ত্র বললেন, অস্তিত্ব আছে বলে দায়িত্বও আছে। তাঁর ভাষায় 'কমিটমেন্ট'। মানুষ তার কাজের জন্য সমাজের কাছে দায়বদ্ধ। তাই প্রত্যেক মানুষকে নিজেই নিজের আচরণবিধি সৃষ্টি করে নিতে হবে। নিজেই নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে হবে। নিজের কাজের জন্য ও তার পরিণতি বা ফলাফলের জন্য দায়িত্ব নিতে হবে।' কামু বললেন, 'এই জগৎ ও জীবন স্ববিরোধে পূর্ণ— অসঙ্গত, অযৌক্তিক ও অর্থহীন। তবু এই অসম্ভাব্য জীবনকে সাহসের সঙ্গে স্বীকার করে আমাদের কর্তব্য করে যেতে হবে।' নিৎসে বললেন, 'আন্তরশক্তির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমেই মানুষ আরও শক্তিশালী হবে। নতুন নতুন মূল্যবোধের সৃষ্টি করবে। আন্তরশক্তির অনুশীলনীর ফলে আবির্ভাব হবে 'অতিমানব'-এর। এই অতিমানবই হবে মানুষের আদর্শ। জগতের পূর্ণ মানুষ।'

'একজিস্টেনশিয়ালিজম'-এর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে রক্তমাংসে গড়া মানুষ ও

তার স্বাধীনতা। স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য যে কোনও মূল্য দিতে মানুষ প্রস্তুত। বস্তুত, 'একজিস্টেনশিয়ালিজম'-এ ব্যক্তি-স্বাধীনতাই নায়ক। ব্যক্তি-স্বাধীনতাই তার সারমর্ম, মূল বিষয়। একক মানুষই তার নিজের সাম্রাজ্যের সম্রাট।

॥ ২॥

সাহিত্যে একজিস্টেনশিয়ালিজমের প্রবক্তা হয়ে এলেন ফিয়োদোব মিখাইলোভিচ দস্তয়েভস্কি (১৮২১-১৮৮১), জাঁ পল সার্ত্র (১৯০৫-১৯৮০), আলবেয়ার কামু (১৯১৩-১৯৬০), আর্নেস্ট হেমিংওয়ে (১৮৯৯-১৯৬১) ও ফ্রানৎজ কাফকা (১৮৮৩-১৯২৪)। এই লেখকরা মানব-অস্তিত্বের সেই মূলসূত্রটি দেখলেন যা সমস্ত বিসদৃশ অবস্থা থেকে মানুষকে সরে আসতে শেখায়, তাদের বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম করতে উদ্বুদ্ধ করে, জীবনকে কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে টিকিয়ে রাখতে প্রেরণা ও উৎসাহ যোগায়।

দস্তয়েভস্কি বললেন, মানুষ নিজেই তার সুখ-দুঃখের স্রষ্টা এবং ভোক্তা। তার যাবতীয় কৃতকর্মের দায়ও তার ওপরেই বর্তায়। তাঁর 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট' উপন্যাসে সোনার লোভে আইনের ছাত্র তরুণ রাসকলনিকফ এক বৃদ্ধা ও তার বোনতে হত্যা করে। কিন্তু কৃতকর্ম গোপন না করে নিজের পাপের কথা সে নিজেই স্বীকার করে। তার কারাবাস হয়। সেখানে সোনিয়ার সান্নিধ্যে তার হৃদয়ের পরিবর্তন হয়। তাঁর 'দ্য ইডিয়ট' উপন্যাসের সব চরিত্রই যুগোচিত সংকটের শিকার। এই উপন্যাসের নায়ক প্রিন্স মিশকিনের মধ্য দিয়ে লেখক নিজের দ্বিধাকে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর কখনও মনে হয়েছে ঈশ্বর আছেন, কখনও মনে হয়েছে ঈশ্বর এক অলীক কল্পনামাত্র। তিনি এই দোলাচল-চিত্তের ফসল।

কামুর 'দ্য প্লেগ', 'দ্য আউটসাইডার', 'দ্য ফল', 'রিবেল' ও 'দ্য মিথ অব সিসিফাস' উপন্যাসে স্পষ্টভাবেই অস্তিত্বের সংকট ও রক্ষার কথা বলা হয়েছে। সমকালীন বিশ্বের রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ফ্যাসিস্ট আগ্রাসন— এসব থেকে মানুষ ও ব্যক্তির বাঁচার যে সমস্যা, 'দ্য প্লেগ'-এ তা স্পষ্ট। 'দ্য আউটসাইডার'-এ তিনি জীবনের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা-সূত্র ধরতে চেষ্টা করেছেন। 'দ্য ফল' ও 'রিবেল' উপন্যাসে আছে সমাজে-মানুষে, মানুষে-মানুষে, রাষ্ট্র-মানুষে স্থায়ী সম্পর্ক-চিত্রের প্রকাশ। 'দ্য মিথ অব সিসিফাস'-এ জীবনের সমস্ত অসঙ্গতি ও অর্থহীনতা সত্ত্বেও সিসিফাস সাহসের সঙ্গে জীবনকে গ্রহণ করেছে।

হেমিংওয়ের 'দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সী' উপন্যাসের বুড়ো নায়কের নৌকা নিয়ে উত্তাল সমুদ্রের বুকে জীবনকে এক কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে টিকিয়ে রাখার প্রয়াস নিখুঁত একজিস্টেনশিয়ালিজমের নিরঙ্কুশ স্বীকৃতি।

কাফকার 'দা ট্রায়াল', 'দ্য ক্যাসন' গ্রন্থ দুটি তাঁর অস্তিবাদী ধ্যান-ধারণার প্রধান পরিচায়ক। তবে এক্সিসটেনসিয়ালিজমের সবচেয়ে বড় প্রচারক ছিলেন সার্ত্র। তিনি তাঁর গল্প-উপন্যাসে অস্তিবাদী দর্শনকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। 'দ্য এজ অব রিজন', 'দ্য রিপ্রিভ', 'আয়রন ইন দ্য সোল' ইত্যাদি উপন্যাসগুলির প্রতিটি চরিত্রকে সার্ত্র অস্তিত্বের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন। চরম সংকটময় মুহূর্তে তারা প্রকৃত স্বাধীনতা ও অস্তিত্বের তাৎপর্য উপলব্ধি করেছে। তাঁর 'নসিয়া' উপন্যাসের নায়ক অর্থহীন অস্তিত্ব ও জগতের মধ্যে মুক্তি খুঁজেছে এক নিগ্রো মহিলার সুরের জগতে, যেখানে রয়েছে স্বাধীনতার অধিকার। 'ইনটিমেসি' গল্পটিতে তিনি বলেছেন, মানব-অস্তিত্ব স্বাধীনতাকে লাভ করতে চায়। 'দ্য ওয়াল' গল্পে তিনি বলেছেন, মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও মানুষ তার স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে চায়।

শিল্পী-সাহিত্যিকদের রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার কথাও সার্ত্র অকপটে তাঁর 'পলিটিক্স অ্যান্ড লিটারেচার' গ্রন্থে বলেছেন, 'আজকের যুগে সাহিত্যিক শিল্পীর পক্ষে রাজনীতির দিক থেকে নিষ্ক্রিয় থাকা সম্ভব নয়। রাজনীতি থেকে পালিয়ে থাকা বা সরে থাকাও এক ধরনের রাজনৈতিক মনোভাব। লেখক বা যে কেউ বাস্তব জগৎ তথা জাগতিক ব্যাপার সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারেন না। কারণ আজ হোক বা কাল হোক, তিনি এর দ্বারা প্রভাবিত হবেনই। আমার মনে হয়, রাজনীতিই লেখকের প্রথম বিবেচ্য বিষয়।' তিনি আরও বলেন, 'সাহিত্য ও শিল্পকর্ম চিত্ত-বিনোদন নয়, এ হল দায়বদ্ধ কর্ম।' তিনি সাহিত্যিক শিল্পীদের জীবনমুখী হতে বলেছেন। অসঙ্গত ও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে বলেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে এই আদর্শেই তিনি অবিচল ছিলেন। নির্দ্বিধায়, স্পষ্ট ভাষায় ও উচ্চকণ্ঠে নিজের মতামত প্রকাশ করতে তিনি কোনও দিনই পিছপা হননি। তিনি বারবার রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়েছেন। কিন্তু জোর দিয়েছেন সততার ওপর, নৈতিকতার ওপর, ব্যক্তি-কণ্ঠস্বরের ওপর। তাই তিনি যেমন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা উগরে দিয়েছেন, তেমনই রুশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ফরাসি সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকেও নিন্দা করেছেন। মনে রাখতে হবে, তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল ফ্রান্সের এক সংকট-মুহূর্তে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দুর্যোগময় পরিবেশে। ভাবনা-চিন্তা এগিয়েছে। তিনি পথ বদলিয়েছেন। এর জন্য তিনি যেমন প্রশংসিত হয়েছেন, তেমনই নিন্দিতও হয়েছেন। যেমন অভিনন্দিত হয়েছেন, তেমনই আক্রমণের লক্ষ্যও হয়েছেন।

১৯৪১-এ দার্শনিক মার্লো পঁতি প্রমুখ বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে তিনি 'সমাজবাদ ও মুক্তি' নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কয়েক মাস পরে সেটি

ভেঙে যায়। কমিউনিস্টরা গুজব রটিয়ে দেয় যে সার্ত্র 'দালাল'। তিনি ১৯৪৪ সালে 'আকসিয়োঁ' পত্রিকায় কমিউনিস্ট আক্রমণের জবাবে 'অস্তিবাদ' সম্পর্কে রচনা লেখেন। ১৯৪৫-এ তিনি ফরাসি সরকারি খেতাব 'লেজিয়োঁ দন্যর' প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৪৭-এ তিনি তাঁর বন্ধু পল লির্জঁ সম্পর্কে কমিউনিস্টদের অপবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। 'লে তঁ মর্দেন' পত্রিকায় 'প্রাভদা'-র আক্রমণের উত্তর দেন। ১৯৪৮-এ তাঁর 'লে ম্যাঁ সাল' (ডার্টি হ্যান্ডস) নাটকের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরা প্রচার করে। সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ এই নাটককে রাশিয়া-বিরোধী বলে বিবেচিত করে।

১৯৫০-এ তিনি ও মার্লো পঁতি সোভিয়েত কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। ইজরায়েল রাষ্ট্রের সৃষ্টিকে তিনি খোলাখুলি সমর্থন করেন। ১৯৫২-তে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গো তাঁর প্রথম সমঝোতা হয়। ১৯৫৪-তে তিনি প্রথম রাশিয়া ভ্রমণ করেন। 'ফ্রান্স-সোভিয়েত সংঘ'-র সহ-সভাপতি মনোনীত হন। ১৯৫৬-তে ফরাসি নির্বাচনে তিনি কমিউনিস্ট প্রার্থীকে ভোট দেন। কিন্তু হাঙ্গোরিতে সোভিয়েত হস্তক্ষেপের নিন্দা করেন। কমিউনিস্ট পার্টি ও 'ফ্রান্স-সোভিয়েত সংঘ'-র সঙ্গো সম্পর্কচ্ছেদ করেন। রচনা করেন 'ফতোম দ স্তালিন' (স্তালিনের ভূত)। ১৯৫৮-তে আলজিরিয়ায় ফরাসি সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানান।

১৯৬০ সালে সার্ত্র ইতালির ওমেগা পুরস্কার পান। ১৯৬২-তে সিমন দ্য বোভোয়ারের সঙ্গো সার্ত্র রাশিয়ায় যান। স্বয়ং ক্রুশ্চেভ তাঁকে অভ্যর্থনা করেন। তিনি রাশিয়ার লেখকদের সঙ্গোও সাক্ষাৎ করেন। ১৯৬৪-তে তিনি নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৬৪ ও ১৯৬৫-তে পুনরায় রাশিয়া ভ্রমণ করেন। ১৯৬৫-তে ভিয়েতনামের মানুষের ওপর মার্কিন সৈন্যদের বর্বর অত্যাচার ও আমেরিকার ভিয়েতনাম-নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য তিনি পরিদর্শক-অধ্যাপক হিসেবে আমেরিকার কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রণ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৬৭ সালে সিনিয়াভস্কি দানিয়েলের বিচারের প্রতিবাদে আরাগঁ ও সার্ত্র সোভিয়েত লেখকদের দশম সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। ওই বছরেই 'ভিয়েতনাম : ইম্পিরিয়ালিজম অ্যান্ড জেনোসাইড' নামে এক চাঞ্চল্যকর তথ্যপুস্তিকাতে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ভিয়েতনামে গণহত্যার জন্য আমেরিকাকেই দায়ি করেন। ১৯৬৬-তে বার্ট্রান্ড রাসেলের আহ্বানে তিনি ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কে বিচারসভায় অংশগ্রহণে স্বীকৃত হন। ১৯৬৮-তে ফ্রান্সে মে মাসের ছাত্র-বিদ্রোহের প্রতি কমিউনিস্ট পার্টি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলে সার্ত্র

অভিযোগ করেন। চেকোস্লোভাকিয়ায় সোভিয়েত সামরিক হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা করেন। ১৯৬৯-এ চেকোস্লোভাকিয়ায় সোভিয়েত দমননীতি ও সলঝেনিৎসিনকে সোভিয়েত লেখক সংঘ থেকে বহিষ্কারের প্রতিবাদ করেন। ১৯৭০-এ মাওপন্থী 'তু' পত্রিকার পরিচালনভার গ্রহণ করেন। রেনো কারখানার শ্রমিকদের সামনে পিচের ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেন।

১৯৭১-এ লেখক পাদিলিয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফিদেল কাস্ত্রো ও কিউবার সঙ্গো সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ১৯৭৫-এ তিনি পরিস্কারভাবে মার্ক্সবাদ থেকে নিজের দূরত্ব ঘোষণা করে নিজেকে 'অবাধ স্বাধীনতার পক্ষপাতী সমাজতন্ত্র'-এর (সোসালিস্‌ম লিবের্তের) সমর্থক বলে স্বীকার করেন। ভ্যাটিকান শহরে পোপের দপ্তর থেকে সার্ত্রের সমস্ত রচনাকে বর্জনের নির্দেশ জারি করা হয়।

॥ ৩॥

সার্ত্রের নাটকেই আমরা একজিস্টেনশিয়ালিজম তত্ত্বকে বেশি প্রত্যক্ষ করি। তিনি প্রচলিত 'মনস্তাত্ত্বিক থিয়েটার'কে বাতিল করে দিলেন। তিনি তাঁর স্বপ্নের থিয়েটারের নাম দিলেন 'থিয়েটার অব সিচুয়েশন । তিনি বললেন, এই থিয়েটারে নাট্যকারের যেমন স্বাধীনতা থাকবে, দর্শকেরও তেমনই স্বাধীনতা থাকবে।

সার্ত্রের নাটক

লে মুশ (মক্ষিকা), ১৯৪৩। ১৯৪৩-এর ৩ জুন জার্মান অধিকৃত প্যারিসে নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়। ১৯৪৬-এ 'ফ্লাইজ' নামে ইংরাজি অনুবাদ করেন স্টুয়ার্ট গিলবার্ট। ১৯৪৭-এ নিউ ইয়র্কে ও ১৯৫১-তে লন্ডনে নাটকটি অভিনীত হয়।

উই ক্লো (বুদ্ধ দ্বার), ১৯৪৫। ১৯৪৪-এ মূল নাটকটি প্রথম ফরাসি পত্রিকা 'লার্বতেত'-এ মুদ্রিত হয়। তখন তার নাম ছিল 'অউট্রেস' (অন্যরা)। ফরাসি ভাষায় গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় নাটকটির নাম পালটে রাখা হয় 'উই ক্লো'। শব্দটি আইনের পরিভাষা থেকে নেওয়া। অর্থ— 'দরজা দেওয়া জজের কামরায়' বিচার। ১৯৪৫-এ নাটকটির ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় লন্ডনের 'হরাইজন' পত্রিকায়। ১৯৪৬-এ 'নো এক্সিট' নামে ইংরাজি অনুবাদ করেন স্টুয়ার্ট গিলবার্ট। বাংলায় 'কপাট' ও 'পথবুদ্ধ রৌরব' নামে অনুবাদ করেন যথাক্রমে কবি ও সাহিত্যিক নরেশ গুহ ও নাট্যকার চন্দন সেন। ১৯৪৪-এর জুনে নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় প্যারিসের ভিয়োকোলোঁবিয়ে থিয়েটারে। এরপর ১৯৪৬-এ লন্ডনের ভিসিয়াস সার্কলে ও নিউ ইয়র্কে অভিনীত হয়।

ব্যারিওনা অর দ্য সন অব থানডার ইন অ্যাডাম (ইংরেজি 'মিস্ট্রি'), ১৯৪০। ১৯৪০-এর ২৪ ডিসেম্বর জার্মানির বন্দিশিবিরে সার্ত্র নিজে নাটকটি অভিনয়

করান। তিনি নিজেও অভিনয় করেন।

মর সঁ সেপ্যুলত্যুর (সমাধিবিহীন মৃতেরা), ১৯৪৬। ১৯৪৯-এ কিটি ব্ল্যাক 'মেন উইদাউট শ্যাডোজ' নামে নাটকটির ইংরাজি অনুবাদ করেন। ১৯৪৬-এর ৮ নভেম্বর প্যারিসে নাটকটির প্রথম অভিনয় হয়। পরে ১৯৪৭-এ লন্ডনে ও ১৯৪৮-এ নিউ ইয়র্কে নাটকটি 'দ্য ভিক্টরস' নামে অভিনীত হয়।

লা পুঁত্যা রেসপেকত্যুয়েজ (বিনীতা বারবণিতা), ১৯৪৬। ইংরেজিতে 'দ্য রেসপেক্টেবল প্রস্টিটিউট' নামে নাটকটি ১৯৪৭-এ লন্ডনে ও ১৯৪৮-এ নিউ ইয়র্কে অভিনীত হয়। ইংরাজিতে নাটকটি অনুবাদ করেন লিওনেস অ্যাবেল। নাটকটি যেখানেই অভিনীত হয়েছে সেখানেই অভিনন্দিত হয়েছে। ১৯৫৩-তে নাটকটির একহাজার রজনী অভিনয় হয়েছে।

লে ম্যাঁ সাল (আত্মার মধ্যে মৃত্যু) ১৯৪৬। লিওনেল আবেল নাটকটি 'ডার্টি হ্যান্ডস' নামে ইংরাজিতে অনুবাদ কবেন। বাংলায় শিবনারায়ণ রায় 'নোংরা হাত' ও অর্পিতা ঘোষ 'রাজনৈতিক হত্যা' নামে অনুবাদ করেন। নিউ ইয়র্কে নাটকটি 'রেড গ্রোভস' নামে অভিনীত হয়। কলকাতায় নাটকটি নবনাট্যম, বহুরূপী ও পঞ্চম বৈদিক অভিনয় করে। নাটকটি ১৯৪৮-এর ২ এপ্রিল প্যারিসে অভিনীত হয় এবং একনাগাড়ে ১৯৪৯-এর ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলে। ফ্রান্সে 'বেস্ট সেলার' হিসেবে ১৯৫৫-তে নাটকটির দেড় লক্ষ কপি বিক্রি হয়।

লুসিফার অ্যান্ড দ্য লর্ড (শয়তান ও ঈশ্বর) ১৯৫১। নাটকটি ইংরাজিতে ১৯৫১-তে অনুবাদ করেন কিটি ব্ল্যাক। ১৯৫১ সালের ৭ জুন 'তেয়াত্র আঁতোয়া-তে নাটকটি অভিনীত হয়। লুই জোভে নাটকটি পরিচালনা করেন।

কিন (আলেকান্দার দুমার কাহিনি অবলম্বনে) ১৯৫৪। কিটি ব্ল্যাক নাটকটির ইংরাজি অনুবাদ করেন। ১৯৫৩ সালের ১৪ নভেম্বর প্যারিসের সারা বার্নহার্ড মঞ্চে অভিনীত হয়।

নেক্রাসভ, ১৯৫৬। জি. অ্যান্ড এস. লিসন নাটকটি ইংরাজিতে অনুবাদ করেন। ১৯৫৬-তে ইউনিটি থিয়েটার এটি নিউ ইয়র্কে মঞ্চস্থ করে।

লে সেকুইতি দ'আলতোনা (আলতোনার বন্দি), ১৯৬১। জি. অ্যান্ড এস. লিসন 'দ্য কনডেম্‌ড অব অ্যালতোনা' নামে নাটকটি ইংরাজিতে অনুবাদ করেন। ১৯৫৯ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর নাটকটি প্যারিসের রেনেসাঁস মঞ্চে প্রথম অভিনীত হয়। ১৯৬৫-তে নাটকটি নিউ ইয়র্কে অভিনীত হয়।

লেস ত্রোইএনেস, ১৯৬৭। রোনাল্ড ডানকান 'দ্য ট্রোজান উইমেন' নামে নাটকটি ইংরাজিতে অনুবাদ কবেন।

জনপ্রিয় একটি গ্রিক পৌরাণিক পটভূমিতে 'ফ্লাইজ' নাটকের কাহিনির শুরু।

নাটকটির তিনটি অঙ্ক। প্রথম অঙ্কে দেখা যায়, আগামেমননের পুত্র সুদর্শন, প্রাজ্ঞ, বিত্তশালী অরেস্তেস তার শিক্ষককে নিয়ে আর্গস নগরীতে এক গ্রীষ্মের অপরাহ্নে প্রবেশ করে দেখে নগরীর সব বাড়ির জানলা-দরজা বন্ধ। রাস্তায় কোনও লোক নেই। ছদ্মবেশী জিউসের কাছে তারা জানতে পারল, রাজা আগামেমননকে হত্যা করে তার ভাই ইজিস্থিয়াস তার স্ত্রীকে বিবাহ করেছে। আর্গস নগরীর জনগণ সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত অগণিত মক্ষিকার দাপটে উৎপীড়িত। তাদের শান্তি নেই। আনন্দ নেই। আশা নেই। উদ্দীপনা নেই। এই সময় অরেস্তেস তার ভগ্নি ইলেকত্রার সাক্ষাৎ পায়। দ্বিতীয় অঙ্কে দেখা যায়, অরেস্তেস রাজা ইজিস্থাস ও ক্লাইতেমনেস্ত্রাকে হত্যা করে পিতার হত্যার প্রতিশোধ নেয়। একই সঙ্গে স্বৈরাচারীর কবল থেকে অর্গাসের জনগণকে মুক্ত করে। তৃতীয় অঙ্কে আমরা দেখি, অরেস্তেস জিউসের প্রস্তাব 'রাজাসন' প্রত্যাখ্যান করে। জিউস, ইলেকত্রা, আর্গসবাসী সবাই তার বিরুদ্ধে চলে যায়। কিন্তু সে তার সিদ্ধান্ত পালটায় না। অর্গাস ছেড়ে চলে যায়।

নাটকে সার্ত্র দুটি নির্দেশ পাঠিয়েছেন। এক, স্বৈরাচারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো। দুই, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ত্যাগ কোরো না। এই নাটক অভিনয়ের কিছুকাল পরেই দেখা যায়, বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা জার্মান অধিকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সংঘবদ্ধ হয়েছেন। প্যারিসের জনসাধারণও স্বৈরতন্ত্রী জার্মান নাৎজিবাহিনীর অত্যাচারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করেছে।

'নো এক্সিট' নাটকে তিনটি চরিত্র— গার্সা, ইনিয়েজ ও এস্তেল। তিনজনই মৃত। এই তিন নর-নারীর অবস্থান লুই নাপলিয়ঁর উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ের সেকেন্ড এম্পায়ার আমলের একটি কামরায়। এই কামরাটিকে নাটকে নরক বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এই তিনটি চরিত্র দরজায়-আঁটা কামরায় জীবন কাটাবে। এমনকি দরজা কখনও যদি খুলেও যায়, তারা বেরতে পারবে না। নরকযন্ত্রণা ভোগই তাদের ললাটলিখন।

গার্সা এক সাংবাদিক। সে নিজের স্ত্রীকে প্রচণ্ড কষ্ট দিয়েছে। অথচ নিজেকে সে শান্তিবাদী বলে প্রতিপন্ন করতে চায়। সে তার দেশ আর্জেন্তিনা থেকে মেক্সিকোতে পালাতে গিয়ে সীমান্তে ধরা পড়ে এবং শত্রুপক্ষের গুলিতে প্রাণ দেয়। ইনিয়েজ ছিল ডাক বিভাগের কেরানি। তিনজনকে খুন করার পর সে খুন হয়েছে তার প্রণয়িনীর হাতে। এস্তেল গরিব ঘরের মেয়ে হয়েও হতে পেরেছিল ধনীঘরের বউ। কিন্তু সে তার বিশ্বস্ততা বজায় রাখতে পারেনি। দেহের বিনিময়ে সে পুরুষের ভালোবাসা আদায় করতে চায়। নিউমোনিয়াতে তার মৃত্যু ঘটে।

এই নাটকের প্রত্যেকটি চরিত্রই প্রথমে বলে যে তারা কোনও পাপ করেনি।

কিন্তু পরে তারা তাদের পাপ স্বীকার করে। এই নাটকে সার্ত্র বলেছেন, মানুষ তার কাজের জন্য নিজেই দায়ি। সে যা অপরাধ করে তার গ্লানি তাকেই বহন করতে হয়। আত্ম-প্রবঞ্চনায় যদি সে নিজেকে আবৃত করে রাখে, তাহলে মনুষ্যবোধ থেকে সে চিরকালের জন্য চ্যুত হয়। সার্ত্র বলেছেন, ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে সংঘাত যেমন আছে, তেমনই ব্যক্তিই তার সততা ও দায়িত্ববোধ দিয়ে নিজের জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারে।

সার্ত্রের 'দ্য রেসপেক্টেবল প্রস্টিটিউট' নাটকটি আমেরিকায় তীব্র জাতি-বিদ্বেষ ও বর্ণবৈষম্যের প্রেক্ষাপটে লেখা। এই নাটকের নায়িকা লিজি একজন বারবণিতা। নিউ ইয়র্ক থেকে ট্রেনে আসার সময় সে 'টমাস' নামে একজন শ্বেতাঙ্গকে দেখে এক নিগ্রোকে হত্যা করতে। লিজির ডেরায় এসে টমাসের ভাই ফ্রেড তাকে বোঝায়, পুলিস এলে সে যেন বলে যে নিগ্রোটি তার ওপর অত্যাচার করতে যাচ্ছিল। তার জন্য ফ্রেডের আত্মীয় টমাস তাকে হত্যা করেছে। লিজি এ সাক্ষ্য দিতে প্রথমে অস্বীকার করে। পুলিস তাকে ফ্রেডের তৈরি স্বীকারোক্তিতে সই করার জন্য ভয় দেখায়। তাতেও সে তার সংকল্পে ঠিক থাকে। সই করে না। সেনেটর ক্লার্ক এসে তাকে টমাসের মায়ের কথা বলে। আমেরিকার জাতীয় স্বার্থে টমাসের মতো ছেলের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে :

সেনেটর ও একজন অফিসার। আর আমার দরকার অফিসারের। দু'হাজার শ্রমিককে সে তার কারখানায় কাজ দিয়েছে। ও যদি মারা যায়, দু'হাজার লোকের কাজ যাবে। ও জনগণের নেতা, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিক সংগঠন এবং ইহুদিদের বিরুদ্ধেও একটা শক্ত প্রাচীর। ওর কাজ হল বাঁচা, আর তোমার কাজ ওকে বাঁচানো।

লিজি তার কথা বিশ্বাস করে। সই করতে রাজি হয়। নিজেকে সম্মানিতও বোধ করে। কিন্তু কিছু পরেই তার ভুল ভেঙে যায়। নিহত নিগ্রোর সঙ্গী ক্রুদ্ধ জনতার হাত থেকে পালিয়ে তার স্নানঘরে আশ্রয় নেয়। ফ্রেড এসে তাকে হত্যা করে।

জার্মান ভিকি সরকারের প্রতিভূ ফরাসি সেনানায়কদের ফরাসি বিপ্লবীদের ওপর অকথ্য নিপীড়ন এবং বিপ্লবী যোদ্ধাদের প্রতিরোধ, অমর সাহসিকতা ও দৃঢ়সংকল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে সার্ত্রের 'মেন উইদাউট শ্যাডোজ'। বিপ্লবী নেতা জাঁ-র হদিশ বার করার জন্য চারজন পুরুষ ও এক নারীকে ধরে আনা হয়েছে— গ্রিক কানেরিস, সোরবিয়ের, অঁরি, জাঁ-র প্রণয়িনী লুসি ও লুসির ভাই বালক ফ্রাঁসোয়া।

অসহ্য বলপ্রয়োগ সত্ত্বেও কানেরিস কোনও কথাই ফাঁস করে না। সোরবিয়ের ক্রমশ দৈহিক শক্তি হারিয়ে ফেলতে থাকে। অঁরি প্রচন্ড মার খেয়েও অনমনীয়।

লুসি নীরব। ফ্রাঁসোয়াকে নিয়ে সবাই শঙ্কিত। ঘটনা বাঁক নেয়। সৈন্যরা আসল পরিচয় না জেনেই জাঁ-কে বন্দি করে আনে। অমানুষিক দৈহিক অত্যাচার সহ্য করতে না পের সোরবিয়ের আত্মহত্যা করে। লুসিকে বলাৎকার করা হয়। অসহায় জাঁ। সে দেখছে, তাকে বাঁচাবার জন্য এতগুলি মানুষ চোখের সামনে লাঞ্ছিত হচ্ছে। তবু তার কিছু করার নেই।

'লুসিফার অ্যান্ড দ্য লর্ড' নাটকে সার্ত্র বলেছেন, 'ঈশ্বর নেই। তাই ধর্মেরও প্রয়োজন নেই। ধর্মই সামাজিক অন্যায় অত্যাচারকে জীইয়ে রাখে। গির্জা একটি পণ্যা নারী। শুধু ধনীদেরই সে অনুরাগ বিক্রয় করে। কৃপাবর্ষণ করে।' তাই ব্যক্তির একমাত্র কর্তব্য অত্যাচারিত শ্রেণীর সংগ্রামে যোগ দেওয়া এবং তাদের অবস্থার উন্নতি করা। তবে ব্যক্তি একা কোনও সংগ্রামে জয়যুক্ত হতে পারে না। সংঘবদ্ধভাবে সংগ্রাম করলে তবেই জয় সুনিশ্চিত হয়।

'দ্য কনডেমড অব আলতোনা' নাটকে সার্ত্র মধ্যবিত্ত ও ধনিক সমাজের মানুষ যে আত্ম-প্রচারণার অন্তরালে নিজের পাপকে গোপন রাখার চেষ্টা করে, তার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন। এই নাটকের নায়ক ফ্রানৎসের মতোই তারা একটি মিথ্যা জগৎ সৃষ্টি করে নিজেদের কাজকে সমর্থন করার চেষ্টা করে। তারা ভুলে যায়, তাদের কৃতকর্মের জন্য ভবিষ্যতের মানুষদের কাছে দায়ি থাকতে হবে। নাটকটির একটি রাজনৈতিক বক্তব্যও আছে। সেই সময় ফ্রান্স আলজিরিয়াতে যে মারণ-যজ্ঞ চালিয়েছিল, সার্ত্র এই নাটকে তার প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন, অত্যাচারই একদিন ফ্রান্সকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে। ধনতন্ত্রের ব্যক্তিসত্তাগ্রাসী সর্বনাশা রূপের কথাও এই নাটকে রয়েছে। ফ্রানৎসের পিতা তার শিল্প-প্রতিষ্ঠান লাভবান হবে বলে নাৎসি সরকারকে সমর্থন করে। পরে সে অনুভব করে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সে একটা যন্ত্র ছাড়া কিছুই নয়। তার ব্যবসার উন্নতি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার স্বকীয় সত্তা ধনতন্ত্রের জালে হারিয়ে গেছে।

'নেক্রাসভ' নাটকের কাহিনি : জর্জ ডি ভ্যালেরা নামে একজন জালিয়াত উচ্চপদস্থ রাশিয়ান সরকারি অফিসার সেজে একটি দক্ষিণপন্থী সংবাদপত্রে চাকরি নেয় ও কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে মিথ্যা রোমহর্ষক সব ঘটনা পরিবেশন করতে থাকে। সে দুই বামপন্থী সাংবাদিককে অপবাদ দিয়ে বলে, তারা সোভিয়েত রাশিয়ার কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পায়। নাটকের শেষে সে একটি বামপন্থী কাগজে এসে সত্য ঘটনা প্রকাশ করে দেয়। নাটকের আর এক জায়গায় দেখি, সে একটা অ্যাটাচি কেস দেখিয়ে বলছে, 'এই অ্যাটাচিতে ১৫ পাউন্ড আনবিক পাউডার রয়েছে। প্রত্যেকটি বড় শহরে একজন কমিউনিস্ট এইরকম একটি অ্যাটাচি নিয়ে বসে রয়েছে। অথবা চিলেকোঠার ছাদে অনেক বাজে

জিনিসের মধ্যে বা বাক্সে বা পুরোনো স্টোভের ভিতর এই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক লুকোনো আছে। কোনও একটি নির্দিষ্ট দিনে একটি সাংকেতিক বার্তা ফরাসি শহরে পৌঁছে গেলেই এই সমস্ত আনবিক পাউডার থেকে বিস্ফোরণ ঘটানো হবে। তাতে কী পরিণাম হবে আপনারা কি বুঝতে পারছেন? প্রতিদিন এক লক্ষ লোকের মৃত্যু।'

এই নাটকে সার্ত্র দেখিয়েছেন, পশ্চিমি রাষ্ট্রগুলি কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কীভাবে কুৎসা প্রচার করে। ক্রমাগত কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রচারের ফলে বিশ্বশান্তিতে যে ব্যাঘাত ঘটছে, সাধারণ মানুষ যে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছে, সেদিকে বিশ্ববাসীকে অবহিত ও সতর্ক করে দেওয়াই ছিল তার লক্ষ্য।

'ডার্টি হ্যান্ডস' নাটকের ঘটনাস্থল পূর্ব ইউরোপের একটি কাল্পনিক শহর। শ্রমিক পার্টির নেতা ওয়েদারাব রাজতন্ত্রী ও উদারনৈতিক দলের সঙ্গে সমঝোতা করে যুক্তফ্রন্ট করতে চাইছে। পার্টির আর এক নেতা লুই সেটা পছন্দ করছে না। সে ইউগো নামে এক বুদ্ধিজীবী কর্মীকে ওয়েদারারকে হত্যা করতে পাঠায়। কিন্তু ইউগো ওয়েদারারের ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে পড়ে। সে ওয়েদারারকে জানিয়ে দেয় পার্টি তার প্রস্তাব সমর্থন করে না। পার্টি মনে করে ওয়েদারার বিশ্বাসঘাতকতা করছে। ওয়েদারার তাকে বোঝায়, শ্রমিক দলকে ক্ষমতা পেতে হলে এই কৌশল অবলম্বন করা ছাড়া উপায় নেই। এদিকে ইউগোর স্ত্রী জেসিকা ওয়েদারারের অনুরক্ত হয়ে পড়ে। জেসিকা তাকে জানিয়ে দেয় যে ওয়েদারারকে হত্যা করার জন্য ইউগোকে পাঠিয়েছে লুই। ওয়েদারার বিশ্বাস করে না। ইউগোকে ডেকে এনে তাকে হত্যা করতে বলে। ইউগো তা পারে না। চলে যায়। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে দেখে ওয়েদাবার ও জেসিকা আলিঙ্গনাবদ্ধ। সে ওয়েদারারকে গুলি করে হত্যা করে। তার কারাবাস হয়। কারাবাস থেকে বেরিয়ে এসে সে তার প্রণয়ী ও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যা ওলগার কাছে আসে। ওলগা তাকে বলে, পার্টি এখন মনে করে ওয়েদারারের রাজনৈতিক কৌশল সঠিক ছিল। ওয়েদারার এখন তাই 'শহিদ'। পার্টি এখন তার মতোই রিজেন্সি ও ধনিক পার্টির সঙ্গে সমঝোতার নীতি নিয়ে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে বাঁচতে গেলে ইউগোকে এখন দুটি কাজ করতে হবে। নাম পালটে পার্টির নতুন সভ্য হতে হবে। বলতে হবে পার্টির নির্দেশে সে ওয়েদারারকে খুন করেনি। জেসিকার প্রণয়ী সন্দেহে সে তাকে খুন করেছে। ইউগো এই শর্ত মানে না। পরিণতি ভয়ঙ্কর জেনেও সে নির্ভয়ে তার স্বাধীন মতামত ও বিশ্বাস উচ্চারণ করে। পার্টির কর্মীরা তাকে খুন করে।

সার্ত্রের এই নাটকটির বিষয়— বিবেক ও মতাদর্শের দ্বন্দ্ব। পরিণতি— মতাদর্শের যূপকাষ্ঠে বিবেকের বলি। নাটকটির প্রেক্ষাপট— কমিউনিস্ট পার্টির

দলীয় কোন্দল। পরিণতি— দলের নেতা ও কর্মী হত্যা। নাটকটির কাহিনি— ক্ষমতা দখলের জন্য বামপন্থী প্রগতিশীল শক্তির সঙ্গো দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির অশুভ আঁতাত। পরিণতি— সুবিধাবাদী, অনৈতিক ও আদর্শহীন রাজনীতির জন্ম। নাটকের মূল সংঘাত— ব্যক্তি-স্বাধীনতা বনাম কমিউনিস্ট পার্টির আনুগত্য। পরিণতি— ব্যক্তি-কণ্ঠের পরাভব ও দলতন্ত্রের জয়। নাটকটির ছত্রে ছত্রে সার্ত্র এই কথাগুলি বলে গেছেন। যেমন :

ওয়েদারার — একটা রাজনৈতিক সংগঠনের লক্ষ্য হল ক্ষমতা— power. তোমায় মাথায় এখনও আদর্শ-টাদর্শ ঘোরে, তবে আমি নিশ্চিত, খুব অল্পদিনের মধ্যেই তুমিও সব ভুলে যাবে।

ইউগো — আপনি একটা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যে আমাদের এই সাম্যবাদের ভাবনাটা গুঁজে দিতে চাইছেন। কিন্তু আপনি নিজেও জানেন সেটা সম্ভব নয়, এটা সাময়িক সরলীকরণ মাত্র।

ওয়েদারার — দেশ শাসনও করবে আবার সৎ-ও থাকবে— এ হয়? নো মাই ডিয়ার, ইটস আ ড্রিম।

জেসিকা — এই পৃথিবীতে যারা তোমাদের মতো ভাবেন না, তাঁদের সবাইকে তোমরা মেরে ফেলবে?

ওয়েদারার — ব্যক্তিগত জিনিস? মনে রেখো যেদিন থেকে তুমি আমার কাছে এসেছ, সেদিন থেকে তোমার ব্যক্তিগত বলে আর কিছু নেই।

ইউগো — এবার আপনারা কমরেডদের মিথ্যা বলবেন। বিভিন্নরকম ছক কষবেন। কম্প্রোমাইজ করবেন। বোঝাবেন যে এটা সরকারের পলিসি, আর আপনারা তার অংশীদারমাত্র।

ওয়েদারার — যদি আমরা এই মুহূর্তে জোট বাঁধি, তাহলে ক্ষমতাও একইসঙ্গো ভোগ করব। আর যদি আপনারা আমাদের সঙ্গো না আসতে চান, তাহলে যুদ্ধের পর আমাদের পার্টিই দেশ শাসন করবে। তবে এই গোপন আঁতাতের কথা অন্য দেশের সামনে বা দেশবাসীর কাছে এখনই ফাঁস হবে না, আপাতবিরোধিতাই বজায় থাকবে।

ইউগো   আমরা আমাদের মৃত কমরেডদের সঙ্গো বিশ্বাসঘাতকতা করছি।

(সূত্র : 'রাজনৈতিক হত্যা'-- অর্পিতা ঘোষ)

সার্ত্রের এই নাটকটি ১৯৪৬ সালে লেখা। এটা ২০০৬। ৫৮ বছর পর ভারতবর্ষের রাজনীতিতে ওই একই ঘটনার হুবহু প্রতিরূপ দেখছি। যে কংগ্রেস পার্টি 'আমাদের ১০ হাজার কমরেডকে খুন করেছে', যে কংগ্রেস পার্টি 'স্বৈরতন্ত্রী' ও 'বুর্জোয়া', সেই দক্ষিণপন্থীর সঙ্গো কমিউনিস্টরা সমঝোতা করে গড়েছে ইউপিএ সরকার ('আমরা আমাদের মৃত কমরেডদের সঙ্গো বিশ্বাসঘাতকতা করছি')।

পঞ্চম বৈদিকের প্রযোজনা দেখে সাহিত্যিক বাণী বসু লিখেছেন, 'এই অত্যন্ত সমকালীন নাটককে তুলে ধরে 'পঞ্চম বৈদিক' একটা কাজের মতো কাজ করলেন। কীভাবে রাজনীতি রং পালটায় তা আমরা হাড়ে হাড়ে জানি, তার শৈল্পিক প্রতিফলন থিয়েটারের মাধ্যমে আমাদের ঝাঁকিয়ে জাগিয়ে দেয়। রাজনীতি বহুরূপী হয়ে রং পালটাতে চাইলে পালটাক, কিন্তু মানুষকে-- সৎ, বিশ্বাসী, বুদ্ধিমান, হৃদয়বান সাধারণ ও অসাধারণ মানুষকে কেন তার নোংরা হাতের শিকার হতে হবে?' তিনি আরও লিখেছেন, 'বিবেকে আর মতাদর্শে, মানবিকতা আর ইজ্‌মের ঝগড়া আরও সমানতালে চলেছে। এবং ক্রমশই দুই প্রতিপক্ষের মধ্য থেকে বিবেক বা মানবিকতার স্থান শূন্য হয়ে যাচ্ছে।'

শিলাদিত্য সেন লিখেছেন, 'দেশ শাসনও করবে আবার সৎ-ও থাকবে-- এ হয়? নো মাই ডিয়ার, ইটস আ ড্রিম।' কথাগুলো আজ আর আমাদের আশ্চর্য ঠেকে না। আমাদের বামপন্থী দলগুলির 'ইস্যুভিত্তিক' রাজনীতি দেখে দেখে আমরা অভ্যস্ত, চূড়ান্ত বিপরীত মতের পার্টিকেও তারা পথের সঙ্গী করেছে। লক্ষ্য একটাই : সংসদীয় গণতন্ত্রে টিকে থাকা বা আসন পাওয়া। এসব নিয়ে প্রশ্ন তুললেই ওঁরা হাঁ-হাঁ করে ওঠেন, বলেন, ও তো কৌশল। আদর্শ পালনের জন্য ওরকম কত কৌশল অবলম্বন করতে হয়। প্রায় তিরিশ বছর হতে চলল পশ্চিমবঙ্গো ক্ষমতাসীন বামপন্থীদের শাসনাধীন আমরা, এতদিনে শিখে গেছি আদর্শের বকলমে কৌশলই কমিউনিস্ট পার্টির মূল চালিকাশক্তি।'

জয় গোস্বামী লিখেছেন, 'সেই প্রশ্ন, বহুকাল ধরে নিষ্ফলভাবে বিতর্কিত হয়ে গেছে।' বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্য 'সংক্রান্তি'র সেই সংলাপ মনে পড়ছিল পঞ্চম বৈদিকের 'রাজনৈতিক হত্যা' নাটকটি দেখবার সময়। আদর্শ না পদ্ধতি? নৈতিকতা না রাজনৈতিক পলিসি? সেই সঙ্গো জড়ানো অমোঘ ও অমীমাংসিত আরও এক জিজ্ঞাসা, ব্যক্তির স্বতন্ত্র যে চিন্তা, তার স্বপ্নের যে মুখ, তার কোনও মূল্য আছে কি? নাকি দল? দলের নির্বিকার ও নির্মম প্রভুত্বই সব।'

থিয়েটার অব সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম

'ক্রিটিকাল রিয়ালিস্টরা ধনতান্ত্রিক কাঠামোর প্রতি শ্রদ্ধাহীন বটে, কিন্তু তাঁরা সমাজের স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চান। যে সমাজের তাঁরা সমালোচনা করেন, তাকে উৎখাত করে নতুন সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তনের কথা বলেন না। তাঁরা শুধু বাস্তব ঘটনার, দুঃখ-দুর্দশা বা অনাচারের আলেখ্য রচনা করেন। অন্যদিকে সোস্যালিস্ট রিয়ালিস্টরা সমাজবাদ প্রচার করেন, তাঁরা সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং বিপ্লবী সম্ভাবনার উন্নতি করতে চান।' *—ম্যাক্সিম গোর্কি*

'গোর্কির 'ক্রিটিকাল বিয়ালিজম' ও 'সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম'— এই দুইয়ের প্রভেদ নির্ণয়ের চেষ্টা অতিসরলীকরণের নমুনা।'

—আর্নস্ট ফিশার

'সোস্যালিস্ট রিযালিজম' শিল্পেব ওপর একটি বাজনৈতিক মতবাদ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা বই কিছু নয়।' *—হার্বার্ট রীড*

'শিল্প জন্ম থেকেই জনসাধাবণের শিল্প হয় না। বিভিন্ন প্রচেষ্টার ফলে তা জনসাধারণের শিল্পে পরিণত হয়। প্রযোজ্যতা, প্রয়োজনীয়তা, সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ প্রভৃতির ফলে শিল্প শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের হয়ে ওঠে।' *—ভ্লাদিমির মায়াকোভস্কি*

১৯৩৪ সাল থেকে সোভিয়েত সাহিত্যে 'সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম' শব্দটির সূত্রপাত হয়। শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন রাশিয়ান লেখক ও নাট্যকার ম্যাক্সিম গোর্কি (১৮৬৮-১৯৩৬)। তাঁকে 'সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম'-এর জনক বলা হয়। তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট। রাশিয়ার বিপ্লবের পরে তিনি ১৯২১ সাল পর্যন্ত রাজ্য প্রকাশনার প্রধান ছিলেন এবং পরে স্তালিনের রাজত্বকালে প্রপাগান্ডিস্ট হিসেবে

কাজ করেন।

গোর্কি রিয়ালিজমকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন : 'ক্রিটিকাল রিয়ালিজম' ও 'সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম'। গোর্কির মতে, 'ক্রিটিকাল রিয়ালিস্টরা' ধনতান্ত্রিক কাঠামোর প্রতি শ্রদ্ধাহীন বটে, কিন্তু তাঁরা সমাজের স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চান। যে সমাজের তাঁরা সমালোচনা করেন, তাকে উৎখাত করে নতুন সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলেন না। তাঁরা শুধু বাস্তব ঘটনার, দুঃখ-দুর্দশা বা অনাচারের আলেখ্য রচনা করেন। অন্যদিকে, 'সোস্যালিস্ট রিয়ালিস্টরা' সমাজবাদ প্রচার করেন। তাঁরা সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং বিপ্লবী সম্ভাবনার উন্নতি করতে চান। তাঁরা শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম শক্তি শ্রমিক শ্রেণীর নিরন্তর সংগ্রামের চেহারা সহানুভূতির সঙ্গো আঁকতে চান। তাঁরা ধনতন্ত্রকে শুধু সমালোচনাই করেন না। এই ব্যবস্থার অবসানে শ্রমিক শ্রেণীর জয়ের সম্ভাবনা ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হন। তাঁরা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে মার্ক্সবাদে শ্রমিকদের শিক্ষিত করতে চান।

গোর্কির মতোই 'সোস্যালিস্ট রিয়ালিস্ট' হলেন বেলিনস্কি, আরাগঁ ও নেরুদা। গ্রিগোবিয়েভিচ বেলিনস্কি (১৮১১-১৮৪৮) হলেন রুশ দার্শনিক, সমালোচক ও সাংবাদিক। তিনি দস্তয়েভস্কি, গোগোল, বাখতিন, গনচারভ, বাকুনিন, হারজেন নেক্রাসভ, তুর্গেনিভ প্রমুখ রুশ দিক্‌পালদের সান্নিধ্যে আসেন। তিনি সমাজতন্ত্রের ফরাসি ধারার অনুসরণকারী। তিনি 'বোরোদিনের সংগ্রাম' (১৮৩৯), পুশকিনের সমালোচনা (১৮৪১), দস্তয়েভস্কির 'পুওর ফোক'-এর সমালোচনা (১৮৪৫), গোগোলের লেখার আলোচনা (১৮৪৭) ইত্যাদি গ্রন্থের জন্য বিখ্যাত হন। তিনি শিল্পের বাস্তবমুখী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি দস্তয়েভস্কি, গোগোল ও লেরমেন্তভের লেখার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁর বহু লেখার জন্য তাঁকে জারের নিষেধাজ্ঞা ও রোষানলের সম্মুখীন হতে হয়। পরবর্তী যুগে রুশ বিপ্লবের ওপর বেলিনস্কির লেখার প্রভাব পড়েছিল।

লুই আরাগঁ (১৮৯৭) হলেন ফরাসি কবি, ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার। তিনি প্রথম জীবনে সুররিয়ালিস্ট কাব্য আন্দোলনের সঙ্গো যুক্ত ছিলেন। পরে কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী হন। ১৯২৭-এ তিনি ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। এই সময়ে লেখা তাঁর 'আইজ অ্যান্ড মেমারি', 'গ্রেট ফান' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের ছত্রে ছত্রে আমরা পাই দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও বেদনার অভিজ্ঞতা এবং অবশেষে উপলব্ধি : 'সমুদ্রে— সমুদ্রে আমাদের যেতেই হবে।'— ব্যক্তিগত অনুভবের সঙ্গো সমাজ-চেতনার সমন্বয় এই পর্বের রচনার বৈশিষ্ট্য। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস : 'দ্য বেলস অব ব্যাসেলস' (১৯৩৪), 'রেসিডেনশিয়াল

কোয়ার্টার্স' (১৯৩৬), 'দা সেঞ্চুরি ওয়াজ ইয়ং' (১৯৪১) ও 'লা কমিউনিস্ট (১৯৪৫)'।

পাবলো নেরুদা (১৯০৪-১৯৭৩) হলেন চিলির কবি, কূটনীতিজ্ঞ ও কমিউনিস্ট নেতা। তিনি ১৯৭১-এ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতা : 'টুয়েনটি লাভ পোয়েমস অ্যান্ড আ সং অব ডেসপেয়ার' (১৯২৪) ও 'ক্যানটো জেনারেল' (১৯৫০)।

মার্ক্সবাদী সমালোচক আর্নস্ট ফিশার (১৮৬৫-১৯৪৭) বলেছেন, 'গোর্কির 'ক্রিটিকাল রিয়ালিজম' ও 'সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম'— এই দুইয়ের প্রভেদ নির্ণয়ের চেষ্টা অতিসরলীকরণের নমুনা।' তিনি 'সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম' শব্দটিও খুব সমর্থনযোগ্য মনে করেননি যেহেতু তাঁর মতে, 'সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম' সাহিত্যকে অনেকে প্রচারধর্মী সাহিত্য ছাড়া কিছু মনে করেন না। হার্বার্ট রীড বলেছেন, 'সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম' শিল্পের ওপর একটি রাজনৈতিক মতবাদ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা বই কিছু নয়।' বস্তুত, স্তালিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার কমিউনিস্ট সরকার জনগণকে কমিউনিজমের আদর্শে দীক্ষিত করার জন্য গোর্কির সূত্রায়িত 'সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম'কে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করল। উদ্দেশ্য হল, দলের নীতিসূত্রকে মজবুত করা।

॥ ২॥

সোভিয়েত থিয়েটারে 'সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম' কথাটি প্রথম চালু করেন সোভিয়েত মন্ত্রী, বিপ্লবী, কবি, নাট্যকার ও সমালোচক আনাতোলি লুনাচারস্কি (১৮৭৫-১৯৩৩)। ১৯১৭ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার সরকারি শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯২০-তে তিনি মস্কোর 'স্টেট ইনস্টিটিউট ফর চিলড্রেন সংস্থাটি পরিচালনা করেন।

লুনাচারস্কি থিয়েটারকে বিপুলভাবে উৎসাহ যুগিয়েছেন ও প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছেন। ১৮৯৭-এ একজন বিপ্লবী হিসেবে এবং ১৯১৯-এ একজন বলশেভিক হিসেবে তিনি বলশেভিকদের নিয়ন্ত্রণে সমস্ত অঞ্চলের থিয়েটারগুলির জাতীয়করণে সাহায্য করেছিলেন। থিয়েটারের প্রতি তাঁর এত অনুরাগ ছিল যে, তিনি থিয়েটারের এক অভিনেত্রীকে বিবাহ করেন ও অক্টোবর বিপ্লবের পর অনেক নাট্যশিল্পী ও নাট্য শিক্ষায়তনকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে বাঁচান। তিনি মস্কো আর্ট থিয়েটারকে পুনরুজ্জীবিত করেন। তিনি বহু নাট্যসংগঠন গড়তে সাহায্য করেছেন। পার্টির আপত্তি সত্ত্বেও স্তানিস্লাভস্কি, মেয়ারহোলদ, ভাখতানগভ ও তেইরভের মতো আভাঁ গার্দে নাট্য-পরিচালকদের তিনি রক্ষা করেছেন। পালন

করেছেন। তিনি বিপ্লবের পর নতুন থিয়েটার তৈরি করতে উৎসাহ দিয়েছেন। নতুন সোভিয়েত নাটক লেখার জন্যও নাট্যদলগুলিকে উৎসাহ দিয়েছেন।

লুনাচারস্কির সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম ও প্রলেতারিয়ান শিল্পের ওপর অগাধ বিশ্বাস ছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, নতুন দর্শকরা— যাঁদের মধ্যে অনেকে কখনও থিয়েটারটাই দেখেননি— তাঁরা নতুন নাটক ও নতুন আঙ্গিক চাইবেন। তিনি এও বুঝেছিলেন, পুরোনো রাশিয়ান ও ইউরোপিয়ান নাটকগুলি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সব অমূল্য সম্পদ। সেগুলির ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া বা সেগুলিকে অবজ্ঞা করা মারাত্মক ভুল হবে। এই জন্য তিনি পুরোনো ক্লাসিক নাটকগুলির নব-রূপায়ণ চাইলেন। তাঁর ইচ্ছামতো একসারি তাজা নতুন নাটক যেমন মঞ্চস্থ হল, তেমনই পুরোনো ভালো নাটকও নব-আঙ্গিকে অভিনীত হল। ১৯৩৭-এ পোপোভের পরিচালনায় শেক্সপীয়রের 'দ্য টেমিং অব দ্য শ্রু' তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

লুনাচারস্কি ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক বিষয়কে বৈপ্লবিক চেতনায় পুষ্ট করে ১৪টি নাটক লিখেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'ফাউস্ট অ্যান্ড দ্য সিটি' (১৯১৮), 'অলিভার ক্রমওয়েল' (১৯২০), 'ফোসা ক্যাম্পানেল্লা' (১৯২১), 'দ্য লিবারেটেড দন. কুহোতে' (১৯২১)। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলিকে মার্ক্সবাদী চরমপন্থীরা আক্রমণ করেছেন।

লুনাচারস্কি থিয়েটারের ওপর অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। সেগুলি ১৯২৪, ১৯২৮ ও ১৯৩৬-এ তিনটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৪-এ মস্কোর স্টেট ইনস্টিটিউট অব থিয়েটারের নামকরণ হয় লুনাচারস্কি থিয়েটার।

॥ ৩॥

'সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম'-এর আর এক রূপকার বিশিষ্ট রুশ কবি ও নাট্যকার ভ্লাদিমির মায়াকোভস্কি (১৮৯৩-১৯৩০)। রুশ বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে তিনি একজন অগ্রগণ্য কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। অক্টোবর বিপ্লব তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তা ধরা পড়ে তাঁর 'মাই রেভোলিউশন' রচনাতে। তিনিই প্রথম কবি যিনি কবিতাকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবাদর্শের সঙ্গো যুক্ত করতে পেরেছিলেন। মায়াকোভস্কি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, মানুষের স্বপ্ন-সম্ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম প্রীতি-মমতা ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বিনষ্ট হতে বাধ্য। তিনি এমন এক নতুন জগতের স্বপ্ন দেখতেন, যেখানে অন্যায়, অবিচার, স্বার্থপরতা, অসাম্য, নিষ্ঠুরতা, হিংসা বিদূরিত হবে। শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি এমন এক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখতেন, যেখানে শোষণ থাকবে না, দারিদ্র্য থাকবে না, বিদ্যা

ও শ্রমকে পণ্য করে মানুষকে বাঁচতে হবে না। তাঁর লেখায় তাই ধ্বনিত হয়েছে নতুন রাশিয়ার আশার বাণী।

মায়াকোভস্কির মূল লক্ষ্য ছিল, প্রলেতারিয়ান সংস্কৃতি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছে বোধ্য হোক। তিনি বলেছেন, 'শিল্প জন্ম থেকেই জনসাধারণের শিল্প হয় না, বিভিন্ন প্রচেষ্টার ফলে তা জনসাধারণের শিল্পে পরিণত হয়। প্রযোজ্যতা, প্রয়োজনীয়তা, সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ প্রভৃতির ফলে শিল্প শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের হয়ে ওঠে।'

মায়াকোভস্কির স্মরণীয় কাব্য : 'মোস্ট এক্সট্রা-অর্ডিনারি অ্যাডভেঞ্চার নাইট' (১৯১২), 'ক্লাউড ইন প্যান্টস' (১৯১৫), 'দ্য ব্যাকবোন ফ্লুট' (১৯১৬), 'ওয়ার অ্যান্ড পিস' (১৯১৯), 'লেনিনের মৃত্যুর পরে ইলিচ লেনিন' (১৯২৭), 'ভেরি গুড, জুবিলি' (১৯১৪), 'ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট' (১৯১৭), 'স্টিমার অ্যান্ড ম্যান' (১৯১৮), 'ব্রুকলিন ব্রিজ' (১৯২৪), 'হোমওয়ার্ডস' (১৯২৬), টু আওয়ার ইয়ং পিপল' (১৯২৮), 'মাই সোভিয়েত পাশপোর্ট' (১৯৩০)। এইসব কাব্যগ্রন্থে মায়াকোভস্কির সমকালীন বুর্জোয়া ব্যবস্থার প্রতি ঘৃণা ও বিপ্লবের প্রতি দৃঢ় সমর্থনের আশাবাদ প্রকাশিত।

মায়াকোভস্কির নাটক : 'মিস্ট্রি বুফে' (১৯১৮), 'দ্য বেডবাগ', 'দ্য বাথ হাউস' (১৯৩০)। 'মিস্ট্রি বুফে' নাটকটিকে প্রথম সোভিয়েত নাটক বলে আখ্যা দেওয়া হয়; ১৯২৯-এ নাটকটি মস্কোতে অভিনীত হয়। বিপ্লব-পূর্ববর্তী বুর্জোয়াদের নিয়ে তাঁর 'দ্য বাথ হাউস' প্রহসন নাটকটি মেয়ারহোলদ রোবোট, প্রতীকী মঞ্চ ও যান্ত্রিক কলাকৌশলের আঙ্গিক দিয়ে প্রযোজনা করেন। 'দ্য বেডবাগ' নাটকটি ইংরাজিতে প্রথমে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রযোজনা করেন। ১৯৬২-তে ডিমিট্রি ম্যাকারফের অনুবাদে মারমেইড থিয়েটারে এই নাটকটির পেশাদারি প্রযোজনা হয়।

১৯২২-এ প্রচার-নাটকের প্রয়োজনে 'থিয়েটার অব রেভোলিশন' নামে যে থিয়েটার স্থাপিত হয়, ১৯৫৪-তে সেই থিয়েটারের নাম রাখা হয় মায়াকোভস্কি থিয়েটার।

'মিস্ট্রি বুফে' নাটকটি সর্বহারার ক্ষমতা দখলের আখ্যান। মধ্যযুগের ধর্মীয় 'মিস্ট্রি নাটক'-এর আঙ্গিকে লেখা। কাহিনি : বন্যায় পৃথিবী জলের তলায় ডুবে গেছে। একটিমাত্র নৌকোয় একদল পুঁজিপতি ও একদল শ্রমিক বেঁচে রয়েছে। নৌকোর দখলদারি নিয়ে দু'পক্ষের লড়াই হয়। শ্রমিকরা জেতে। পুঁজিপতিদের জলে ফেলে দেয়। তারপর তারা 'আরারাত' নামে স্বর্গে চলে আসে। স্বর্গের দখল নেয়। এই নাটকটিতে মায়াকোভস্কি নিজে অভিনয় করেছিলেন।

'দ্য বেডবাগ' নাটকটিতে মায়াকোভস্কি কমিউনিস্ট রাশিয়ার আমলাদের সুবিধাবাদী নীতিকে ব্যঙ্গ করেছেন। কাহিনি : ইভান প্রিসিপকিন এক সরকারি আমলা। উচ্চপদস্থদের তোষামোদ করে। পদ ও প্রতিষ্ঠার জন্য লালায়িত। শ্রমিক-কন্যা জোইয়া বেরেজকিনার ভালোবাসা প্রত্যাখ্যান করে পুঁজিপতির কন্যা এলজোভরা রেনেসাঁসকে বিবাহ করতে চায়। জোইয়া আত্মহত্যা করে। প্রিসিপকিন-রেনেসাঁসের বিবাহের দিন কনের কাপড়ে আগুন লাগে। আগুন ছড়িয়ে পড়ে। অতিথিরা সবাই আগুনে পুড়ে মরে। ৫০ বছর বাদে বাড়িটি খনন করতে গিয়ে মাটির তলায় একটি ঘরে এক বরফের চাঁইয়ের মধ্যে জমাট বাঁধা প্রিসিপকিনকে উদ্ধার করা হয়। তার সঙ্গে একটি মৃত ছারপোকাকেও পাওয়া যায়। দু'জনকেই বাঁচিয়ে তোলা হয়। প্রিসিপকিনকে চিড়িয়াখানার একটি খাঁচার মধ্যে রাখা হয়। সে প্রতিবাদ করে। কিছু সময়ের জন্য তাকে খাঁচার বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু ছাড়া পেয়েই সে কমিউনিস্ট শাসকদের নিন্দা করতে থাকে। তাকে আবার খাঁচায় পুরে দেওয়া হয়।

॥ ৪ ॥

সোভিয়েত সাংবাদিক ও নাট্যকার নিকোলাই পোগোদিনও (১৯০০-১৯৬২) সোস্যালিস্ট রিয়ালিজমের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ১৯২২ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত 'প্রাভদা' পত্রিকার সাংবাদিক ছিলেন। তিনি তিরিশটির মতো নাটক লিখেছেন। তাঁর নাটকগুলি সমাজবাদ নির্মাণের মহৎ কাজে উৎসর্গী ছিল। তাঁর প্রথম নাটক 'টেম্পো' (১৯৩০) প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯২৮-১৯৩৩) নির্মাণ কাজের ওপর লেখা। তাঁর 'পোয়েম অ্যাবাউট অ্যান এক্স' (১৯৩১) নাটকটি পোপোভ প্রযোজনা করেন। তাঁর 'অ্যারিস্টোক্র্যাট' (১৯৩৪) নাটকটি ওখলোপকভ রিয়ালিস্টিক থিয়েটারে প্রযোজনা করেন। নাটকটি 'বাল্টিক হোয়াইট সী ক্যানাল প্রজেক্টের কাজকর্ম নিয়ে লেখা। তিনি লেনিনের নেতৃত্ব নিয়ে তিনটি নাটক লেখেন : 'দ্য ম্যান উইথ দ্য গান' (১৯৪২), 'ক্রেমলিন টাইমস' (১৯৪২) ও 'দ্য থার্ড প্যাথেটিক' (১৯৫৮)। 'ক্রেমলিন টাইমস' নাটকটি ১৯৫৬ সালে মস্কো আর্ট থিয়েটার 'ওয়ার্ল্ড থিয়েটার সেশন'-এ মঞ্চস্থ করে। ১৯৭০ সালে ওই নাটকটি ও 'দ্য থার্ড প্যাথেটিক' নাটকটি লন্ডনে অভিনীত হয়। ১৯৫৭-তে তিনি স্তালিনকে নিয়ে 'আ পেট্রাবচ্যান সনেট' নামে একটি নাটক লেখেন। নাটকটি ১৯৫৭-তে 'ইয়ার অব দ্য প্রোটেস্ট' এ শ্রেষ্ঠ নাটক হিসেবে মনোনীত হয়। তাঁব 'টেম্পো' ও 'অ্যারিস্টোক্র্যাট' নাটক দুটি ভাখতানগভ থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়। এই দুটি নাটকই ইংরাজিতে 'সিক্স সোভিয়েত প্লেজ'

(১৯৩৪) নামক নাট্যসংকলনে মুদ্রিত হয়। ১৯৩০-এ তাঁর 'অ্যারিস্টোক্র্যাট' নাটকটি লন্ডনের ইউনিটি থিয়েটার প্রযোজনা করে। পোগোদিন 'লেনিন' ও 'স্তালিন' সম্মানে ভূষিত হন।

'সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম'-এ বিশ্বাসী সুবিদিত সোভিয়েত পরিচালক দিমিত্রোভিচ পোপোভ (১৮৯১-১৯১৬) ১৯১২ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত মস্কো আর্ট থিয়েটারে কাজ করেছেন। ১৯২৩-এ তিনি ভাখতানগভ থিয়েটারে যোগ দেন এবং ওই থিয়েটারের বিকাশে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। ১৯৩১ সালে তিনি 'থিয়েটার অব রেভোলিউশন' প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য আমন্ত্রিত হন। সেখানে তিনি ১৯৩১-এ পেগোদিনের 'পোয়েম অ্যাবাউট অ্যান এক্স' ও ১৯৩৮-এ শেক্সপীয়রের 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট' প্রযোজনা করেন। এরপর তিনি রেড আর্মি থিয়েটারে (সেন্ট্রাল থিয়েটার অব সোভিয়েত আর্মি) যোগ দেন এবং সেখানে ১৯৩৮-এ শেক্সপীয়রের 'দ্য টেমিং অব দ্য শ্রু' এবং ১৯৪০-এ 'আ মিডসামার নাইট'স ড্রিম' মঞ্চস্থ করেন। যুদ্ধের সময় এই থিয়েটারকে মস্কো থেকে তুলে দেওয়া হলে তিনি নিজ প্রচেষ্টায় অনেক সোভিয়েত নাটক প্রযোজনা করেন। পরে মস্কোতে ফিরে এসে ১৯৫১-তে গোগোলের 'রেভিজর' এবং ১৯৫৬-তে পোগোদিনের 'ক্রেমলিন টাইমস' প্রযোজনা করেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর পরিচালন-পদ্ধতি নিয়ে একটি বই প্রকাশ করেন। তিনি প্রথমে নাটকের প্রত্যেকটি অংশকে নিয়ে বিশদভাবে কাজ করতেন। তারপর তাদেরকে মালার মতো একটি সুতোয় গেঁথে দিতেন।

॥ ৫ ॥

মায়াকোভস্কির তত্ত্বগত শিষ্য ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত রুশ অভিনেতা ও পরিচালক নিকোলাই পাভলোভিচ ওখলোপকভ (১৯০০-১৯৬৭)। ১৯২১-এ তাঁর জন্মস্থান ইরকুটস্ক শহরে মে দিবসে তিনি একটি প্রদর্শনী করেন। এটিই তাঁর প্রথম প্রযোজনা। এই প্রদশনীর তিনিই ছিলেন লেখক, প্রধান অভিনেতা ও পরিচালক। ১৯২৫-এ তিনি মস্কোয় মেয়ারহোলদের অধীনে শিক্ষাগ্রহণ করেন। ১৯৩০-এ তিনি রিয়ালিস্টিক থিয়েটারে (পূর্বতন মস্কো আর্ট থিয়েটারের স্টুডিও) আর্ট ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। এই থিয়েটারে তিনি গোর্কির 'মাদার', পোগোদিনের 'অ্যারিস্টোক্র্যাট' প্রভৃতি একাধিক নাটক প্রযোজনা করেন। ১৯৩৮-এ এই থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তিনি ভাখতানগভ থিয়েটারে যোগদান করেন। ওই থিয়েটারে তাঁর 'সিরানো দ্য বারাজরাক' নাটকের প্রযোজনাটি দৃশ্যসজ্জার মৌলিকত্ব ও সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গির জন্য বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে।

১৯৪৩-এ ওখলোপকভ থিয়েটার অব দ্য রেভোলিউশনে (বর্তমানে মায়াকোভস্কি থিয়েটার) আলেকজান্দার ফেদায়েভের 'দ্য ইয়ং গার্ড' (১৯৪৭) এবং স্তালিনগ্রাদের ওপর লেখা 'গ্রেট ডেজ' (১৯৪৭), এস. এইচ. টেইনের (১৮২৮-১৮৯৬) 'ল অব অনার' (১৯৪৮), অস্ত্রোভস্কির 'ফিয়ার' (১৯৫৩), শেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' (১৯৫৪), আরবুজভের 'এন্ডলেস ডিসট্যান্স' (১৯৫৮), পোগোদিনের 'দ্য লিটল স্টুডেন্ট' (১৯৫৯) ও ব্রেশটের 'মাদার কারেজ' মঞ্চস্থ করেন।

ওখলোপকভ প্রত্যেকটি নাটকের জন্য মঞ্চকে ঢেলে সাজাতেন। কোনও সময় তাঁর মঞ্চে থাকত কেন্দ্রস্থিত একটি বেদি এবং অভিনেতারা দর্শকের ভূমিকা পালন করতেন। কোনও নাটকের ক্ষেত্রে তিনি একাধিক মঞ্চ তৈরি করে দর্শকদের মূল ঘটনার মধ্যে টেনে আনতেন। দর্শকও নাট্য-ঘটনায় অংশগ্রহণ করতেন। ১৯৬১-তে এক সাক্ষাৎকারে ওখলোপকভ বলেছিলেন, 'আমি এখনও দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে পরিপূর্ণ মিথস্ক্রিয়ার উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

নাট্যক্রিয়াকে নিরবচ্ছিন্ন, অবিরাম গতিসম্পন্ন এবং কোনও বিশেষ এফেক্ট সৃষ্টির জন্য তিনি মঞ্চে প্রথম 'মনতাজ'-এর প্রয়োগ করেন। এই টেকনিকটি রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ চিত্রপরিচালক সের্গেই মিখাইলোভিচ আইজেনস্টাইন (১৮৯৮-১৯৪৮) ১৯২৫-এ 'দ্য ব্যাটেলশিপ পোটেমকিন' ছবিটিতে প্রথম ব্যবহার করেন। 'মনতাজ' কথাটি কল-কারখানায় ব্যবহৃত একটি টেকনিক্যাল শব্দ, যার অর্থ 'একত্রীকরণ'। চলচ্চিত্রে 'মনতাজ' একটি শিল্পকৌশল। চলচ্চিত্র সম্পাদনার সময় দৃশ্য বা দৃশ্যাংশ গ্রথিত করে একটি বিশেষ ভাবনা বা ব্যঞ্জনা সৃষ্টির নাম 'মনতাজ'। দৃষ্টিগ্রাহ্য অনুভূতি থেকে বুদ্ধিগ্রাহ্য অনুভূতিতে পৌঁছবার জন্য যদি পরপর দুটি বা তিনটি দৃশ্য সাজিয়ে দেওয়া হয় বা 'কাট' করে দেখানো হয়, তবে একটি মনস্তাত্ত্বিক অভিঘাত সৃষ্টি করা যায়। এই কৌশলটি বিজ্ঞাপন, স্টিল ও ভিডিও ফোটোগ্রাফিতেও ব্যবহৃত হয়।

নাটকের পরিবেশ সৃষ্টিতে ওখলোপকভ ব্যাপকভাবে সংগীতের ব্যবহার করেছেন। ১৯৪৩-এ প্রকাশিত ভ্যান গাইসেঘেমের 'থিয়েটার ইন সোভিয়েত রাশিয়া' বইটিতে ওখলোপকভের পরিচালনা সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য পাওয়া যায়।

রাশিয়ান নাট্যকার আলেকজান্দার অ্যাফিনোজেনভ (১৯০৪-১৯৪১) সোস্যালিস্ট রিয়ালিজমের প্রচার করেছিলেন। তিনি ১৯২২ থেকে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ছিলেন। প্রলেটকাল্ট থিয়েটার তাঁর 'রবার্ট টিম' (১৯২৩), 'দ্য আদার সাইড অব দ্য স্লট' (১৯২৬), 'অ্যাট দ্য ব্রেকিং পয়েন্ট' (১৯২৭), কিপ ইয়োর আইজ পিলড' (১৯২৭) ও 'র‍্যাসবেরি জ্যাম' (১৯২৮) নাটকগুলি

প্রযোজনা করে। এই থিয়েটারে অ্যাফিনোজেনভ ম্যানেজার ও পরিচালক হিসেবে কাজ করতেন। ১৯২৮-এ তিনি সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে রাশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব প্রলেতারিয়ান রাইটার্সে যোগ দেন। এখানে ১৯৩১ সালে তিনি নাট্যশিল্পের ওপর দুখানি গ্রন্থ লেখেন : 'দ্য ক্রিয়েটিভ মেথড অব থিয়েটার' এবং 'দ্য ডায়েলেকটিক্স অব দ্য ক্রিয়েটিভ প্রসেস'। ১৯২৯-এ 'দ্য একসেনট্রিক' নাটকে তিনি কমিউনিস্টদের ভিলেন সাজিয়েছেন। স্তানিস্লাভস্কি তাঁর মস্কো আর্ট থিয়েটারে অ্যাফিনোজেনভের শ্রেষ্ঠ নাটক : 'ফিয়ার' (১৯৩১) মঞ্চস্থ করেন। অ্যাফিনোজেনভের অন্যান্য নাটক : 'ডিসট্যান্ট পয়েন্ট' (১৯৩৫), 'হেইল, স্পেইন!' (১৯৩৬) এবং 'ম্যাশেনকা' (১৯৪০)।

আদর্শবাদী নাটকের পরিবর্তে ক্রমাগত সাইকোলজিকাল রিয়ালিজমের দিকে তাঁর ঝোঁকের জন্য ১৯৩৭-এ অ্যাফিনোজেনভের পার্টি সভ্যপদ কেড়ে নেওয়া হয়। ১৯৩৮-এ অবশ্য আবার তাঁকে পার্টির সভ্যপদ দেওয়া হয়।

রাশিয়ান নাট্যকার ভ্লাদিমির বলেওতেসারকোভস্কির (১৮৮৪-১৯৭০) বীরোচিত কমিউনিজম ও ক্ষয়শীল ক্যাপিটালিজমের প্রচারমূলক গল্পগুলি অনেক নাটকীয় কাহিনী। সোস্যালিস্ট রিয়ালিজমের গঠনে সাহায্য করেছিল। তিনি সোভিয়েত নাটকগুলিকেও রাজনৈতিক করে তুলেছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক : 'বেফস্টিলবেয়ার' (১৯২০), 'স্টেজেস' (১৯২১), 'ইকো' (১৯২২), 'স্টিয়ার টু দ্য লেফট' (১৯২৬)। সিভিল ওয়ারের ওপর তাঁর ক্লাসিক নাটক : 'স্টর্ম' (১৯২৪)।

থিয়েটার অব ফ্যান্টাসটিক রিয়ালিজম

'বাস্তবের রিয়ালিজম আর মঞ্চের রিয়ালিজমের মধ্যে তফাত আছে। থিয়েটারের নিজস্ব বাস্তবতা, নিজস্ব সত্য আছে। মঞ্চের রিয়ালিজম সব কিছুই জীবন থেকে গ্রহণ করে না। একটা দৃশ্যকে উপস্থিত করার জন্য যতটুকু তার প্রয়োজন, শুধু ততটুকুই সে জীবন থেকে গ্রহণ করে। অন্যদিকে, থিয়েটারে রিয়ালিজমকে প্রকাশ করার যে ফর্ম, তা ব্যক্তির ফ্যান্ট্যাসি বা কল্পনার ফসল। ব্যক্তি-কল্পনাই থিয়েটারে রূপসৃষ্টি করে। আমি তাই থিয়েটারকে 'ফ্যান্টাসটিক রিয়ালিজম' বলি।'

—*ভাখতানগভ*

'স্বাভাবিক অভিনয় মানে আমরা দৈনন্দিন জীবনে যেভাবে কথা বলি, সেভাবে কথা বলা নয়। যেভাবে আচরণ করি, সেভাবে আচরণ করা নয়। অভিনয়ে স্বাভাবিকত্ব বলতে বোঝায়, যে চরিত্র আমরা অভিনয় করছি, সেই চরিত্রের সমস্ত বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা।' —*ভাখতানগভ*

'প্রায় ক্ষেত্রে দেখা যায়, অভিনেতারা মঞ্চে এসে দর্শকের উপস্থিতির কথাটা জোর করে ভুলতে চান। তিনি ভাবতে শুরু করেন, 'আমি একা, আমার সামনে কেউ নেই, দর্শক নেই, ইত্যাদি।' এটি ভুল পদ্ধতি।'

—*ভাখতানগভ*

'থিয়েটারে দু'ধরনের অভিনেতা আছেন। একদল মঞ্চভীরু। আর একদল অতি-উৎসাহী। প্রথমোক্ত দল নিজেকে গুটিয়ে রাখেন। দ্বিতীয় দল মনে করেন, মঞ্চে উঠে তাঁরা যা করবেন, সেটাই অভিনয়। বলা বাহুল্য, দু-দলই ভুল করেন।' —*ভাখতানগভ*

'নিজেকে ভালোবাসা, নিজেকে প্রদর্শন করার ইচ্ছে বর্জন না করলে অভিনেতা হওয়া সম্ভব নয়।' —*ভাখতানগভ*

'শিল্প সর্বোচ্চ পরিষেবা। শিল্প কখনই একটি দল বা একটি বিচ্ছিন্ন

মানুষের দখলে থাকা উচিত নয়। এটি জনগণের অধিকার।'

—ভাখতানগভ

- 'শিল্পের সেবা মানে জনগণের সেবা। শিল্পী কোনও দলের মূল্যবান অধিকৃত-বস্তু নয়। তিনি জনগণের মূল্যবান সম্পত্তি। —ভাখতানগভ

॥ ১ ॥

ইউজিন ব্যাগরাতিওনোভিচ ভাখতানগভ (১৮৮৩-১৯২৩) সোভিয়েত অভিনেতা, পরিচালক ও নাট্যশিক্ষক। জন্ম আমেরিকায়। মস্কো ইউনিভার্সিটিতে আইন পড়তেন। এ. আই. আদাশেভের নাট্যবিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং লিওপোলদ সুলারঝিতস্কির কাছে শিক্ষালাভ করেন। ১৯১১-তে মস্কো আর্ট থিয়েটারে (ম্যাট) অভিনেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। এখানে তিনি ৫০টিরও বেশি নাটকে অভিনয় করেন। মেতারলিংকের 'দ্য ব্লু বার্ড' নাটকের প্রযোজনায় তিনি সুলারঝিতস্কির সঙ্গে সহপরিচালক হিসেবে কাজ করেন। তিনি নেমিরোভিচ দানচেংকোর কাছে স্তানিস্লাভস্কির অভিনয়-পদ্ধতি শেখেন। এক সময় তিনি 'ম্যাট'-এর একজন অগ্রণী শিক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান। স্তানিস্লাভস্কি 'ম্যাট'-এর ফার্স্ট স্টুডিও তৈরি করে ভাখতানগভকে নবীন শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব দেন। 'ম্যাট'-এর ফার্স্ট ও সেকেন্ড স্টুডিও ছাড়াও ভাখতানগভ আরও ১৪টি থিয়েটার ও স্টুডিওতে শিক্ষকতা করেন। নাটক পরিচালনা করেন।

১৯১৪-তে স্তানিস্লাভস্কি 'ম্যাট'-এর থার্ড স্টুডিওটি ভাখতানগভকে স্বাধীনভাবে পরিচালনা করতে দেন। ১৯২২-এ থার্ড স্টুডিওর দায়িত্বে থাকার সময় ভাখতানগভ শেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটকের একটি সুন্দর প্রযোজনা উপহার দেন। নিজে ম্যাকবেথের ভূমিকায় অভিনয় করেন। ১৯২৬-এর পর এই থার্ড স্টুডিওটি 'ভাখতানগভ থিয়েটার' নামে চালু হয়। জীবিতাবস্থায় তাঁর নামাঙ্কিত এই থিয়েটার তাঁর মৃত্যুর পর এখনও চলছে। রাশিয়ার বিশিষ্ট নাট্যকার পেগোদিনের অনেক নাটক প্রথম এই থিয়েটারেই মঞ্চস্থ হয়েছে। অভিনেতা ওখলোপকভ 'হ্যামলেট' ও শ্চুকিন 'লেনিন'-এর পার্ট করে বিখ্যাত হয়েছেন এই থিয়েটারেই অভিনয় করেই। পোগোদিনের 'দ্য ম্যান উইথ দ্য গান' (১৯৩৭), আরবুজভের 'সিটি অ্যাট ডন' (১৯৫৭) এবং 'মিডনাইট'-এর (১৯৬০) মতো নাটক এই থিয়েটারে অভিনীত হয়েছে।

প্রথমদিকে ভাখতানগভ স্তানিস্লাভস্কি-প্রবর্তিত 'স্পিরিচুয়াল রিয়ালিজম'-এ বিশ্বাস করতেন। বস্তুত, স্তানিস্লাভস্কির তত্ত্বকে নিয়ে তিনি বাড়াবাড়িও

করেছিলেন। ১৯১৮-তে 'রোজমারশোলম' নাটকটি পরিচালনা করার সময় তিনি অভিনেতাদের 'ট্রান্স-অ্যাকটিং' বা আমরা যাকে বলি 'ভাববিহ্বল অভিনয়' বা চরিত্রের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া, তাই করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই অভিনয় দেখে স্তানিস্লাভস্কি বিশেষ নিন্দা করেন। এই ঘটনার পর থেকে ভাখতানগভ তাঁর বিশ্বাস থেকে ধীরে ধীরে সরে আসতে থাকেন। তিনি লিখলেন, 'বাস্তবের রিয়ালিজম আর মঞ্চের রিয়ালিজমের মধ্যে তফাত আছে। থিয়েটারের নিজস্ব বাস্তবতা, নিজস্ব সত্য আছে। মঞ্চের রিয়ালিজম সব কিছুই জীবন থেকে গ্রহণ করে না। একটা দৃশ্যকে উপস্থিত করার জন্য যতটুকু তার প্রয়োজন, শুধু ততটুকুই সে জীবন থেকে গ্রহণ করে। অন্যদিকে, থিয়েটারে রিয়ালিজমকে প্রকাশ করার যে 'ফর্ম', তা ব্যক্তির ফ্যান্টাসি বা কল্পনার ফসল। ব্যক্তি-কল্পনাই থিয়েটারে রূপসৃষ্টি করে। আমি তাই থিয়েটারকে, 'ফ্যান্টাসটিক রিয়ালিজম' বলি।'

ভাখতানগভ মেয়ারহোলদের প্রযোজনা দেখে খুবই প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। তাঁর ডায়েরিতে তিনি লিখেছিলেন, 'মেয়ারহোলদের প্রত্যেকটি প্রযোজনাই এক একটি নতুন থিয়েটার। প্রত্যেকটির মধ্যে এক একটি নতুন দিক আছে।' তবে তিনি এও লিখেছিলেন, 'মেয়ারহোলদ শুধুমাত্র পুরোনোকে ধ্বংস করার ইচ্ছেতেই নতুনের সৃষ্টি করতেন এবং এই কারণে প্রায়ই তাঁর আরোপিত ফর্ম বিষয়াশ্রয়ী হয়নি।'

মেয়ারহোলদ মূল নাটকে ভাঙতেন, বদলাতেন। তাঁর কিছু প্রযোজনা আসল নাটকের বক্তব্যের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল। ভাখতানগভ মূল নাটকের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন, তার সম্ভাব্য প্রকাশে ধ্যান দিতেন। মেয়ারহোলদ নাটকের শুধু সামাজিক বিষয়বস্তু উন্মোচন করতেন। ভাখতানগভ নাটকের সমস্ত দিক উদঘাটন করতেন। মেয়ারহোলদের প্রযোজনা ছিল মূল নাটকের ভগ্নাংশ বা বিষয়ের বিপরীত চিন্তা। ভাখতানগভের প্রযোজনা ছিল সর্বাঙ্গসুন্দর, মূলানুসারী, নাট্যকারের প্রতি বিশ্বস্ত। মেয়ারহোলদ মনে করতেন, 'আমাদের ঘৃণাকে প্রকাশ করতে হবে।' ভাখতানগভ বলতেন, 'জীবনের প্রতি আমাদের মনোভাবকে প্রকাশ করতে হবে।'

ভাখতানগভ বিশ্বাস করতেন, থিয়েটারে আটশ'র বেশি দর্শকাসন থাকা উচিত নয়। কারণ অভিনেতা যত প্রতিভাবান ও সুদক্ষ হোন না কেন, একসঙ্গে তিনি আটশ'র বেশি দর্শকের মনকে আকৃষ্ট করতে পারেন না। তাঁর মতে থিয়েটারে সার্কল, বক্স ইত্যাদির ব্যবস্থা না থাকাই শ্রেয়। অ্যাম্ফি থিয়েটারই ভালো রঙ্গালয়ের আদর্শ।

ভাখতানগভের 'ফ্যান্টাসটিক রিয়ালিজম'-এর চারটি বিখ্যাত প্রযোজনা : মেতারলিংকের 'দ্য মিরাকল অব সেন্ট অ্যানথনি' (১৯২১), স্ট্রিন্ডবার্গের 'এরিক ফোর', অ্যানস্কির 'দ্য ডাইবাক' (১৯২২) ও গোজির 'টুর‍্যানডট' (১৯২২)।

ভাখতানগভ মেতারলিংকের 'দ্য মিরাকল অব সেন্ট অ্যানথনি' নাটকটির অভিনয় দিয়ে ১৯২১-এ থার্ড স্টুডিও-র উদ্বোধন করেন। ফরাসি বুর্জোয়াদের ব্যঙ্গ করার জন্য তিনি অদ্ভুত মেক-আপ ও অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার করেন।

১৯২২-এ ফার্স্ট স্টুডিওতে ভাখতানগভ স্ট্রিন্ডবার্গের 'এরিক ফোর' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। বিখ্যাত অভিনেতা মাইকেল চেকভ পাগল রাজার অভিনয় করেছিলেন। রাজার অস্থির মনের অবস্থা বোঝানোর জন্য ভাখতানগভ সিংহাসন-ঘরের সোনার গয়নাগুলিতে মরচে রং দিলেন। স্তম্ভগুলি বেঁকিয়ে দিলেন। সিঁড়ি ও পথগুলিকে সর্পিল করে দিলেন। রাজার খেয়ালিপনা বোঝাতে দৃশ্যপটেও অবাস্তবতার ছাপ আনলেন। সভাসদগণ পুতুল ও ভূতের পোশাক পরলেন। সাধারণ মানুষরা রিয়ালিস্টিক পোশাক পড়লেন।

ভাখতানগভের আর একটি সুন্দর প্রযোজনা স্নোয়নি অ্যানস্কির নাটক 'দ্য ডাইবাক'। এই প্রযোজনাটি ছিল অতি সূক্ষ্ম তারে বোনা। নাটকের রহস্যময় বিষয়ের উপযোগী একটি বিশেষ শৈলী অনুসরণ করা হয়েছিল। মস্কোর হাবিমা থিয়েটার স্টুডিওতে ১৯২২-এর ৩১ জানুয়ারি যখন নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়, তখন সমালোচকরা উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখলেন, 'এই প্রযোজনায় অভিনেতারা প্রত্যেকটি হাতের ভঙ্গি, স্বরভঙ্গি, পদক্ষেপ ও দেহভঙ্গি, এত সানুপুঙ্খভাবে ও কারিগরি দক্ষতায় উপস্থিত করেছেন যে এর থেকে সর্বোত্তম সৃষ্টি অন্য কিছু হতে পারে না। ইংরেজ পরিচালক টাইরন গুথরি তাঁর আত্মজীবনী 'আ লাইফ ইন দ্য থিয়েটার' গ্রন্থে লিখেছেন, 'আজ পর্যন্ত এত উত্তেজক প্রযোজনা আমি আর দেখিনি।'

১৯২২-এ থার্ড স্টুডিওতে ভাখতানগভের শেষ প্রযোজনা কার্লো গোজির 'টুর‍্যানডট'। নাটকটি ১৭৬২-র একটি চীনা ট্র্যাজি-কমিকাল রূপকথার ওপর ভিত্তি করে রচিত। রানি টুর‍্যানডটের তিনটি ধাঁধাঁ নিয়ে এই নাটকের কাহিনি। রানির পাণিপ্রার্থীদের এই ধাঁধাঁ তিনটির উত্তর দিতে হবে। উত্তর দিতে না পারলে মাথা কাটা যাবে। রূপকথার মতোই রাজপুত্র কালাফ তিনটি ধাঁধাঁর উত্তর দিল। তাঁর মাথা বাঁচল ও সে রানিকে বিয়ে করল। এই নাটকের প্রথম মহড়াতেই ভাখতানগভ ঘোষণা করলেন, 'স্ফূর্তি নিয়ে অভিনয় করো। আমাদের যদি হাসিখুশি মেজাজটাই না থাকে, আমরা যদি দর্শকদের আত্মহারাই করতে না পারি,

তাহলে আমাদের কাজটাই অর্থহীন হয়ে যাবে। এসো, আমরা আমাদের যৌবন, হাসি ও ইম্প্রোভাইজেশনের সাহায্যে দর্শকদের আত্মহারা করে দিই।' এই নাটকের প্রথম মহড়া থেকেই ভাখতানগভের নির্দেশমতো অভিনেতারা গবেষণা শুরু করলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রত্যেকটি শব্দ, দেহভঙ্গি ও স্বরক্ষেপ সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত হচ্ছে, মনে হচ্ছে স্বতোৎসারিত, ততক্ষণ অভিনেতারা অনুশীলন করলেন। রাত ১১টা থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত মহড়া চলত।

কিউবিস্ট চিত্রশিল্পী আই. নিভিনস্কি প্রযোজনাটির নকশা করেছিলেন। তিনি মেয়ারহোলদের মতো পাটাতন, সেতু এবং গ্যালারি দিয়ে মঞ্চ সাজিয়েছিলেন। অভিনেতারা প্যান্টালুন, ট্রুফালডিনো, টারটাগলিয়া ইত্যাদি কমেদিয়া দেল আর্তের চরিত্রদের মতো মেক-আপ নিয়েছিলেন। তাঁরা তোয়ালে দিয়ে পাগড়ি, স্কার্ফ দিয়ে দড়ি, ল্যাম্পশেড দিয়ে রাজার টুপি ও শাল দিয়ে জামা বানিয়েছিলেন। নাটকের শুরুতে অভিনেতারা যবনিকার সামনে সাধারণ পোশাকে এসে দাঁড়াতেন। দর্শকদের বলতেন, তাঁরা কী দেখতে চলেছেন। যবনিকা উঠলে সংগীতের সঙ্গে তাল রেখে তাঁরা মঞ্চে রাখা পোশাক পরতেন, মেক-আপ নিতেন। মঞ্চ কর্মীরা নীল রঙের কিমানো ও টুপি পরে মঞ্চ তৈরি করতেন।

১৯২২-এ বাজির প্রদর্শনীর মতো মস্কোতে প্রযোজনাটি বিস্ফোরণ ঘটালো। মস্কোর সেই দুর্দিনে যখন খাদ্য, উষ্ণতা ও দ্রব্যের জন্য হাহাকার চলছে, দারিদ্র্য, ক্লেশ ও অত্যন্ত ঠান্ডায় রাশিয়ার মানুষ মূহ্যমান, সেই সময় ভাখতানগভের এই নাটক আনন্দের এক চরম অভিজ্ঞতা নিয়ে এল। প্রাণোচ্ছল এই নাটকটি ১০০০ রজনী অভিনীত হয়েছিল। এই নাটকের প্রথম অভিনয়-রজনী শেষে স্তানিস্লাভস্কি ভাখতানগভকে বলেছিলেন, 'তোমার সাফল্য অসাধারণ'। অভিনেতাদের বলেছিলেন, 'মস্কো আর্ট থিয়েটারের ইতিহাসে এইরকম সফল প্রযোজনা খুব কম হয়েছে। তোমরা এমন জিনিস পেয়েছ ও দেখিয়েছ যা অনেক থিয়েটার বহুকাল ধরে চেষ্টা করেও পারেনি।' ১৯৩৪-এ রাশিয়া সফর করতে এসে আমেরিকার বিখ্যাত নাট্য-পরিচালক হ্যারল্ড ক্লারম্যান, স্টেলা অ্যাডলার এবং আমেরিকার গ্রুপ থিয়েটার নাট্যদলের সভ্যরা এই নাটকটি দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। তাঁরা এমন অভিমতও দিয়েছিলেন যে, ভাখতানগভের হাতে পড়ে স্তানিস্লাভস্কির অভিনয়-পদ্ধতি (যা 'মেথড' বা 'সিস্টেম' নামে পরিচিত) অনেক উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়েছে।

॥ ৩॥

ভাখতানগভ তাঁর অভিনেতাদের বলতেন, 'অ্যাকশনের ভিতর দিয়ে চরিত্রের

চিন্তা ও অনুভবের বহিঃরূপ প্রকাশ করাই সহজ ও সঠিক পদ্ধতি।' এই জন্য অভিনয় শিক্ষায় তিনি 'এতুদ' পদ্ধতির ওপর জোর দিতেন। 'এতুদ' একটি ফরাসি শব্দ। অর্থ 'অনুশীলন'। যন্ত্রসংগীতে, বিশেষ করে পিয়ানোতে বিশেষ শিক্ষণ বা শৈলী প্রদর্শনের জন্য রচিত সংগীতকে 'এতুদ' বলে। মূলত অনুশীলনের জন্য রচিত হলেও অনেকের কম্পোজিশন অনেক সময় শিল্পোত্তীর্ণ হয়েছে। শোঁপার এই জাতীয় প্রায় ২৭টি 'এতুদ' শিল্পমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছে।

নাটকে 'এতুদ' হল কতকগুলি ছোট ছোট কাহিনি বা নাট্য-মুহূর্তের 'অ্যাকশন' আবিষ্কার। এই অ্যাকশন থেকে ধীরে ধীরে আবেগের সূত্রপাত হয়। কার্যত, 'এতুদ'-এর অনুশীলনে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই অভিনেতার আবেগ এসে যায়। এই 'এতুদ' অভিনয় শিক্ষার্থীর প্রাথমিক পর্যায়ের প্রথম পাঠ, অবশ্য শিক্ষণীয়। 'এতুদ'-এর অভিনয় নাটকের কোনও একটি দৃশ্যের অভিনয়ের চেয়ে কম শক্ত কাজ নয়। তিন মিনিটের একটি 'এতুদ' তৈরি করতে একঘন্টা সময় লাগে। মহলায় অভিনেতাদের মধ্যে উদ্ভাবনী তাড়না তৈরি করার জন্য এবং চরিত্র ও ঘটনার সঙ্গে অভিনেতাদের নিজেদের অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করার জন্য ভাখতানগভ অনেক 'এতুদ' তৈরি করতেন। যেমন, একটি 'এতুদ'. 'আমার ভাই মুমূর্ষু। টেলিগ্রাম পেয়ে মা এসেছেন। আমার এই মৃত্যুপথযাত্রী ভাইকে তিনি প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসেন। কিন্তু তিনি আমার ভাইয়েব অন্তিম অবস্থার কথা জানেন না। এইরকম এক সংকটজনক, জটিল মুহূর্তে আমি আকুল ভাবনায় থইহারা। মা যখন ভাইয়ের ব্যাপারটা জানতে পারবেন, তখন কী হবে এই ভাবনায় ...।' আর একটি 'এতুদ' : 'পাশের ঘরে আদালতের বিচার চলছে। আমি উন্মুখ আগ্রহে দাঁড়িয়ে আছি হাকিমের রায় শোনার জন্য ....।' অথবা, 'ঘরের কোণে একটি স্টোভ বা ফায়ারপ্লেস বা ওই জাতীয় কিছু আছে। আমরা ওটাকে জ্বালাব এবং কিছু চিঠিপত্র বা কাগজ পোড়াব।'

ভাখতানগভ তাঁর অভিনেতাদের বলতেন, 'কখনও অন্বেষণ বন্ধ কোরো না। মনে রেখো, শিল্প হল অন্বেষণ, চূড়ান্ত রূপ নয়। কোনও অভিনেতা মহড়ায় ভালো কিছু আবিষ্কার করলে তিনি আরও ভালোর অন্বেষণ করবেন। এমনকি নাটকের উদ্বোধন-রজনী অভিনয়ের পরেও এই অন্বেষণ ও আবিষ্কার চলতেই থাকবে।'

ভাখতানগভ তাঁর অভিনেতাদের দক্ষ ইম্প্রোভাইজার হতে বললেন। গান, নাচ ও সাংগীতিক কমেডির দক্ষ কারিগর হতে বললেন। তিনি তাঁর অভিনেতাদের কাছে চাইলেন আনন্দ, স্ফূর্তি, প্রাণচঞ্চলতা।

ভাখতানগভের নিয়মানুবর্তিতা এতই কঠোর ছিল যে, অভিনেতারা তাঁকে ভীষণ ভয় পেতেন। তিনি স্টুডিওতে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ সব স্তব্ধ হয়ে

যেত। তিনি যেমন অভিনেতাদের প্রশংসায় মহোল্লাস করতেন, তেমনই তীব্র সমালোচনায় তাঁদের চোখের জল বের করে দিতেন।

ভাখতানগভ বলতেন, 'স্বাভাবিক অভিনয় মানে আমরা দৈনন্দিন জীবনে যেভাবে কথা বলি, সেভাবে কথা বলা নয়। যেভাবে আচরণ করি, সেভাবে আচরণ করা নয়। অভিনয়ের স্বাভাবিকত্ব বলতে বোঝায়, যে চরিত্র আমরা অভিনয় করছি. সেই চরিত্রের সমস্ত বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা।' অথচ অভিনয় করতে হবে মনে হলেই অভিনেতার মনে কেমন যেন সব কিছুকেই বাড়াবাড়ি করার ঝোঁক চেপে বসে। এর ফলে বহু পরিশ্রম সত্ত্বেও ভালো অভিনয় তিনি কিছুতেই করতে পারেন না।'

ভাখতানগভ এই 'স্বাভাবিকত্ব' আনার জন্য সমবেত নাচের ব্যবস্থা করতেন। তিনি যেভাবে অনুশীলনীটি করাতেন সেটি তাঁর একজন ছাত্রের ডায়েরি থেকে তুলে দেওয়া হল : 'একটি নাচের বাজনা বাজতে থাকল। আমরা সেই বাজনার সঙ্গো নাচতে শুরু করলাম। ভাখতানগভ বলতে থাকলেন, 'নাচো। নাচো। শুধু মঞ্চে কেন? বাইরে এসো। সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে নাচতে নাচতে আবার মঞ্চের দিকে যাও .... বিরামহীন, বিশ্রামহীন। একঘন্টা নাচার পর ভাখতানগভ আমাদের থামার ইঙ্গিত দিলেন। আমরা থামলাম। উনি বললেন, 'আমি ঘন্টা বাজানোর সঙ্গো সঙ্গো তোমরা ওইভাবে থামবে, কিন্তু যতক্ষণ থেমে থাকবে, ততক্ষণ তোমাদের ডান ও বাঁদিকে এমনভাবে তাকাবে, যাতে মনে হয়, তোমরা যা দেখছ— লোকজন. জিনিসপত্র. এই ঘর. আমি— এসব যেন সত্যি নয়, স্বপ্নমাত্র। যেন সব মায়া— মরীচিকা। বুঝলে? নাও, আবার শুরু করো।' শ্রান্ত, ক্লান্ত দেহে আমরা আবার নাচতে লাগলাম। ঘন্টাধ্বনি হল। আমরা থামলাম।'

ভাখতানগভ লিখলেন, 'প্রায় ক্ষেত্রে দেখা যায়, অভিনেতারা মঞ্চে এসে দর্শকের উপস্থিতির কথাটা জোর করে ভুলতে চান। তিনি ভাবতে শুরু করেন 'আমি একা, আমার সামনে কেউ নেই, দর্শক নেই, ইত্যাদি। এটি ভুল পদ্ধতি। আপনার সামনে কোনও দর্শক নেই, একথা আপনি জোর করে ভাবতে যাবেন কেন, যখন আপনার তিন গজ দূরেই তাঁরা বসে আছেন, হাঁচছেন, কাশছেন, নিঃশ্বাস ফেলছেন, কথা বলছেন? আপনি তো তাঁদের জন্যই অভিনয় করছেন, নাকি? সুতরাং জোর করে দর্শককে ভোলার চেষ্টা করার কোনও অর্থ নেই।'

ভাখতানগভ লিখলেন, 'থিয়েটারে দু'ধরনের অভিনেতা আছেন। একদল মঞ্চভীরু। আর একদল অতি-উৎসাহী। প্রথমোক্ত দল নিজেকে গুটিয়ে রাখেন। দ্বিতীয় দল মনে করেন, মঞ্চে উঠে তাঁরা যা করবেন, সেটাই অভিনয়। মঞ্চটা

তাঁদের কাছে কিছুই না। বলা বাহুল্য, দু'দলই ভুল করেন। দ্বিতীয় দল কেবলমাত্র নিজেকে প্রদর্শন করতে চান। নিজেকে প্রদর্শনের আতিশয্যে এঁরা নাট্যকারকে উপেক্ষা করে যা খুশি সংলাপ বলেন, অতি-অভিনয় করে দর্শকের মনকে উৎপীড়িত করেন। তাঁরা কেবল নিজেদের ভালোবাসেন।' ভাখতানগভের উপদেশ, 'নিজেকে ভালোবাসা, নিজেকে প্রদর্শন করার ইচ্ছে বর্জন না করলে অভিনেতা হওয়া সম্ভব নয়।'

স্তানিস্লাভস্কি তাঁর থিয়েটার জীবনের প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে ভাখতানগভের এই পদ্ধতিগুলির সত্যতা ও যথার্থতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং তাঁর নিজের পদ্ধতিতে ('মেথড' বা 'সিস্টেম') অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, 'অ্যাকশনের ভেতর দিয়েই অভিনেতার অনুভব প্রকাশের চেষ্টা করা উচিত। ১৯৩৩-এ স্টেলা অ্যাডলার প্যারিসে স্তানিস্লাভস্কির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে স্তানিস্লাভস্কি তাঁকেও মঞ্চে চরিত্রসৃষ্টির জন্য 'আবেগ স্মৃতি' পুনঃস্মরণের পরিবর্তে দৈহিক ক্রিয়া বা অ্যাকশনের প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন। তিনি অ্যাডলারকে এমনও বললেন যে, মঞ্চ করা ও দেখানোর জায়গা— হওয়ার জায়গা নয়। এটি স্তানিস্লাভস্কির ওপর ভাখতানগভের প্রচণ্ড প্রভাব বলে মনে করা হয়। কারণ এই একটি মন্তব্যেই তিনি তাঁর এতদিনের ধারণা ও প্রত্যয় থেকে বিপরীত মেরুতে সরে এসেছিলেন।

থিয়েটার অব ভিশন

- 'নাটকে কাহিনি থাকা কি খুবই প্রয়োজনীয়? 'চরিত্র' থাকা কি খুবই দরকার? 'প্রতীক' থাকা কি বাধ্যতামূলক?'

—রবার্ট উইলসন

- 'আপনি যদি পৃথিবীর ঘূর্ণনের গতি বা ঋতুর পরিবর্তনের কথা ভাবেন, তবে আপনার কাছে আমার নাটককে ধীরগতিসম্পন্ন বলে মনে হবে না।'

—রবার্ট উইলসন

- 'রেলওয়ে স্টেশন বা সাবওয়ের দিকে তাকিয়ে দেখুন। অনেক মানুষ জড়ো হয়ে আছে। কিন্তু কেউ কারুর দিকে তাকাচ্ছে না। তারা নিজেদেরকে নিয়েই ব্যস্ত। নিজেদেরকে নিয়েই মশগুল। আমরা এমন একটা সমাজে বাস করছি যেখানে আমাদের জীবন দুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে। আমরা মিডিয়ার প্রচারে আক্রান্ত হচ্ছি। ভিড়ে-ঠাসা জনস্থানে আমরা আমাদের প্রকাশের জায়গাকে ভাগ করে নিতে বাধ্য হচ্ছি। এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা আমাদের গোপন চিন্তাশীল পৃথিবীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি। আমাদের পৃথিবীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি। আমাদের ব্যক্তিগত অস্তিত্বের কথা ভাবি।'

—রবার্ট উইলসন

- 'অভিনয় দেখতে দেখতে মনে হল, এক মূক-বধির পৃথিবীতে আছি। উইলসনের পড়া, বাচনিক উচ্চারণ, উচ্চারিত চিন্তা, পদ সাজানোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা, মাইক্রোফোনের মাধ্যমে কথা বলা, অ্যামপ্লিফায়ারের মাধ্যমে শব্দের বৈদ্যুতিন আকার বদলানো ও সংবাদ প্রেরিত হওয়া— এই বাচনিক চিহ্নগুলি উদ্ধৃতির মতো হয়ে গেল। ভাষার দেওয়াল টপকিয়ে গেল।'

—ডিক

॥ ১ ॥

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সংকটের পটভূমিতে প্যারিসে শিল্প-সাহিত্যে, থিয়েটারে-চলচ্চিত্রে 'সুররিয়ালিজম' আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯২৪-এ ফরাসি কবি ও শিল্পতাত্ত্বিক আন্দ্রে ব্রেতোঁ তাঁর প্রকাশিত 'সুরলিয়ালিস্ত ম্যানিফেস্তো'-তে সুররিয়ালিজম তত্ত্ব প্রকাশ করেন। জাঁ ককতোর মতো লেখক ও নাট্যকার, লুই আরাগঁর মতো বামপন্থী কবি, পাবলো পিকাশো, মাক্স আর্নস্ট, মান রে, সালভাদর দালির মতো চিত্রকর ছিলেন সুররিয়ালিস্ট; এঁরা ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। ফ্রয়েডের মতোই এঁরা বহির্জগতের বাস্তবতার চেয়ে স্বপ্ন ও ফ্যান্টাসির পৃথিবীকে বেশি মূল্য দিতেন। ফ্রয়েডের মতোই এঁরা বিশ্বাস করতেন, চেতন মনের চেয়ে অবচেতন মন বাস্তব সত্তাকে অনেক বেশি প্রকাশ করে। মানব আচরণ সম্পর্কে ফ্রয়েডের ব্যাখ্যাকে ভিত্তি করে এঁরা বললেন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ ব্যক্তি-মানুষকে আঘাত করে, তাকে বিপর্যস্ত, বিভ্রান্ত ও বিপন্ন করে। তার একান্ত ঈপ্সাগুলিকে অবনমন করতে বাধ্য করে। কিন্তু মুশকিল হল, মানুষের সচেতন সামাজিক কর্ম থেকে আমরা কখনই বুঝতে পারি না, তার অন্তরতম সত্তা জগতকে কীভাবে গ্রহণ করে। একমাত্র স্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন, দিবাস্বপ্ন ইত্যাদি অসচেতন ও অসকর্মক স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ থেকেই আমরা জানতে পারি, ব্যক্তি বহির্জগতকে কীভাবে অন্তরে গ্রহণ করে। তাই সুররিয়ালিস্টিরা কাল্পনিক প্রতিমূর্তি ও রূপকের সাহায্যে স্বপ্নের মতো পরিবেশ সৃষ্টি করেন।

আমেরিকান নাট্য-পরিচালক রবার্ট উইলসনকে (১৯৪১) ফরাসি সুররিয়ালিস্ট কবি, ঔপন্যাসিক ও কমিউনিস্ট লুই আরাগঁ (১৮৯৭-১৯৬৯) সুররিয়ালিস্টদের আধুনিক উত্তরসূরি বলে ঘোষণা করেছেন। উইলসন নিজেকে গারট্রুড স্টেইনের মন্ত্রশিষ্য বলেন। তাঁর পরিচালনায় সংগীতজ্ঞ জন কেইজের বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। বিশ শতকের আটের ও নয়ের দশকে ইউরোপে এক অভিনব নাট্যধারার উপস্থাপনার জন্য তিনি একজন শ্রেষ্ঠ 'অনুসন্ধানী পরিচালক' বলে চিহ্নিত হয়েছেন।

১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত আমেরিকায় উইলসনের প্রযোজনা : 'দ্য কিং অব স্পেন' (১৯৬৯), 'ডিফম্যান গ্ল্যানস' (১৯৭০), 'ওভারচিওর টু আ মাউন্টেইন' (১৯৭২), 'দ্য লাইফ অ্যান্ড টাইমস অব যোসেফ স্তালিন' (১৯৭৩), 'আ লেটার টু কুইন ভিক্টোরিয়া' (১৯৭৪), 'আইনস্টাইন অন দ্য বিচ' (১৯৭৬), 'আই ওয়াজ মিটিং অন মাই প্যাটিও দিস গাই অ্যাপিয়ার্ড আই থট আই ওয়াজ হ্যালুসিনেটিং' (১৯৭৭) ও 'ডেথ ডেসট্রাকসন অ্যান্ড ডেট্রয়েট'

(১৯৭৯)।

১৯৮০ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত ইউরোপে উইলসনের প্রযোজনা : 'দ্য ম্যান ইন দ্য রেইনকোট' (১৯৮১), 'দ্য সিভিল ওয়ারস : আ ট্রি ইজ বেস্ট মেজারড হোয়েন ইট ইজ ডাউন' (১৯৮১, পাঁচটি দেশে অভিনীত হয়), 'গ্রেট ডে ইন দ্য মর্নিং' (১৯৮২, প্যারিস), 'দ্য গোল্ডেন উইনডোর্স' (১৯৮২, মিউনিখ), 'হ্যামলেট মেসিন' (১৯৮৬), 'দ্য ব্ল্যাক রাইডার: দ্য কাস্টিং অব ম্যাজিক বুলেটস' (১৯৯০, হামবুর্গ) এবং 'ডক্টর ফাউস্টাস লাইটস দ্য লাইটস' (১৯৯৪)।

॥ ২॥

উইলসন একসময় বাকশক্তির সমস্যায় পড়েছিলেন। এক নৃত্যশিল্পী তাঁর বাকশক্তির ত্রুটি সম্পূর্ণ সারিয়ে দিয়েছিলেন। কীভাবে অহেতুক উত্তেজনা থেকে মুক্ত হতে হয় তা শিখিয়েছিলেন। কীভাবে নিজস্ব মানসশক্তির উপর আস্থা রাখতে হয়, তার পথ দেখিয়েছিলেন। তারপর থেকেই যারা জন্মাবধি মনোবিকলনের শিকার, যাদের বাচনিক সংযোগের সাধারণ ক্ষমতাটুকুও নেই, সেইসব মস্তিষ্ক-নষ্ট ও মূক শিশুদের জয়যুক্তি ঘটাতে তিনি থিয়েটারকে 'থেরাপি' হিসেবে প্রয়োগ করেছেন। থিয়েটারের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দৈহিক সক্রিয়তা ঘটিয়ে তাদের মানসিক কার্যশীলতাকে উজ্জীবিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

উইলসন তাঁর ক্রিয়াকাণ্ডের নাম দিয়েছেন 'পারফরমেন্স পিস'। ১৯৬৩-তে তিনি প্রথম তাঁর এই নৃত্যমুখী নাট্যধারা মঞ্চস্থ করেন। তাঁর এই নাট্যধারায় সাধারণ প্লট ও প্রথাগত অভিনয়ের কোনও স্থান নেই। কোনও সাহিত্য-কাঠামো নেই। কোনও প্রতীকের ব্যবহারও নেই। তিনি বলেন, 'নাটকে 'কাহিনি' থাকা কি খুবই প্রয়োজনীয়? 'চরিত্র' থাকা কি খুব দরকার? 'প্রতীক' থাকা কি বাধ্যতামূলক?'

উইলসনের নাট্য-প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক কাজ হল, নাটকের 'দৃশ্যগ্রন্থ' রচনা করা। তিনি নিজে একজন প্রশিক্ষিত স্থপতি এবং চিত্রশিল্পী বলে এই পদ্ধতি রূপায়িত করতে তাঁর কোনও অসুবিধা হয় না। তিনি এই 'দৃশ্যগ্রন্থ' রচনায় রেকর্ডকৃত বিচ্ছিন্ন শব্দ বা শব্দের অংশ ব্যবহার করেন। এই পদ্ধতিকে তিনি বলেন 'অডিও স্কোর'। এরপর এই 'অডিও স্কোর'-কে তিনি স্বপ্ন-প্রতিরূপের মতো 'দৃশ্যরূপ' দেন। রুজ ইভানস বলেছেন, 'এই শব্দগুলির সঙ্গে বিশেষ কোনও অ্যাকশনের সম্পর্ক থাকে না। প্রত্যেকটি শব্দ পৃথকভাবে শোনানো হয়। দর্শকের ওপর নির্ভর করে তাঁরা কী শুনছেন। তাঁরাই ঠিক করেন এই 'অডিও স্কোর' শব্দ-বিশৃঙ্খলা, নাকি সুনিয়ন্ত্রিত শব্দ। রূপবন্ধ, নাকি রূপহীন। নাকি সম্পূর্ণ

অর্থহীন। সংগীতের মতো বিমূর্ত।

উইলসনের থিয়েটারের একটি বৈশিষ্ট্য হল নাট্য-উপস্থাপনায় 'মঞ্চ-প্রতিরূপ'-এর ব্যবহার। নাটকীয় ভাবনাকে দৃশ্যরূপের মাধ্যমে প্রতিস্থাপন। ব্যক্তিকে একাধিক পরিবর্তিত চিত্রকল্পে দেখা। এখানে ব্যক্তি যা করে তা নাটকের চরিত্রের অ্যাকশনের উপস্থাপনা হিসেবে দেখা হয় না। দৃশ্যসজ্জাও নাটকের দৃশ্যপটের বাস্তব প্রতিচিত্রণ নয়। বরং দর্শক সমগ্র নাট্য-প্রযোজনাকেই একটি প্রদর্শনী হিসেবে দেখেন। বাস্তবের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। এই প্রযোজনায় মঞ্চের পিছনের পর্দা ও মঞ্চপট একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন। এখানে পোশাক এবং আলো সুরারিয়ালিস্টিক তৈলচিত্রের মতো। কিছুটা বিমূর্ত। তৈলচিত্রের মতোই দর্শকের ওপর তার অভিঘাত তৈরি হয়। এই কারণে উইলসন প্রসেনিয়াম আর্চ থিয়েটার এবং প্রথাগত থিয়েটারের স্থাপত্যসহ বিশাল মঞ্চের পক্ষপাতী। তিনি চান, তাঁর প্রদর্শনী থেকে দর্শক দূরত্বে থাকুন। এতে দর্শক আত্ম-সচেতন হবেন না। বেশি আনন্দ পাবেন। এই পদ্ধতি উইলসনের একান্ত নিজস্ব শৈলী।

॥ ৩॥

১৯৬৭ সালে উইলসন 'বাইরড হফম্যান স্কুল অব বাইরড অ্যাট দ্য বাইরড' নামে একটি মঞ্চ স্থাপন করেন। এখানে কর্মশালার মাধ্যমে তিনি তাঁর থিয়েটারের ভাবনাগুলি বিকশিত করতে শুরু করেন। এই সময় তিনি পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদের নিয়ে 'সাইকোসোমাটিক থেরাপি' (মানসিক রোগের চিকিৎসা) নিয়ে একটি কর্মশালাও পরিচালনা করেন।

উইলসন তাঁর কর্মশালায় কয়েকটি অনুশীলনী দীর্ঘক্ষণ ধরে অনুশীলন করান। যেমন চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়ানো। ওপরে নিচে লাফানো। পিঠে পিঠ লাগিয়ে বসে সামনে পেছনে দৌড়ানো। ওপরে নিচে লাফানো। সামনে পিছনে দোলা। চোখ বন্ধ করে শুয়ে শ্বাস নেওয়া-ছাড়া। প্রত্যেকটি অনুশীলনই ধীরগতিতে বারবার করানো হয়। উইলসন এই অনুশীলনীগুলিকে কর্মশক্তি বাড়ানো ও জাগিয়ে তোলার অভ্যাস বলেছেন।

উইলসন তাঁর কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের নিজস্ব আবিষ্কৃত মুভমেন্টের তালিকা তৈরি করতে বলেন। তিনি চান, আত্ম-সচেতনতা মুক্ত হয়ে মানুষ মঞ্চে নিজেদের উপস্থিত করুক। উইলসনের এই পদ্ধতিটির 'থেরাপেটিক' মূল্য অপরিসীম।

১৯৬৮-তে উইলসন 'বাইরডস'-এর কর্মশালায় রেমন্ড অ্যানড্রু নামে এক মূক-বধির বালককে নিয়ে আসেন। তার ভাষা, ভঙ্গিমা, চলাফেরা, শব্দ উচ্চারণ

তিনি পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। তার সঙ্গে মেলামেশে করতে করতে তিনি আবিষ্কার করেন যে, সুস্থ মানুষ তার 'আউটার স্ক্রিন' বা পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে বহির্জগতের দৃশ্য ও শ্রাব্য উদ্দীপকগুলিকে অনুভব করে। পক্ষান্তরে, অন্ধ ও বধির মানুষ তার 'ইনার ভিজুয়াল স্ক্রিন' বা অন্তরিন্দ্রিয়ের পর্দায় সমস্ত দৃশ্য দেখতে পায়। সমস্ত শব্দ শুনতে পায়। ফলত, তাদের অন্তরিন্দ্রিয় সুস্থ মানুষদের চেয়ে অনেক বেশি প্রগাঢ় ও সবল হয়।

১৯৭১-এ অ্যানড্রুকে অনুসরণ করে উইলসন প্রায় সংলাপহীন দুটি নাটক 'ডিফম্যান গ্ল্যান্স' ও 'দ্য লাইফ অ্যান্ড টাইমস অব যোসেফ স্তালিন' মঞ্চস্থ করেন। নাটক দুটির প্রায় সবটাই প্রতিরূপ এবং নিঃশব্দের মধ্যে অভিনীত হয়। দুটি প্রযোজনাই অ্যানড্রুর দেওয়া মুভমেন্ট, ভঙ্গিমা এবং ড্রয়িংয়ের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়েছিল। নাট্য-সমালোচক ডিক উইলসন এই অভিনব নাট্যশৈলীর এক বর্ণনা দিয়েছেন : 'সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা একটি উঁচু প্লেক্সিগ্লাসের ওপর নাটকটির অভিনয় দেখছি। মঞ্চের একেবারে পিছনে একটি বাদামি রঙের দেওয়াল আছে। পাটাতনের ওপরে আপস্টেজের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে এক মহিলা। একটি ছোট বালক নিচু একটি টুলের ওপর বসে কমিক বই পড়ছে। একটি ছোট মেয়ে একটি সাদা চাদরের নিচে শুয়ে আছে। মঞ্চের বাঁ-দিকে সাদা চাদরে ঢাকা একটি টেবিল। টেবিলের ওপর একটি ছুরি, কালো গ্লাভস, এক বোতল দুধ ও একটি গ্লাস। মহিলা টেবিলের কাছে এল। যে লাল গ্লাভসটি সে পরেছিল, তার ওপর কালো গ্লাভস দু'টি পড়ল। গ্লাসে দুধ ঢালল। ছোট বালকটির কাছে গেল। তাকে সামান্য দুধ খাওয়ালো। টেবিলের কাছে ফিরে এল। ছুরিটি হাতে নিল। একটি কাপড়ে মুছে নিল। ছোট ছেলেটির দিকে এগিয়ে এল। ঠিক সেই মুহূর্তে একটি ছেলে প্রবেশ করল। মহিলা শিশুটিকে ছুরি মারল। ছেলেটি চিৎকার করে উঠল। মহিলা ছোট মেয়েটিকেও ছুরি মারল। ছেলেটি আবার কেঁদে উঠল। মহিলা তার দিকে এগিয়ে এল। তার একটি হাত ছেলেটির কপালে রাখল। ছেলেটি আবার কেঁদে উঠতে গেলে তার মুখের ওপর হাত চাপা দিয়ে দিল। খুবই ধীরগতিতে এই সমস্ত অ্যাকশন সংঘটিত হল। অভিব্যক্তিশূন্য, আবেগশূন্য অবস্থায় একঘন্টা ধরে ছকে-বাঁধা মুভমেন্টের সঙ্গে ঘটনাটি মঞ্চে ঘটে গেল।

পরিশেষে ডিক লিখেছেন, 'এই প্রযোজনায় সংলাপের অনুপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। অভিনয় দেখতে দেখতে মনে হল, এক মূক-বধির পৃথিবীতে আছি। উইলসনের পড়া, বাচনিক উচ্চারণ, উচ্চারিত চিন্তা, পদ সাজানোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা, মাইক্রোফোনের মাধ্যমে কথা বলা, অ্যামপ্লিফায়ারের মাধ্যমে শব্দের বৈদ্যুতিন আকার বদলানো ও সংবাদ প্রেরিত হওয়া— এই বাচনিক চিহ্নগুলি

উদ্ধৃতির মতো হয়ে গেল। ভাষার দেওয়াল টপকিয়ে গেল।'

এর কিছুদিন পর উইলসন ক্রিস্টোফার নোয়েলস নামে এক মস্তিষ্ক-বিনষ্ট বালকের সন্ধান পান। ডাক্তার-বিশেষজ্ঞদের রায়— এই বালক অক্ষমই থাকবে। যুক্তির শিলমোহর— বালকটি জড় মাংসপিণ্ড মাত্র। উইলসন ছেলেটিকে তাঁর 'বাইরডস'-এর কর্মশালায় যোগদান করতে আমন্ত্রণ জানান। সেখানে সে যেভাবে তার চিন্তাভাবনা প্রকাশ করে, তাতে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান। তিনি উপলব্ধি করেন, নোয়েলস বহিরিন্দ্রিয়ের চেয়ে অন্তরিন্দ্রিয়ের শব্দপুঞ্জ নিয়ে বেশি মগ্ন থাকে। তিনি এই পদ্ধতির নাম দিয়েছেন 'শব্দের চিত্রাঙ্কন'। তাঁর 'আ লেটার ফর কুইন ভিক্টোরিয়া' এবং 'দ্য ভ্যালু অব ম্যান' নাটক দুটির বেশির ভাগ সংলাপই লিখেছেন নোয়েলস। অনেক দৈহিক অনুশীলনও সে আবিষ্কার করেছে।

দীর্ঘদিন নোয়েলসের সঙ্গো থাকতে থাকতে উইলসন বুঝলেন, মনকে শরীরী বোধ থেকে উন্নততর কোনও বোধের দিকে নিয়ে যেতে পারলে তবেই মূক-বধির ও মস্তিষ্ক-বিনষ্টদের সংকট থেকে মুক্তির উপায় হতে পারে। এর কিছুদিন পরেই তিনি 'ওরেফট মেথড অব মিউজিক' যন্ত্রের পণ্ডিত অস্ট্রিয়ার এক অধ্যাপকের কাছে এবং সুইজারল্যান্ড থেকে আগত 'শেইলবর্ডিয়ার মেথড অব মিউজিক ফর দ্য হ্যানডিক্যাপড'-এ প্রশিক্ষণ নিয়ে উপলব্ধি করলেন, 'এই বিশেষ ক্ষেত্রে সংগীত এক বড় ভরসা, বড় অবলম্বন'। এই জগৎ-সংসারের সঙ্গো জনসংযোগের মাধ্যম হিসেবে সংগীতই তাদের একমাত্র সেতু। তিনি লক্ষ্য করলেন, যখন কোনও সংগীত তাদের মনকে খুশি করে, তারা মাথাটা একটু উঁচু করে সন্তর্পণে হাত জোর করে ওপর দিকে তাকায়। যেন সংগীতের সঙ্গো তারা পাখা মেলে উড়ে যেতে চায়।

আরও একটা ঘটনা ঘটল। এদের জীবন বদলাতে গিয়ে উইলসন নিজেও সম্পূর্ণ বদলে গেলেন। পাথরে ফুল ফোটাতে গিয়ে তিনি নিজেও ফুল হয়ে উঠলেন। তিনি উপলব্ধি করলেন, হিংসা-লোভ বা জয়-পরাজয় জীর্ণ পোশাক বই কিছু নয়। ভালোবাসা ও সৌন্দর্যের জন্য সমস্ত কিছু ত্যাগ করা যায়। অন্তর-মথিত জীবন-সংগ্রামে সেই সত্যই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। শরীরের দায় ও দাবির মধ্যে আবদ্ধ জীবন থেকে একটা মুক্তি এই জীবনেই পাওয়া সম্ভব। এরা তাকে 'মূক-ভাষায়' শিখিয়েছে, সচেতনভাবে জীবনধারণ কাকে বলে, কী তার মাধুর্য। তাদের বোঝার চেষ্টা না করলে উইলসনের নিজেকেও বোঝা হত না।

॥ ৪ ॥

উইলসনের 'থিয়েটার অব ভিশন'-এর লক্ষ্যই হল মঞ্চকে স্বপ্ন-রাজ্যে পরিণত

করা। লৌকিক পৃথিবীর পরিবর্তে কল্পনার পৃথিবী নির্মাণ করা। তাই তাঁর 'দ্য কিং অব স্পেন' নাটকের ড্রয়িংরুমে এক বিশাল যান্ত্রিক বিড়ালের পা শিকার অন্বেষণে ভ্রমণ করে। 'দ্য সিভিল ওয়ার : আ ট্রি ইজ বেস্ট মেজারড হোয়েন ইট ইজ ডাউন' নাটকে এক দৈত্যাকার আব্রাহাম লিঙ্কন বায়ুবাহিত হয়ে উড়ন্ত রেকাবির নিচে ধীরে সুস্থে পদব্রজে ভ্রমণ করে। অথবা 'দ্য লাইফ অ্যান্ড টাইমস অব যোসেফ স্তালিন' নাটকে গুহার মধ্যে হালকা পোশাক পরিহিত নায়ক চারপাশে বন্যপশুর দ্বারা বেষ্টিত হয়ে থাকে। 'ডিফম্যান গ্ল্যান্স' নাটকে চলমান চেয়ার দেখা যায়। 'আইনস্টাইন অন দ্য বিচ' নাটকে একটি বিরাট ট্রেন মঞ্চের এক পাশ থেকে আর এক পাশে দীর্ঘক্ষণ ধরে অতিক্রম করতে থাকে। 'ডেথ, ডেসট্রাকশন অ্যান্ড ডেট্রয়েড' নাটকে এক বিশাল হাতির শরীর একটি পাখা থেকে আবির্ভূত হয়। এই নাটকেই সাইক্লোরামায় নিচু থেকে ওপরের দিকে ৮০টি স্পটলাইট ফেলে আলোকরশ্মি দিয়ে একটি আলোর দেওয়াল তৈরি করা হয়। উইলসনের থিয়েটারে মানুষ ও বস্তু উড়ে যায়। দৈত্যরা মঞ্চের ওপর দিয়ে হাঁটে। আকাশযানগুলি স্বর্গের উদ্যানে ঘোরাফেরা করে। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার মধ্যে এগুলি পড়ে না। আমাদের চেনা-জানা পৃথিবী থেকে আমরা অন্য এক ব্যাখ্যাতীত পৃথিবীতে প্রবেশ করি। করতে বাধ্য হই। শেষদিকের নাট্যনির্মাণে উইলসন ব্যয়বহুল প্রযোজনা থেকে সরে এসে স্বল্প দৃশ্যপট ও আলোর ব্যবহার করেছেন। কিন্তু স্বল্প উপকরণ ও উপাদান দিয়েই তিনি সমান দৃশ্যচমক সৃষ্টি করেছেন।

মঞ্চ-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উইলসন 'ইলিউশন'-কে বেশি গুরুত্ব দেন। তাই তাঁর দৃশ্যপট পরিকল্পনায় ও নির্মাণে ইলিউশনের ব্যবহার বেশি ঘটে। খুব বড় জায়গা নিয়ে সাজানো বিস্তীর্ণ চক্রবালের সঙ্গে খোলা ল্যান্ডস্কেপ, তারাভরা আকাশ, আকাশচুম্বী স্থাপত্য, সুদৃশ্য অন্দরমহল— এইসব চটকদার দৃশ্যের সমারোহ থাকে তাঁর প্রত্যেকটি প্রযোজনায়। 'দ্য লাইফ অ্যান্ড টাইমস অব যোসেফ স্তালিন' নাটকে ৭টি অঙ্কের স্থানান্তর ঘটেছে সমুদ্রের বালুতট থেকে ড্রয়িংরুমে, গুহা-অরণ্য-মন্দিরের অভ্যন্তর থেকে শোবার ঘরে এবং পরিশেষে ছড়ানো আকাশে, গ্রহের সমাবেশে। 'দ্য কিং অব স্পেন' নাটকে ঘরের ভেতরের ও বাইরের দৃশ্যপট একত্রে দেখানো হয়েছে। 'ওভারচিওর টু কা মাউন্টেইন' নাটকটি ইরানে অভিনীত হয় সত্যিকারের একটি পাহাড়ের ওপরে। তার তলার বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডকে কাজে লাগানো হয়। একটি বিরাট হাঙর, প্রচুর ডাইনোসোরাস, কবরখানা, কার্ডবোর্ড সমুদ্রের ঢেউ, রুপালি রকেট, ৫০টি পেপারবোর্ডের বাড়ি এবং প্রচুর ফ্লেমিংগো পাখি এই নাটকের আড়ম্বরকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ইলিউশন সৃষ্টির জন্য

উইলসন মঞ্চকে অনেকগুলি বলয়ে ভাগ করে দৃশ্যপট সাজান। 'কিং অব স্পেন' নাটকে তিনি মঞ্চকে সাতটি বলয়ে ভাগ করে সাতটি দৃশ্যপট তৈরি করেন। প্রত্যেকটি বলয়ে আলাদাভাবে অভিনয় হয়। 'দ্য ম্যান ইন দ্য রেইনকোর্ট' নাটকে তিনি আপস্টেজে লম্বালম্বিভাবে মাটি ও গাছ দিয়ে একটি বলয় তৈরি করেন। সেন্টার স্টেজে একটি প্রাচীন রাস্তার আভাস দেন। সমস্ত ডাউনস্টেজ জুড়ে তৈরি করেন এক বিরাট টারম্যাক। কিছু অ্যাকশনকে আলাদা করার জন্য তাঁর অনেক প্রযোজনাতেই থাকে উঁচু উঁচু প্ল্যাটফর্ম।

উইলসনের এই ধরনের ইলিউশন সৃষ্টির কেন্দ্রে রয়েছে তাঁর 'পারসপেকটিভ' ব্যবহারের প্রবণতা। ছবিতে পারসপেকটিভ বস্তুর ঘনত্ব, দূরত্ব ও আকার দেখায়। থিয়েটারের মানুষরা দেখেছেন, ফ্রেমের মধ্যে দিয়ে ছবি বৈচিত্র্যময় ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। ছবির গভীরতা বেড়ে যায়। তাঁর নাট্য দৃশ্যায়নে এই পারসপেকটিভকে ব্যবহার করার জন্য তাঁরা মঞ্চ ও দর্শকের মাঝখানে একটি 'প্রসেনিয়াম আর্চ' দিয়ে পিকচার ফ্রেম মঞ্চ তৈরি করলেন। এই আর্চটি একটি প্রতীকী সীমানা টেনে দিল। চারপাশের অবাঞ্ছিত জিনিসকে বাদ দিয়ে নাটকের ঘটনাস্থল, চরিত্র ও অ্যাকশনকে উজ্জ্বল করে তুলল। সমস্ত দৃশ্যপট ও অভিনয়ক্রিয়া প্রসেনিয়াম ফ্রেমের অভ্যন্তরে চলে গেল। সমস্ত নাট্যক্রিয়া একটি ফ্রেমে বাঁধানো ছবি হয়ে উঠল। দর্শকের দৃষ্টিরেখাকে নিয়ন্ত্রণ করল। দর্শকের দৃষ্টি নাট্যক্রিয়ার প্রতি অনেক বেশি কেন্দ্রীভূত হল। নাট্যক্রিয়ার বাইরে তাঁদের দৃষ্টি অন্যত্র যাওয়ার কোনও সুযোগ রইল না। অভিনয় ও মঞ্চের সামগ্রিক রূপটি দৃষ্টি-সুখকর হয়ে উঠল। সেটের বাড়তি অংশ, মঞ্চের যন্ত্রপাতি, উইংসের পাশে অপেক্ষমান অভিনেতা, শব্দ-প্রক্ষেপক, আলোকশিল্পী ও মঞ্চ-উপকরণ সরবরাহকারী দর্শকের দৃষ্টির বাইরে রয়ে গেল।

আধুনিক আভাঁ গার্দে থিয়েটার-চর্চাকারীদের থেকে উইলসন একেবারেই অন্যরকম এই জন্য যে, যেখানে অন্যান্য আধুনিক পরিচালকরা প্রসেনিয়াম থিয়েটারকে পরিহার বা পরিত্যাগ করে চলতে চাইছেন, উইলসন সেখানে দাঁড়িয়ে প্রসেনিয়ামের ইলিউশনিস্টিক সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করেন। বাস্তব পৃথিবীর বাইরে স্বপ্নের যে পৃথিবী তিনি নির্মাণ করতে চান, অতিরিক্ত পারসপেকটিভ ব্যবহার করে তিনি তাকে উজ্জ্বল করে তোলেন। এমনকি পেছনের ব্যাকড্রপের ছবিটিও তিনি এমনভাবে আঁকেন, যাতে মনে হয় ল্যান্ডস্কেপ অনেক দূরে অবস্থিত। অগভীর মঞ্চকে মনে হয় অনেকটা গভীর। মঞ্চ-উপকরণ নিয়েও তিনি পারসপেকটিভের ব্যবহার করেন। যেমন, 'আইনস্টাইন অন দ্য বিচ' নাটকের প্রথম দৃশ্যে পূর্ণ চেহারার যে ট্রেনটি চলে

যায়, চতুর্থ দৃশ্যে সেটিই অনেক ছোট আকারে দূরচক্রবালে মিলিয়ে যায়।

'স্লো মোশান' উইলসনের অন্যতম টেকনিক। এটি তাঁর একান্তই নিজস্ব উদ্ভাবন। তাঁর 'ডিফম্যান গ্ল্যান্স' নাটকের শুরুতেই আছে মা ও তার দুই সন্তানের এক মূকনাট্য। প্রথম আধঘন্টা কেউ চলাফেরা করে না। আধঘন্টা পর মা তার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায়। সন্তানদের জন্য গ্লাসভর্তি করে দুধ ভরে। তারপরে ছুরি দিয়ে তাদের হত্যা করে। সমস্ত প্রক্রিয়াটি সংঘটিত হতে সময় লাগে আরও আধঘন্টা। উইলসনের 'স্লো মোশনের' ব্যবহার এতটাই অভিনব যে, তাঁর অনেক প্রযোজনায় মনে হয় ঘটনাগুলি ঘটছে জলের তলায়। যেমন, 'আইনস্টাইন অন দ্য বিচ' নাটকে অভিনেতারা যখন স্বাভাবিক গতিতে চলাফেরা করে তখন ট্রেনের মতো অন্যান্য গতিশীল বস্তুগুলি 'স্লো মোশানে' মঞ্চ অতিক্রম করে। এইভাবে অ্যাকশনগুলি ধীরগতিতে মঞ্চে ঘটতে থাকার ফলে সেগুলি দর্শকরা যেমন বিশদ ও গভীরভাবে পরীক্ষা করে দেখতে পাওয়ার সুযোগ পান, তেমনই অ্যাকশনগুলির বৃহত্তর অর্থ খুঁজে পাওয়ারও সুযোগ থাকে। ধীরগতির জন্য অ্যাকশনগুলি বাড়তি মনোযোগ ও গুরুত্ব পেয়ে যায়। এই ধীরগতির জন্য উইলসনের প্রত্যেকটি প্রযোজনাই দীর্ঘ সময় নিয়ে নেয়। 'ডিফম্যান গ্ল্যান্স'-এর অভিনয় সময় ৮ ঘন্টা, 'দ্য লাইফ অ্যান্ড টাইমস অফ যোসেফ স্তালিন' বারো ঘন্টা, 'ওভারচিওর টু কা মাউনটেন' সাতদিন সাত রাত।

আমরা সাধারণত চলচ্চিত্রের কিছু কিছু অংশে, বিশেষ করে মার্শাল আর্টের সময় অথবা দূরদর্শনে ক্রিকেট বা ফুটবলের 'অ্যাকশন রিপ্লে' স্লো মোশানে দেখি। এই টেকনিকের ফলে দ্রুত গতিতে যেসব জিনিস আমাদের কাছে অস্পষ্ট থেকে যায়, সেগুলি আমরা দেখতে পাই। একজন মার্শাল আর্ট বিশেষজ্ঞ কীভাবে হস্ত ও পদচালনা করেন, একজন ফুটবলার কেমনভাবে গোল করেন, একজন ব্যাটসম্যান কীভাবে রান আউট হন, এসব আমরা পরিষ্কারভাবে ও বিশদভাবে দেখতে পারি। দেখে বিশ্লেষণ ও বিচার করতে পারি। স্লো মোশানের টেকনিক প্রয়োগে উইলসনের যুক্তি হল, 'আপনি যদি পৃথিবীর ঘূর্ণনের গতি বা ঋতুর পরিবর্তনের কথা ভাবেন, তবে আপনার কাছে আমার নাটককে ধীরগতিসম্পন্ন বলে মনে হবে না।' তাঁর এই বিশ্বাসের ফলশ্রুতি হিসেবে তাঁর নাটকে একটি যান্ত্রিক কচ্ছপ মঞ্চ অতিক্রম করতে ৪০ মিনিট সময় নেয়। একটি খুন হতে সময় লাগে এক ঘন্টা।

নাটক দেখতে গিয়ে আমরা সব সময়ই একটি নিটোল গল্প আশা করি। কোনও গল্প না পেলে আমরা যে বিক্ষিপ্ত দৃশ্য বা ঘটনা দেখি সেগুলিকে জোড়া লাগিয়ে আপনমনে একটি গল্প বের করার চেষ্টা করি। একটি অর্থ খোঁজার চেষ্টা

করি। কিন্তু উইলসনের থিয়েটার আমাদের এইরকম সব প্রচেষ্টাকেই বানচাল করে দেয়। তাঁর থিয়েটারে প্রথাগত কাহিনি বা চরিত্র থাকে না। যেমন 'দ্য কিং অব স্পেন' নাটকে কোনও কাহিনি নেই, সংলাপ নেই। নাট্যক্রিয়ার কোনও বিশেষ কার্যকারণ বা যুক্তিও নেই। দর্শকরা দৃশ্যবস্তু ও চলমান বস্তু দেখে যা ইচ্ছে ভেবে নেবেন, এইরকমটি ধরে নেওয়া হয়। এই যে আপাতবোধের অভাব, এটি উইলসনের কাজের একটি ধারা। উইলসন বলেন মানুষ ক্রমশই সামাজিক সত্তা থেকে ব্যক্তিসত্তায় ঘুরে যাচ্ছে। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, 'রেলওয়ে স্টেশন বা সাবওয়েের দিকে তাকিয়ে দেখুন। অনেক মানুষ জড়ো হয়ে আছে, কিন্তু কেউ কারুর দিকে তাকাচ্ছে না। তারা নিজেদেরকে নিয়েই ব্যস্ত। নিজেদেরকে নিয়েই মশগুল। আমরা এমন একটা সমাজে বাস করছি যেখানে আমাদের জীবন দুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে। আমরা মিডিয়ার প্রচারে আক্রান্ত হচ্ছি। ভিড়ে-ঠাসা জনস্থানে আমরা আমাদের প্রকাশের জায়গাকে ভাগ করে নিতে বাধ্য হচ্ছি। এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা আমাদের গোপন চিন্তাশীল পৃথিবীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি। আমাদের ব্যক্তিগত অস্তিত্বের কথা ভাবি।'

উইলসনের থিয়েটারে মঞ্চ-উপকরণ ও অ্যাকশনের মধ্যে এতটাই অমিল যে, জঞ্জালের মধ্যে কোনও মানুষের চেহারার একাংশ মাত্র দেখা যায়। একটি বলয়ের ক্রিয়াকলাপ অন্য বলয়ের ক্রিয়াকলাপকে অস্পষ্ট করে দেয়। একইসঙ্গে অনেক ঘটনা ঘটে চলে। একটি আর একটির ওপর প্রাবরণ সৃষ্টি করে। কোনওটিই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না।

॥ ৫ ॥

১৯৭৩ সাল পর্যন্ত উইলসন তাঁর 'থিয়েটার অব ভিশন' নিয়ে কাজ করেছেন। এই থিয়েটারকে তিনি বলেছেন, 'লেফট ব্রেন থিয়েটার'। শুধুই 'দৃশ্য-নাটক'। এই থিয়েটার নাটক বা কাহিনির চেয়ে 'প্রতিরূপ'-এর ওপর বেশি নির্ভরশীল ছিল। ১৯৭৪ থেকে তাঁর প্রযোজনাগুলি ছিল 'রাইট ব্রেন থিয়েটার'। এই থিয়েটারে তিনি ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তবে প্রথাগত থিয়েটারে ভাষাকে যেভাবে ব্যবহার করা হয় তিনি সেভাবে ব্যবহার করেননি। কারণ তিনি নোলেস, হেইনার মুলারের মতো নাট্যকারের সঙ্গে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন, যাঁদের ভাষার ব্যবহার প্রচলিত সাংস্কৃতিক গঠনের একেবারেই বাইরে। বাস্তবিকপক্ষে, উইলসনের কোনও প্রযোজনাকেই সংলাপ প্রথাগত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। তাঁর শেষের দিকের নাটকগুলিতে সংলাপের পরিবর্তে গান, বিকৃত, ছন্দোবদ্ধ, ও অর্থহীন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 'আইনস্টাইন অন দ্য বিচ' নাটকে তো তিনি অর্থব্যঞ্জক ভাষা একেবারেই

পরিত্যাগ করেছেন। অভিনেতাদের মুখে সংলাপগুলি যান্ত্রিকভাবে বসিয়ে দিয়েছেন। 'কা মাইনটেইন অ্যান্ড গার্ডেভেনিয়া টেরেস' প্রযোজনায় উইলসন 'ভাষা' নিয়ে চূড়ান্তভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। এই বিশাল প্রযোজনায় 'বাইরডস'-এর ৩০ জন সদস্য এবং ২০ জন ইরানি অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রযোজনাটি একনাগাড়ে ১৬৮ ঘন্টা ধরে চলেছিল। একটি পাহাড়ের ওপর নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। প্রযোজনার বিশেষত্বের মধ্যে ছিল ইম্প্রোভাইজেশন, অ্যাকশন পেইন্টিং এবং একটি হ্যাপনিংস। এই হ্যাপনিংস-এ একজন দর্শকও অংশগ্রহণ করেছিলেন। বাচনিক অভিনয়ের মধ্যে ছিল— উচ্চকণ্ঠে বারংবার আর্তনাদ, গভীর খাদের কণ্ঠস্বর, অপ্রাসঙ্গিক সংলাপ, কৃত্রিম স্বর, ধীরগতির নিম্নমুখী উচ্চারণ, দুর্বোধ্য মন্ত্রোচ্চারণ, অসংযুক্ত ও আকস্মিক তীব্রতায় পৃথকভাবে ধ্বনিত ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ফিসফিস করে কথা বলা। বিশেষ মুহূর্তে একটি কাঠের তৈরি পিরামিডের ভিতর থেকে উইলসনের কণ্ঠস্বর ও মন্ত্রচ্চারণ ভেসে আসে। মনে হয় যেন মৃতের বাড়ি থেকে কণ্ঠস্বর উঠে আসছে। সমগ্র প্রযোজনা দেখে এক প্রতিবেদক লিখেছেন, 'বাচনিক অর্গানের খেলা— প্রচণ্ড 'এফেক্ট'-এর শব্দ-চিত্র'। দর্শকের এক নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এক দর্শক বলেছেন, 'এই প্রথম আমি যা নিজে সবসময় করতে চেয়েছিলাম, তা দেখার অভিজ্ঞতা হল। আমি থিয়েটারের মধ্যে আধুনিক শিল্পের সমস্তরকম প্রসারণ প্রত্যক্ষ করলাম। শিল্পের একটি আধুনিক কাজ দেখলাম।'

॥ ৬॥

উইলসনের থিয়েটারের অভিনয়রীতিও একেবারে অন্যরকম। স্তানিস্লাভস্কি বা স্ট্রেসবার্গের অভিনয়-পদ্ধতিতে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দিকটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। মঞ্চে যা কিছু ঘটে, তার পেছনে কিছু না কিছু যুক্তি বা কার্যকারণ দেখানো হয়। দর্শক হিসেবে আমরাও সেই পদ্ধতিতে অভ্যস্ত। এফেক্ট হিসেবে আমরা অ্যাকশনকে দেখি। প্রতিটি অ্যাকশনের পেছনে কারণ খুঁজতে থাকি। নাট্যকার ও পরিচালক আমাদের খোঁজার জন্য কিছু কিছু ইঙ্গিত বা বাহ্যিক বস্তু বা ঘটনার অবতারণা করেন। ব্রেশটের থিয়েটারেও সামাজিক ও আদর্শগত কারণগুলিকে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু উইলসনের থিয়েটারে এইরকম কোনও চিহ্ন বা ইঙ্গিত আমরা দেখতে পাই না। কোনও গ্রহণযোগ্য যুক্তি ছাড়াই ঘটনাগুলি ঘটতে থাকে। আবেগশূন্য অভিনয় চলতে থাকে। সংলাপ কথনে, মুখের অভিব্যক্তিতে, বিরতির সময় দেহভঙ্গিমায় বা বিজনেসে— অভিনয়ের সমস্ত বিভাগে বিশদতার কোনও চেষ্টাই করা হয় না। দর্শকও ঘটনার পেছনে কোনও কার্যকারণ খুঁজে পাননা।

যেমন 'ডিফম্যান গ্ল্যান্স' নাটকে মায়ের সন্তানহত্যাটি সংঘটিত হয় সম্পূর্ণ নীরবতা ও নিরাসক্ত অভিব্যক্তির মধ্যে। সন্তানদের ছুরি দিয়ে হত্যা করার সময় মায়ের মুখ এতটাই নির্লিপ্ত ও অভিব্যক্তিহীন থাকে যে, আবেগের বা মনস্তত্ত্বের কোনও স্তরই দর্শকের কাছে ধরা পড়ে না।

উইলসনের অভিনেতারা বাঁদর, সিংহ, সিন্ধুঘোটক, পেঁচা সাজেন। কালো, খয়েরি ও সাদা ভালুকের পোশাক পড়েন। তাঁর 'দ্য লাইফ অ্যান্ড টাইমস অব যোসেফ স্তালিন' প্রযোজনায় ৫০টি অষ্ট্রিচ পাখি নাচে, কোনও কোনও সময় মঞ্চ ভরে যায় আসল কুকুর, সাপ, উট এবং ছাগলে। এর সঙ্গো থাকে যান্ত্রিক কচ্ছপ, পশমি কুকুর, দাঁড়কাক, দৈত্য, বামন, ডানাযুক্ত পরী, ডাইনোসরাস, বিকটাকার জীব, ট্রেন, পিরামিড, মাছ, আগ্নেয়গিরি। থাকে রাখাল বালক, রেড ইন্ডিয়ানস ইত্যাদি অতিকথা ও রূপকথার চরিত্র। থাকে মহাকাশচারী, মহাকাশযান, ভারী মোটরগাড়ি ইত্যাদি কল্পবিজ্ঞানের চরিত্র ও বস্তু। ফ্রয়েড, স্তালিন, এডিসন, আইনস্টাইন, আব্রাহাম লিঙ্কনের মতো প্রখ্যাত ঐতিহাসিক চরিত্র নিয়েও উইলসনের কিছু কাজ আছে। স্বপ্নের মতো পরিবেশ সৃষ্টি করাই এইসব প্রতিমূর্তি ব্যবহার করার উদ্দেশ্য।

উইলসন সব সময় তাঁর অভিনেতাদের শরীরের সঙ্গো মাইক্রোফোন লাগিয়ে দেন। প্রেক্ষাগৃহে রাখেন স্পিকার। এমনকি তিনি ব্যবহার্য সামগ্রীর মধ্যেও মাইক্রোফোন রাখেন। ফলে মঞ্চের কোনও জায়গাতে কোনও অভিনেতা গ্লাসে জল ঢাললে, সেই জায়গা থেকেই শব্দ প্রক্ষেপিত হয়ে প্রেক্ষাগৃহে ছড়িয়ে পড়ে।

উইলসন পেশাদার অভিনেতাদের নিয়ে কাজ করতে উৎসাহী নন। কারণ যে ধরনের অভিনয় তিনি পছন্দ করেন, তা প্রথাগত নাটকের চরিত্রাভিনয় থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র। তাঁর থিয়েটারের মূল লক্ষ্য নাট্যচরিত্রের বিকাশ নয়, অভিনেতার নিজস্ব ব্যক্তিত্বের বিকাশ। আত্ম-সচেতনতামুক্ত হয়ে মঞ্চে নিজেদেরকে উপস্থিত করা। প্রতিদিনের জীবনে যা তাঁরা করেন, সেই অ্যাকশনই মঞ্চে ধীরগতিতে করা। দর্শকদের যতদূর সম্ভব নাটকীয় ঘটনা অথবা চরিত্র শনাক্তকরণ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করা। তিনি চান, তাঁরা কিছু আবিষ্কারের চেষ্টা করুন। বিশ্লেষণের পরিবর্তে 'প্রশ্ন' নিয়ে আসুন।

উইলসনের থিয়েটারে অভিনেতার 'মুভমেন্ট'-এর মানে তাঁর দেহ-সম্পর্কিত সচেতনতা। অর্থাৎ কীভাবে হাতের ভঙ্গিমা করতে হবে, কখন অ্যাকশন শুরু হবে বা শেষ করতে হবে— এইসবের সচেতনতা। এই প্রক্রিয়া প্রাত্যহিক জীবনের মতোই সাধারণ, সরল ক্রিয়াকলাপ। অভ্যাসবশত দৈনন্দিন যে মুভমেন্ট হয়, তারই সমধর্মী। উইলসন বলেন, 'আমি সহজতম চলনভঙ্গিমায় ফিরে যেতে

চাই। যেমন, আমি কীভাবে হাঁটি, কীভাবে চেয়ারে বসি, উঠি, বাইরে বেরিয়ে যাই, এইসব।'

উইলসন তাঁর প্রযোজনায় কোনও বিষয়েরই প্রাঞ্জল ভাষ্য দেন না। তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও নতুন নাট্যধারা অনুধাবনের দায়িত্ব তিনি দর্শকের ওপর ন্যস্ত করেন। তিনি বিশ্বাস করেন, দর্শককে আবিষ্কারের নেশায় নেতৃত্ব দেওয়াই পরিচালকের কাজ। তিনি চান, দর্শক প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে আসার পর নিজেকেই যেন জিজ্ঞাসা করে, 'আমি কী দেখলাম?'

দুঃখের বিষয়, উইলসনের সুররিয়ালিস্টিক শ্রাব্য-দৃশ্য এষণা দর্শকের ওপর বিরূপ অভিঘাত সৃষ্টি করেছে। তাঁর সৃষ্ট অনেক প্রতিবিম্ব দর্শকের কাছে অনিরূপিত ও অমীমাংসিত থেকে গেছে। উৎসাহিত হওয়ার পরিবর্তে তাঁরা একঘেয়েমি ও বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। অনেক সমালোচক বলেছেন, কাঠামো নিয়ে অত্যন্ত বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য এই বিপত্তি ঘটেছে। 'ফর্ম' বিষয়ের ওপর অযৌক্তিক আধিপত্য করেছে। ফলে বিষয় স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়নি। বিষয়ের গভীরেও যাওয়া হয়নি। তাঁর আবিষ্কৃত ধীরগতির স্বপ্নসম অ্যাকশন এবং বিমূর্ত 'মঞ্চ-প্রতিরূপ' অনেকেরই আনন্দানুভব ঘটায়নি।

তবে বিশ্বনাট্যে উইলসনের অবস্থান ও অবদান কিন্তু অন্যত্র। তিনি যে 'ড্রামা-থেরাপি' আবিষ্কার করেছেন, মূক-বধির ও মস্তিষ্ক-বিনষ্ট মানুষদের কাছে তা শুধুই নাট্যসাধনা নয়, বেঁচে থাকার আকর। তাদের অবাদৃত ও নিস্তরঙ্গ ভুবনে আলোর সন্ধান।

এই মঙ্গলময় কাজের জন্যই উইলসন থিয়েটারের ইতিহাসে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবেন।